বঙ্কিম-শতবার্ষিক সংস্করণ

সীতারাম

[২৬ মে ১৮৯৪ তারিখে প্রকাশিত তৃতীয় সংস্করণ হইতে]

সীতারাম

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

[১২৯৩ সালে প্রথম প্রকাশিত]

সম্পাদক :
ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীসজনীকান্ত দাস

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৩/১, আপার সারকুলার রোড
কলিকাতা-৬

প্রকাশক
শ্রীসনৎকুমার গুপ্ত
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

প্রথম সংস্করণ—চৈত্র ১৩৪৬
দ্বিতীয় সংস্করণ—ফাল্গুন ১৩৫২
তৃতীয় সংস্করণ—বৈশাখ ১৩৬২

মূল্য সাড়ে তিন টাকা

শনিরঞ্জন প্রেস, ৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলিকাতা-৩৭
হইতে শ্রীরঞ্জনকুমার দাস কর্তৃক মুদ্রিত।
১১'০—৭।৪।১৯৫৫

ঐতিহাসিক ভূমিকা

বঙ্কিম স্বয়ং বলিয়াছেন, "সীতারাম ঐতিহাসিক ব্যক্তি। এই গ্রন্থে সীতারামের ঐতিহাসিকতা কিছুই রক্ষা করা হয় নাই। গ্রন্থের উদ্দেশ্য ঐতিহাসিকতা নহে" ('সীতারামে'র বিজ্ঞাপন)। আবার, "দুর্গেশনন্দিনী বা চন্দ্রশেখর বা সীতারামকে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলা যাইতে পারে না" ('রাজসিংহে'র বিজ্ঞাপন)।

কিন্তু বঙ্গদেশের সত্য ইতিহাস পড়িবার পর বঙ্কিমের এই অস্বীকার-বাণী গ্রহণ করা যাইতে পারে না। আমরা দেখিতে পাই যে, তাঁহার 'সীতারাম' উপন্যাস হইলেও প্রকৃতপক্ষে ইহা একখানি ঐতিহাসিক উপন্যাস, এবং তিনি এই গ্রন্থে ঐতিহাসিক উপন্যাসের লক্ষণগুলি 'দুর্গেশনন্দিনী' ও 'চন্দ্রশেখর' হইতে অনেক অধিক পরিমাণে রক্ষা করিয়াছেন; এই গ্রন্থখানি ইউরোপীয় সাহিত্যে রচিত হইলে সেখানকার গুণিগণ ইহাকে ঐতিহাসিক উপন্যাসের শ্রেণীতে নিঃসন্দেহ স্থান দিতেন; তাহার কারণ, পরিষৎ-সংস্করণের 'আনন্দমঠে'র ভূমিকাতে আমি বিস্তারিত বিচার করিয়াছি। অর্থাৎ, বঙ্কিমচন্দ্র সীতারাম নামক রাজার জীবনের ঘটনাগুলির ও সেই যুগের বাঙ্গলার অবস্থার যে বিবরণ দিয়াছেন, তাহা অধিকাংশ একেবারে সত্য; ইহার কোন স্থানেই ঐতিহাসিক সত্যের প্রচণ্ড অপলাপ করেন নাই; ইতিহাসে পরিচিত কোন বিখ্যাত সাধুকে উপন্যাসের পাতায় ঠগ বলিয়া অঙ্কিত করিলে যে দূষিত কল্পনা হইত, সীতারামে কোথায়ও তাহা হয় নাই। এর উপর, সেই যুগে প্রজা ও শাসকের সম্বন্ধ, দেশের দশা, যুদ্ধ-বিগ্রহ-প্রণালী বঙ্কিম অক্ষরে অক্ষরে সত্য করিয়া আঁকিয়াছেন, অর্থাৎ এই উপন্যাসখানির দৃশ্যপট একেবারে সত্য। এই দুটি কথা এখানে প্রমাণ করিব।

বঙ্কিমের 'সীতারাম' ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম ছাপা হয়। তাহার পর ইহার ঐতিহাসিক সত্যাসত্যতা লইয়া অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও অন্যান্য কয়েক জন লেখক আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে সতীশচন্দ্র মিত্রের 'যশোহর-খুলনার ইতিহাস' দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইবার ফলে ঐ সব পুরাতন তর্কবিতর্কের নিরসন হইয়াছে, এবং সীতারামের প্রকৃত বিবরণ সম্পূর্ণ ও বিস্তৃতভাবে জানা গিয়াছে। সে যুগের পারসী সরকারী কাগজ এবং ফরাসী কুঠিয়াল সাহেবদের চিঠি হইতে ঐ সময়কার দেশের ইতিহাস অতি বিশদ ও বিশুদ্ধ ভাবে জানা যায়। আমি এই দিকেই সতীশচন্দ্রের গ্রন্থের উপর কতকগুলি তথ্য যোগ করিয়া দিব। রাজা সীতারামের কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে বেশী কিছু পাই নাই।* সমসাময়িক সাক্ষীর কাহিনী ও স্থানীয় প্রবাদ অবলম্বনে ঐতিহাসিক সীতারামের জীবনী নীচে লিখিত হইল।

* ইংরাজদের মাদ্রাজ কুঠীর কার্য্যনির্বাহক-সমিতির কার্য্য-বিবরণ-গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, সেই হেড অফিসে ভিজাগাপটম হইতে যে পত্রগুলি পৌছে, তাহাতে সীতারাম, 'সম্-বিয়ারেড' (সুবিয়া রেড্ডী ?) ও অন্যান্য সামন্ত রাজাদের সম্রাটের ফৌজদারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইবার উল্লেখ আছে। ঐ সব উল্লেখ উক্ত গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হয় ডিসেম্বর ১৬৮৯ ও ১৬৯৪। ইনি আমাদের সীতারাম হইতে পারেন

সীতারামের প্রকৃত জীবনী

১৮৬১-১৮৬৩ এই তিন বৎসর বঙ্কিম, খুলনা জেলায় ডেপুটী কলেক্টর ছিলেন, এবং ঐ জেলার মাগুরা বিভাগের সবডিভিসনাল অফিসর নিযুক্ত থাকেন। ঐ অঞ্চলে মাগুরা শহর হইতে ১৩ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে সীতারামের রাজধানী মহম্মদপুর এখন গ্রাম মাত্র, কিন্তু তাঁহার রাজবাড়ী, মন্দির, দুর্গ-প্রাকার, পরিখা প্রভৃতির অগণ্য ভগ্নাবশেষ জঙ্গলে ঢাকা পড়িয়া আছে। স্থানীয় প্রবাদ এইরূপ যে, "রাইচরণ মুখোপাধ্যায় নামক একজন গল্পরসিক কর্ম্মকুশল ব্যক্তির সন্ধান পাইয়া, বঙ্কিম তাঁহার নিকট হইতে অনেক গল্পগুজব শুনিয়া লন। কেহ কেহ বলেন, রাইচরণ বাবু ২।৩ মাস বঙ্কিমচন্দ্রের বেতনভুক্ হইয়া মাগুরায় থাকেন ও তাঁহাকে সময়মত গল্প শুনাইতেন" (সতীশচন্দ্র, ২য় খণ্ড, ৫১৪ পৃ)। সীতারামের মৃত্যুর দেড় শত বৎসর পরেও তাঁহার বাসস্থানে তাঁহার নিজের এবং লোকজনের বংশধরদের মধ্যে প্রচলিত কাহিনী সীতারামের নিজ জীবনের বিবরণের একমাত্র উপাদান। তাহার উপর বঙ্গদেশের ইতিহাস কয়েক পৃষ্ঠা মাত্র ষ্টুয়ার্ট (তস্য পিতা রিয়াজ-উস্-সলাতীন, তস্য পিতা সলিমুল্লার তারিখ-ই-বংগালা) হইতে লইয়া বঙ্কিম নিজ কাহিনী পূর্ণ করিয়াছেন।

সীতারাম উত্তর-রাঢ়ীয় কায়স্থ। এই বংশে শ্রীরামদাস, বাঙ্গলার সুবাদার রাজা মানসিংহের অধীনে রাজস্ব-সেরেস্তায় চাকরি করিয়া খাস-বিশ্বাস উপাধি লাভ করেন। তাঁহার পৌত্র উদয়নারায়ণ ভূষণার মুসলমান ফৌজদারের*—অর্থাৎ একাধারে ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ও স্থানীয় সৈন্যাধ্যক্ষের—সজোয়াল্ অর্থাৎ প্রধান তহসিলদার ও কার্য্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়া ভূষণায় আসেন। ইনিই সীতারামের পিতা। ভূষণা মুঘলযুগে জেলার শাসন-কেন্দ্র ছিল; কারণ, বঙ্গবিজয়ের পূর্ব হইতে আকবর জাহাঙ্গীরের সময় পর্য্যন্ত প্রবল-পরাক্রান্ত এক হিন্দু-রাজবংশের রাজধানী এখানে ছিল। বর্ত্তমান মাগুরা শহর হইতে ভূষণা ১৬ মাইল পূর্বে।

উদয়নারায়ণ মহম্মদপুরের পার্শ্ববর্ত্তী শ্যামনগরে একটি জোত বন্দোবস্ত করিয়া লন এবং মধুমতী নদীর অপর পারে হরিহরনগরে নিজ বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়া, ঢাকা হইতে সেখানে পরিবার লইয়া আসেন, খ্রীঃ ১৬৭০এর কাছাকাছি; তখন সীতারাম ১০।১২ বৎসরের বালক।

যৌবনকালে সীতারাম অশ্বারোহণে, অস্ত্রচালনায় ও মৃগয়ায় দক্ষ হন এবং রাজস্ব বিভাগের কায়স্থ আমলার উপযোগী ফারসী ভাষা এবং বৈষ্ণবের প্রিয় সংস্কৃত ভাষাও

না। Fort St. George Diary and Consultation Book; also Public Dispatches to England, vol. 5.

* ফৌজদার কলেক্টর নহেন, রাজস্ব আদায় তাঁহার হাতে ছিল না; জেলার রাজস্ব তহসিলদারেরা সুবার সদরে পাঠাইত।

অভ্যাস করেন। প্রথমতঃ নবাবের অধীনে রাজস্ব আদায় ও হিসাবের কাজ করিবার সময় তিনি মফঃস্বলের দলবদ্ধ ডাকাত এবং বিদ্রোহী পাঠান জমিদারদের দমন করিবার শর্ত্তে প্রকাণ্ড নল্‌দী পরগণা (বর্ত্তমান নড়াইল, মাগুরার ঠিক দক্ষিণে সংলগ্ন) বাঙ্গলার সুবাদারের নিকট হইতে নিজনামে বন্দোবস্ত করিয়া লন। আমলার পুত্র এইরূপে তালুকদার হইলেন, ক্রমে জমিদার হইবেন, রাজা হইবেন, অবশেষে বিদ্রোহী সামন্ত হইবেন; তাহার আয়োজন আরম্ভ হইল।

বিশাল নল্‌দী পরগণা হাতে আসার ফলে সীতারামের আয় ও লোকবল দ্রুত বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। প্রথমে তাঁহার দুই জন বড় বন্ধু জুটিল; একজন রঘুরাম (পক্ষান্তরে রামরূপ) ঘোষ, দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ, বীর ও পালোয়ান, মেনাহাতী এই ডাক নামে খ্যাত সেনাপতি হইলেন। অপর জন মুনিরাম রায়, বঙ্গজ কায়স্থ, উকীল (মন্ত্রণাদাতা অর্থাৎ ফরেন সেক্রেটারী) হইলেন। তাঁহার দেওয়ান যদুনাথ গাঙ্গুলী (উপাধি মজুমদার) বোধ হয় বঙ্কিমের চন্দ্রচূড় হইবেন। তাঁহার সেনা-বিভাগে যোগ দিল—বখ্‌তাওর্ খাঁ (ভূতপূর্ব ডাকাতের সর্দ্দার), আমল্ বেগ মুঘল্, হিন্দু নিম্নজাতীয় রূপচাঁদ ঢালী এবং ফকিরা মাছ-কাটা অর্থাৎ নমঃশূদ্র নিকারী। তাহার উপর, লোকমুখে এখনও সীতারামের সেনাপতিদের মধ্যে মোচ্‌ড়া সিংহ, গাবুরডলন (ডাক নাম) প্রভৃতি প্রসিদ্ধ। ক্রমে নবাব-সরকার হইতে আরও অনেক তালুক বন্দোবস্ত করিয়া লইয়া, আয় অত্যন্ত বৃদ্ধি করিলেন, অসংখ্য বীর ও ভাগ্যান্বেষী সৈন্য আসিয়া তাঁহার দলে যোগ দিল; সীতারাম বিদ্রোহ দমন ও খাজনা আদায়ের নামে সেই অঞ্চলের সব ছোট বড় জমিদারদের পদানত অথবা তাঁহাদের জমিদারী লুঠ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। বঙ্গের সুবাদার ঐ সব অরাজক অঞ্চলে শান্তি স্থাপনের সংবাদ এবং মাঝে মাঝে কিছু কিছু খাজনা পাইয়া সন্তুষ্ট থাকিতেন; কারণ, ১৬৮৯-১৬৯৭ পর্য্যন্ত বাঙ্গলার সুবাদার ছিলেন শান্তিপ্রিয়, গ্রন্থকীট, নিশ্চল, বৃদ্ধ নবাব ইব্রাহিম খাঁ; তাঁহার শাসনের কথা পরে বলিব।

সীতারাম নবাব-দরবারে নিজ উকীল (অর্থাৎ দূত) দ্বারা সুবাদারকে সন্তুষ্ট করিয়া তাঁহার সুপারিশে দিল্লীর দরবার হইতে 'রাজা' উপাধি ও জমিদারী ফর্ম্মান* আনিয়া মহাগৌরবে স্বদেশে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। এবং এই নূতন পদমর্য্যাদার উপযুক্ত এক রাজধানী স্থাপন করিলেন। তাঁহার পৈতৃক পুরাতন কাচারী সূর্য্যকুণ্ডগ্রাম এবং পৈতৃক

* স্থানীয় প্রবাদ যে, সীতারাম স্বয়ং দিল্লী যান এবং সেখানে রাজমন্ত্রীদের টাকায় ও প্রতিশ্রুতিতে হস্তগত করিয়া এই উপাধি ও ফর্ম্মান লাভ করেন। কিন্তু তখন বাদশাহ ও তাঁহার সব বড় মন্ত্রীরা দাক্ষিণাত্যে, দিল্লী একটি প্রদেশ মাত্র হইয়াছিল। করদ-রাজাদের বাদশাহী ফর্ম্মান দেওয়া হইত, জমিদারদের শুধু পর্‌ওয়ানা এবং তাহাও উজীরের মোহর-যুক্ত।

বাসস্থান হরিহরনগর, এই দুটির মধ্যস্থলে বাগজানি গ্রামে নূতন রাজধানী গড়িলেন, তাহার নাম দিলেন মহম্মদপুর। মধুমতী নদীর পশ্চিমে যেখানে ঐ নদী একটা হেয়ার-পিনের মত পূব দিকে বাঁকিয়া চলিতেছে, সেই বাঁকের মুখের কাছে মহম্মদপুর; আর মহম্মদপুর হইতে ক্রমাগত উত্তর-পূর্বদিকে আট দশ মাইল চলিলে মধুমতী ও পরে বারাসিয়া, এই দুই নদী পার হইয়া ভূষণা সহর,—সে যুগে ঐ জেলার শাসনকেন্দ্র, সভ্যতা ও শিল্পের আবাস, এবং বহু পণ্ডিত ও সাধু লোকের বসতিস্থল।

বিজ্ঞ শ্রমী ঐতিহাসিক সতীশচন্দ্র মিত্র এই স্থান-নির্ব্বাচনের প্রশংসা করিয়াছেন। "মহম্মদপুরের অবস্থান অতি সুন্দর। উহার তিন দিকে বিল, এক দিকে নদী, মধ্যস্থানে উচ্চ স্থল। ভূষণার দিকে অর্থাৎ প্রধানতঃ যে দিক্ হইতে শত্রু আসিবার সম্ভাবনা, সেই পূর্বদিকেই নদী। কৃত্রিম পরিখা দ্বারা দক্ষিণ দিক্ দুষ্প্রবেশ্য করা যায়। অপর দুই দিকে দূরবিস্তৃত বিল, কিছুই করিবার আবশ্যক নাই···এই স্থানে একটি ভগ্ন মন্দিরে সীতারামের [বংশের] ভাগ্যদেবতা লক্ষ্মীনারায়ণ শিলা আবিষ্কৃত হন [তাঁহার পিতা উদয়নারায়ণ কর্তৃক।] সীতারাম এখানে একটি মৃণ্ময় দুর্গ, কয়েকটি সুপ্রশস্ত জলাশয়, সুন্দর সুন্দর মন্দির ও আবাস-গৃহ নির্ম্মাণ করেন" (৫৪০-৫৪৪ পৃ)।

এইখানকার তিনটি মন্দিরের ফলক অথবা ফলকের লিপির নকল পাওয়া গিয়াছে, তাহার সময় ১৬৯৯, ১৭০৩ এবং ১৭০৪ খ্রীষ্টাব্দ এবং সবগুলিই সীতারামের নামে। বহুদূর-বিস্তৃত প্রাচীরের চিহ্ন, কতকগুলি মাটির ঢিবি এখনও নীরবে দাঁড়াইয়া আছে।

ক্রমে চারি দিকে রাজ্য বিস্তার করিয়া সীতারাম অবশেষে ১৭১২ খ্রীষ্টাব্দে ভূষণার ফৌজদার সৈয়দ্ আবুতুরাব্‌কে অকস্মাৎ আক্রমণে হত্যা করেন, এবং ভূষণা দখল করিয়া ফেলেন। সতীশচন্দ্র মিত্র দেখাইয়াছেন যে, চরম উন্নতির সময় সীতারামের রাজ্য পদ্মার উত্তরে কিছু দূর হইতে সুন্দরবনের তটভূমি পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল; উত্তর সীমা পাবনা, দক্ষিণ সীমা ভৈরব নদ; পূর্বে মধুমতীর ওপারে তেলিহাটী পরগণার শেষ, পশ্চিমে মামুদশাহী পরগণা পর্য্যন্ত। "সীতারামের জমিদারীর রাজস্ব ৭০ লক্ষ টাকার কম নহে" (৫৬৪ পৃ)। এ কথা আমার নিকট অসম্ভব বোধ হয়; কারণ, ১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দে মুর্শিদ কুলী খাঁর সুশাসন ও সৎ বন্দোবস্তের ফলেও সমগ্র বাঙ্গলা সুবার সরকারী খাজনা ১৩১ লক্ষের উপর উঠে নাই।

আবুতুরাবের হত্যার সংবাদ পাইয়া মুর্শিদ কুলী খাঁ সীতারামকে দমন করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন। তিনি নিজ আত্মীয় বখ্‌শ আলী খাঁকে ভূষণার নূতন ফৌজদার-পদ দিয়া সৈন্য সহ আক্রমণ করিতে পাঠাইলেন, এবং পার্শ্ববর্ত্তী সব জমিদারদের হুকুম দিলেন, সীতারামের বিরুদ্ধে এই অভিযানের সাহায্য করিতে। সীতারামের তখন দুরদৃষ্ট—তিনি বিলাসে মগ্ন, সেনাপতি মেনাহাতী অতর্কিতভাবে স্নানের সময় নিহত হইলেন; আর

দুর্গ রক্ষা করা হইল না, রাজধানীর মধ্যে চারি দিকে ছত্রভঙ্গ আরম্ভ হইল। সীতারামের বহু পরিবারের মধ্যে অনেকেই (তাঁহার কয়েকজন স্ত্রী ও সন্তান) আগেই মহম্মদপুর হইতে বাহিরে পলাইয়া গেলেন, ১৭১৪ সনে তাঁহাদের কয়জন কলিকাতায় ধরা পড়েন। সীতারামের পরাজয়ে শত্রুপক্ষের দক্ষিণ হস্ত ছিলেন রামজীবন আম্‌লা, বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ, নাটোর-রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা, এবং সীতারামকে বন্দী করিয়া মুর্শিদাবাদে লইয়া যান রামজীবনের ভৃত্য দয়ারাম রায়, দীঘাপতিয়া-রাজবংশের আদিপুরুষ। তাঁহার বিশাল রাজ্য ছিন্নভিন্ন হইয়া নলডাঙ্গা, নড়াইল, নাটোর, দীঘাপতিয়া প্রভৃতির জমিদারী গঠন করিল। মুর্শিদাবাদে সীতারামের নৃশংস প্রাণদণ্ডের বিবরণ সলিমুল্লার তারিখ-ই-বংগালাতে এবং পরে ষ্টুয়ার্টের ইতিহাসে পাওয়া যায়। তাঁহার পরাজয়ের তারিখ ফেব্রুয়ারি ১৭১৪, এবং মৃত্যুর সময় বোধ হয় সেই বৎসরের অক্টোবর মাস (সতীশ, ২য় খণ্ড, ৫৮৯-৬০০ পৃ)।

তখনকার দেশের দশা

তেইশ বৎসর কাল মহাপ্রতাপে বঙ্গদেশ শাসন করিয়া নবাব শায়েস্তা খাঁ ১৬৮৮ খ্রীষ্টাব্দের বর্ষাশেষে পদত্যাগ করিয়া আগ্রায় ফিরিয়া গেলেন। তাঁহার ক্ষমতায় দেশময় শান্তি, ধনবৃদ্ধি, রাজ্যবৃদ্ধি ও সভ্যতার বিকাশ হইতেছিল। পরবৎসরের মাঝামাঝি নূতন সুবাদার হইয়া আসিলেন ইব্রাহিম খাঁ; ইনি পরম ধার্মিক, বৃদ্ধ, সর্বদা বই পড়িতে ও পণ্ডিতদের সঙ্গে আলোচনা করিতে ভাল বাসিতেন; যুদ্ধবিগ্রহ বা চারি দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখা তাঁহার প্রকৃতির বিরোধী। অথচ ইনি বড় ন্যায়পরায়ণ, কোমলহৃদয় শাসক ছিলেন। ইংরাজ বণিকেরা তাঁহাকে "the most famously just good nabob" বলিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। পারসিক ইতিহাসে লিখিত আছে যে, তিনি একটি পিঁপড়ার প্রতিও অত্যাচার হইতে দিতেন না। তাঁহার চেষ্টায় বাঙ্গলার চাষ-বাস ও বাণিজ্য বেশ বাড়িতে থাকিল। কিন্তু বাহির হইতে এক রাজনৈতিক ঝড় আসিয়া তাঁহার গুণগুলিকে দোষে পরিণত করিল, বাঙ্গলায় অরাজকতা আনিয়া দিল।

ঠিক এই ১৬৮৯ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমেই বাদশাহ আওরংজীবের গৌরব ও সৌভাগ্য চরমে উঠিয়াছিল; তিনি ইহার পূর্বের তিন বৎসরে দাক্ষিণাত্যের শেষ তিনটি স্বাধীন রাজ্য ধ্বংস করেন—বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার সুলতান দুই জনকে বন্দী করিয়া এবং মারাঠারাজ শম্ভুজীকে হত্যা করিয়া; মুঘল-সাম্রাজ্য নামতঃ আহিমাচল-কুমারিকা পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইল। কিন্তু ঠিক ইহার পরেই তাঁহার পতন আরম্ভ হইল। দক্ষিণে মারাঠারা, উত্তরে জাঠ ও রাজপুতেরা ক্ষেপিয়া উঠিল, শাসন ছত্রভঙ্গ হইল, সাম্রাজ্য জুড়িয়া বিপ্লব ও অরাজকতা ছড়াইয়া পড়িল। মারাঠা জনসঙ্ঘ সাম্রাজ্যতন্ত্রকে বিধ্বস্ত করিয়া দিল, তাহাদের হাতে কত বড় বড় মুঘল

সেনাপতি পরাস্ত, বন্দী অথবা নিহত হইতে লাগিলেন, আলিমর্দ্দান খাঁ, ইসমাইল খাঁ মকা, কাসিম খাঁ, হিম্মৎ খাঁ, রুহুল্লা খাঁ, রুস্তম খাঁ,—আর কত নাম করিব ? বিশেষতঃ ধন্নাজী যাদব ও শান্তাজী ঘোরপড়ে নামক দুই জন অদম্য মারাঠা অশ্বপতি সেনানায়ক মুঘল-সৈন্যদের ন্যস্তানাবুদ করিয়া দিল। এই দুই জনের এমন খ্যাতি হইল যে, মুঘল-সৈন্যেরা ঘোড়াকে জলাশয়ে লইয়া গেলে পর ঘোড়া যদি ভড়কাইত বা জল পান না করিত, তখন তাহাকে বলিত,—"কি রে। তুই বুঝি জলে ধন্না যাদবের মুখ দেখতে পাচ্ছিস ?" আর, বাদশাহের সর্ব্বোচ্চ সেনানায়ক ফিরোজ জঙ্গ (নিজামবংশের প্রতিষ্ঠাতা) "যখন শুনিতেন যে, শান্তাজী তাঁহার ৮।৯ ক্রোশের মধ্যে আসিয়াছে, অমনি তাঁহার মুখ ভয়ে পাণ্ডুবর্ণ হইয়া যাইত, এবং শান্তাকে আক্রমণ করিতে যাইতেছি, এই মিথ্যা ঘোষণা করিয়া দিয়া শিবির তুলিয়া সেখান হইতে অন্য পথ দিয়া দূরে পলাইয়া যাইতেন" (ডফ ii 406 n., খাফি খাঁ ii 446)। উত্তর-ভারতে জাঠশক্তির অভ্যুদয় হইল, তাহারা আগ্রায় ও আগ্রার চারি দিকে লুঠিয়া বেড়াইতে লাগিল, তাহাদের বাধা দিবার কেহ রহিল না। রাজপুতানায় যে এই সময় ত্রিশবর্ষব্যাপী আগুন জ্বলিতে থাকিল, তাহা 'রাজসিংহে'র ভূমিকায় দেখাইয়াছি।

বাদশাহের এই সব নিগ্রহ ও অক্ষমতার সত্য সংবাদ সুদূর প্রান্ত বঙ্গদেশে পৌঁছিতে পৌঁছিতে আরও পল্লবিত হইল। অমনি জমিদারগণ খাজনা দেওয়া বন্ধ করিল, দক্ষিণবঙ্গ ও উড়িষ্যার অসংখ্য ছোট ছোট পাঠানবংশ মাথা খাড়া করিল, সাধারণ ডাকাতেরা দল বাঁধিয়া পথে গ্রামে লুঠিতে লাগিল। শেষে প্রকাশ্য বিদ্রোহ দেখা দিল; শোভাসিংহ ও রহিম আফগানের বিদ্রোহ—বর্দ্ধমান-চন্দ্রকোনা হইতে রাজমহল পর্য্যন্ত ছড়াইল, ১৬৯৬-১৬৯৮ সন। [জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'স্বপ্নময়ী' নাটক সম্পূর্ণ কাল্পনিক নহে।]

১৬৯০-১৬৯৭ আট বৎসর এইরূপ বিপ্লব চলিল। তাহার পর ১৬৯৮ সনে নূতন সুবাদার শাহজাদা আজীম-উদ্দীন ঐ বিদ্রোহ দমন করিলেন। রহিম যুদ্ধে হত এবং শোভাসিংহ অপঘাতে মৃত হইল। এবং ১৭০০ সনের শেষে অসাধারণ দক্ষ ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ নূতন দেওয়ান মুর্শিদ কুলী খাঁ বাঙ্গলায় পৌঁছিয়া দেশে কতকটা শান্তি ও সুব্যবস্থা স্থাপন করিতে পারিলেন। কিন্তু তাহাতে প্রজাদের কোন লাভ হইল না। সুদূর দাক্ষিণাত্যে অতিবৃদ্ধ বাদশাহ নিজে মারাঠা অক্ষৌহিণী কর্ত্তৃক অনবরত ঘেরা, উত্তরভারতের কোন সুবায় সৈন্য ও কামান পাঠাইয়া সাহায্য করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব; বরং তিনি এই দশ-বারো বৎসর ক্রমাগত হিন্দুস্থান হইতে নূতন-ভর্ত্তি সৈন্য ও আগ্রার কোষাগার হইতে পূর্ব্বপুরুষদের সঞ্চিত ধনরত্ন চাহিয়া আনাইয়া তাহা প্রায় নিঃশেষ করিয়া দিলেন। সুতরাং বাঙ্গলায় স্থানীয় বিদ্রোহ বেশী বিস্তৃত হইলে তাহা দমন করা সুবাদারের অসাধ্য ছিল। শোভাসিংহ ও রহিম খাঁর পতনের পর বাঙ্গলার কেন্দ্রীয় অংশে শান্তি স্থাপিত

হইলেও দূর দূর সীমান্তে—যেমন তটভূমি খুলনা জেলায়—বিদ্রোহ চলিতে লাগিল ; সেখানে কে যায় ?

বাদশাহ এখন ৮৪ বৎসরেরও অধিকবয়স্ক, বৃদ্ধ এবং পঙ্গু ; রাজপুত্রগণ তাঁহার আসন্ন মৃত্যুর কথা ভাবিয়া তাঁহার দেহান্তে সিংহাসন লইয়া যে যুদ্ধ বাধিবে, তাহার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। আজীম-উদ্দীনের একমাত্র লক্ষ্য হইল—বাঙ্গলার মত বিখ্যাত স্বর্ণখনি হইতে দুই হাতে টাকা সংগ্রহ করিয়া পিতামহের মৃত্যুর পর সিংহাসন পাইবার পথ আর সব প্রতিদ্বন্দ্বী অপেক্ষা তাঁহার পক্ষে অধিক সুগম করা। ১৭০৭ সনে আওরঙ্গজীবের মৃত্যুর পর যখন আজীম বাঙ্গলা-বিহার ছাড়িয়া আগ্রার দিকে গেলেন, তখন তিনি তিন কোটি টাকা সঙ্গে লইয়া যান, এরূপ লোকে বলে। চন্দননগরের ফরাসী কুঠিয়াল সাহেবেরা এই গূঢ় অভিসন্ধির এবং দেশের দশার সঠিক চিত্র তাঁহাদের রিপোর্টে প্যারিস নগরীতে কর্ত্তাদের নিকট পাঠান ; ১৬৯৯ হইতে ১৭০৩ পর্য্যন্ত তাঁহাদের চিঠি হইতে কিছু কিছু অনুবাদ করিয়া দিতেছি (Kaeppelin, *La Compagnie Indes Orientales et F. Martin*, pp. 340, 461, 524) :—

"শাহজাদা আজীম্‌উদ্দীন [ভুল বানান *Massoudy*] বিদ্রোহীদের দমন করিবার পর প্রাচ্য দেশের প্রথা অনুসারে, লোকদের রীতিমত শোষণ করা ছাড়া আর কিছুতেই মন দিলেন না ; সব কর্ম্মচারিগণ তাঁহার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিতে বাধ্য হইল।...আওরংজীবের অতিবার্দ্ধক্য এবং তাঁহার উত্তরাধিকার লইয়া আসন্ন প্রশ্নের ফলে সমস্ত রাজ্যময় অরাজকতা বাড়িয়া গেল। ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীরা এই সুযোগে অর্থ সংগ্রহ করিতে লাগিল এবং অত্যধিক জোরে আদায় ও অবিচার দ্বারা প্রজাদের দলিত করা ছাড়া আর কিছুই খুঁজিল না। আমাদের [ইষ্ট ইণ্ডিয়া] কোম্পানীও ইহা হইতে রেহাই পাইল না। শাহজাদা আজীম এবং বাদশাহ কর্ত্তৃক অসামান্য ক্ষমতা-যুক্ত হইয়া বঙ্গে প্রেরিত নূতন দেওয়ান (মুর্শিদ কুলি খাঁ) নিজেই ঘৃণিত লুণ্ঠনের দৃষ্টান্ত দেখাইলেন এবং প্রজাদের শোষণ করিবার কোন পন্থা হইতেই নিবৃত্ত থাকিলেন না।...সমস্ত প্রদেশটি ক্রমাগত গরীব হইতে লাগিল, টাকা অধিক হইতে অধিকতর দুষ্প্রাপ্য হইল, শিল্পবাণিজ্যে মন্দা ধরিল। বঙ্গদেশে ব্যবসা করা প্রায় অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইল।"

ঠিক এই অশান্তি ও অত্যাচারের মধ্যে সীতারামের উত্থান। সুতরাং তাঁহার কাছে অনেক সঙ্গী সহায়ক আসিয়া জুটিল, অনেক পিষ্ট লোক তাঁহার নবপ্রতিষ্ঠিত রাজ্যে আশ্রয় লইল। ১৬৯৯ হইতে ১৭১২ পর্য্যন্ত সীতারাম অবাধে রাজ্য বিস্তার ও নিষ্কণ্টক রাজসুখ ভোগ করিলেন। কিন্তু ১৭১৩ সনে ফর্‌রুখ্‌সিয়র্ দিল্লীর বাদশাহ হইবার পর মুর্শিদ কুলী

খাঁ বাঙ্গলার সুবাদার* হইয়া আসিলেন। তিনি ইহার পূর্ব্বে বঙ্গ ও উড়িষ্যার দেওয়ান এবং প্রায় সমস্ত বাঙ্গলা ও উড়িষ্যার ফৌজদার মাত্র এবং শেষে উড়িষ্যার সুবাদার ছিলেন। এখন হইতে নামতঃ এবং কার্য্যতঃ এই দুই প্রদেশে সর্ব্বেসর্ব্বা হইলেন। ঠিক তাহার পরের শীতকালেই সীতারামের ধ্বংস সাধন করিলেন (ফেব্রুয়ারি ১৭১৪)।

হিন্দুদের অবস্থা

বাদশাহ আওরংজীবের দীর্ঘ রাজত্বের ঠিক মাঝামাঝি, যখন বড় বড় হিন্দু সামন্ত রাজারা সকলে মরিয়া গেলেন, অমনি তাঁহার ধর্ম্মান্ধতা প্রকাশ্যে দেখা দিল, এবং তিনি যতই বৃদ্ধ হইতে লাগিলেন, তাঁহার গোঁড়ামি ও ভিন্ন ধর্ম্মের প্রতি অসহিষ্ণুতা চরমে উঠিল। কি হিন্দু, কি শিয়া, কি বোরা সম্প্রদায়, সকলকেই রাজশাসনের যন্ত্র দিয়া উৎখাত করিতে লাগিলেন। তাঁহার প্রাদেশিক কর্ম্মচারীরা ইস্‌লামের ধর্ম্মবিধি(শরা')কে অক্ষরে অক্ষরে প্রজাদের উপর চালাইতে বাধ্য হইল। ইহার অনেক দৃষ্টান্ত, মূল দলিলের নাম ও পৃষ্ঠা সহিত আমার ইংরাজী 'হিষ্ট্রী অব্ আওরংজীবে'র ৩য় খণ্ডের ৩৪ অধ্যায়ে সবিস্তারে দিয়াছি। বাঙ্গলাদেশেও অমুসলমানদের শরা'-অনুযায়ী নির্যাতন ও আদালতে পার্থক্যমূলক ব্যবহার, অর্থাৎ আইনের জোরে অবিচার হইত, তাহার দৃষ্টান্ত আছে। ইস্‌লামি ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রতিনিধি বলিয়া কাজীর পদ এবং ক্ষমতা প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা সুবাদারের উপর উঠিত।

খাফি খাঁ লিখিতেছেন,—"বাদশাহ রাজ্যের কাজে এবং ছোট বড় সব বিষয়ে কাজীদের এত প্রভুত্ব দিলেন যে, তাহা বড় বড় ওমরা এবং মন্ত্রীদেরও ঈর্ষার বিষয় হইল।...একদিন দাক্ষিণাত্যের সংবাদ-লেখকদের পত্র হইতে বাদশাহ জানিতে পারিলেন যে, শিবাজী বিদ্রোহী হইয়া খুব গণ্ডগোল করিতেছেন, এবং তাঁহাকে দমন করিবার জন্য সেনাপতি মহাবৎ খাঁকে পাঠাইবার প্রস্তাব হইল। বাদশাহ মহাবৎ খাঁর দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন যে, 'এই কাফিরবাচ্চা অসীম বাড়াবাড়ি আরম্ভ করিয়াছে, উহাকে সমূল উৎপাটন করা আবশ্যক।' মহাবৎ খাঁ উত্তর দিলেন, 'সৈন্য প্রেরণ দরকার কি? কাজীর একটা ঘোষণা পাঠাইয়া দিলেই কাজ সিদ্ধ হইবে।' বাদশাহ অসন্তুষ্ট হইলেন, এবং পরে গোপনে জাফর খাঁকে বলিলেন, 'মহাবৎ খাঁকে বুঝাইয়া দিও যে, এরূপ লঘু কথা প্রকাশ্য দরবারে যেন না কহে।' [মূল পারসিক, ii. 216-217.]

* বাঙ্গলায় ঠিক আসল সুবাদার নহেন, নায়েব নাজিম্ অর্থাৎ কোন অনুপস্থিত শাহজাদা অথবা আমিরের প্রতিনিধিরূপে, কিন্তু পূর্ণ ক্ষমতার সহিত।

বাঙ্গলাদেশে সেই সময়ে এই শ্রেণীর একটি ঘটনা ঘটে, তাহা সলিমুল্লা ও ঘুলাম হুসেন সালিম নিজ নিজ ইতিহাসে লিখিয়া গিয়াছেন :—

একজন ফকির চুনাখালীর তালুকদার বৃন্দাবনের নিকট ভিক্ষা চাওয়ায় তিনি বিরক্ত হইয়া উহাকে বাড়ী হইতে বাহির করিয়া দেন। ফকির কতকগুলি ইট কুড়াইয়া আনিয়া তাহা সাজাইয়া বৃন্দাবনের বাড়ী হইতে বাহিরে যাইবার পথ বন্ধ করিয়া একটি ছোট দেওয়াল খাড়া করিল এবং উহাকে মসজিদ নাম দিল। যখনই বৃন্দাবন ঐ পথে চলিতেন, ফকির উচ্চস্বরে আজান পঁড়িত। বৃন্দাবন উত্যক্ত হইয়া একদিন কয়েকখান ইট ফেলাইয়া দিলেন এবং ফকিরকে গালি দিয়া তাড়াইয়া দিলেন। ফকির গিয়া মুর্শিদ কুলীর নিকট নালিশ করিল। বিচারক কাজী মুহম্মদ শরফ্ উলেমাদের লইয়া আলোচনা করিয়া বৃন্দাবনের প্রাণদণ্ডাজ্ঞা দিলেন। মুর্শিদ কুলী এই হত্যায় অনিচ্ছুক হইয়া কাজীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এই বেচারা হিন্দুকে বাঁচাইবার জন্য ধর্ম্ম-আইনের কড়া বিধি এড়াইবার কোন উপায় আছে কি?' কাজী উত্তর দিলেন, 'হাঁ, আছে। উহার প্রাণ লইতে ততক্ষণ দেরি হইতে পারে, যতক্ষণে উহার প্রাণভিক্ষার্থী বন্ধুকে আগে মারিয়া ফেলা হইবে। তাহার পর উহাকে বধ করা নিশ্চিত।' মুর্শিদ কুলী খাঁর সব চেষ্টা বিফল হইল; এমন কি, সুবাদার শাহজাদা আজীম-উদ্দীনের অনুরোধ পর্য্যন্ত বাদশাহ গ্রাহ্য করিলেন না।...তিনি শাহজাদার পত্রের উত্তরে লিখিয়া পাঠাইলেন,—

'কাজী শরফ্
খোদাকি তরফ্।'

[তারিখ-ই-বংগালা, মুর্শিদ কুলী খাঁ অধ্যায়ের ঠিক শেষে; রিয়াজ-উস্-সালাতীন, মূল ২৮৫-২৮৬ পৃ]।

বাদশাহ এই মুহম্মদ শরফ্কে নিজে বাছিয়া লইয়া বাঙ্গলার কাজী নিযুক্ত করিয়া পাঠান এবং মুর্শিদ কুলী সব মোকদ্দমায় এই কাজীর মত [ফতোওয়া] অনুসারে কাজ করিতেন। কুরাণে [নবম সূরা, ২৯ শ্লোক] লেখা আছে, "যাহারা সত্য-ধর্ম্ম অর্থাৎ ইসলাম্ গ্রহণ করে না, তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিবে, যতক্ষণ না তাহারা হীনভাবে (ওহম্ সাঘিরূণ) হাত দিয়া জজিয়া-কর দেয়।" এজন্য আওরংজীব হুকুম দিলেন যে, কোন হিন্দু ঐ টেক্সের টাকা বাহক দিয়া পাঠাইয়া দিলে তাহা গ্রহণ করা হইবে না, সে নিজে আসিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া মাথা নীচু করিয়া নিজ হাতে টাকাগুলি তহসিলদারের হাতে দিবে। তাঁহার অনেক চিঠি পাওয়া গিয়াছে, যাহাতে তিনি এই নিয়ম পালনে অবহেলা করার জন্য মুসলমান কর্মচারীদের ধমকাইয়াছিলেন।

যখন বাদশাহের পৌত্র আজীম-উদ্দীন বাঙ্গলা দেশের শাসন-কর্ত্তা, সেই ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দে কিরূপ সদা-সজাগ গভর্ণমেন্টের চেষ্টায় হিন্দু-মন্দির ধ্বংস করা হইত, তাহা এক সরকারী পত্র হইতে পরিষ্কার বুঝা যায়। পত্রখানি বাদশাহের আজ্ঞায় মীর মুহম্মদ আমান নামক বাঙ্গলা-সুবার সংবাদ-লেখক(সওয়ানে-নিগার)কে ভৎর্সনা করিয়া লেখা হইয়াছিল; ইহা শেখ মুহম্মদ ফাজিলের পুত্র মুহম্মদ জাফর-সঙ্কলিত 'ইন্‌শা-ই-আজীব্' নামক হস্তলিপির নবম পাতায় আছে। অনুবাদ :—

"এই সময় বাঙ্গলা দেশের [গুপ্ত-] সংবাদ হইতে বাদশাহ্ জানিতে পারিলেন যে, প্রয়াগদাস ও মথুরামল নামক দুইজন গুজরাটী ব্রাহ্মণ মখ্‌সুসাবাদ অঞ্চলে লালজী নামক একটি প্রস্তরমূর্ত্তি গড়াইয়া, মন্দিরে স্থাপন করিয়া আঁধার-হৃদয়ে অন্যান্য বহু বদমাশ জনতার সহযোগে তাহাকে পূজা করিতেছে এবং প্রত্যহ নিকট ও দূর হইতে অনেক লোক আসিয়া ভিড় করিয়া এই ঘৃণিত কার্য্যে প্রশ্রয় দিতেছে। আমাদের ধার্ম্মিক বাদশাহের সমস্ত আগ্রহ ইসলামধর্ম্ম প্রচলনে এবং হেয় কাফিরদের রীতিনীতি দূর করিতে নিযুক্ত, যাহার জন্য এই ভারত সাম্রাজ্যের কথা দূরে থাক্, এমন কি, ইরাণ ও তুরাণ, রুশ ও খোরাসান, যেখানেই মূর্ত্তিপূজা দেখা দেয়, যত দিন পর্যন্ত সেখান হইতে সেই অপ-ধর্ম্ম ও মিথ্যাবিশ্বাসের সূত্র সম্পূর্ণ দূর না হয়, তত দিন তিনি সে দিকে স্বয়ং সৈন্য চালনা করিতে বিরত থাকিবেন না। অতএব বিশ্বপ্রভু জগৎ-মান্য সম্রাট্ এই আজ্ঞা পাঠাইতেছেন যে, শাহজাদা মুঃ আজীম্ এই অপদার্থ দলকে সাজা দিয়া, ঐ ঘৃণিত পুত্তলিকা ভাঙ্গিয়া ফেলুন এবং ঐ স্থানে একটি উচ্চ মসজিদ নির্ম্মাণ করুন এবং নিয়ম করিয়া দিন যে, দলে দলে আলোকিত-হৃদয় মুসলমানগণ ঐখানে অদ্বিতীয় ঈশ্বরের আরাধনায় নিযুক্ত থাকিবে।

কিন্তু এটা অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয় যে, আপনি শাহজাদার সরকারী সংবাদ-লেখক- [সওয়ানে-নিগার-]পদে প্রতিষ্ঠিত থাকা সত্ত্বেও আপনার সংবাদের রিপোর্টে ঠিক সময়ে এই ঘটনার উল্লেখ করেন নাই, অথচ বাহিরের এক লোক ইহা বাদশাহকে জানাইয়াছে। বাদশাহ বার বার মির্জা ইয়ার আলি বেগ[ডাক ও গুপ্তচর বিভাগের প্রধান অধ্যক্ষ]কে বলিলেন,—'এর ভাই মির্জা লাহোরী নিজ কাজ ভালরূপে না করায় আমার কোপে পড়িয়াছিল, অথচ এ (বাঙ্গলার সওয়ানে-নিগার) সম্রাটের রাগকে ভয় করে না; ইহাকে নিশ্চয়ই শাস্তি দিতে হইবে।' অতএব, আপনার উচিত যে, ভবিষ্যতে প্রত্যেক ঘটনাই তৎক্ষণাৎ ভাল করিয়া লিখিয়া আপনার সংবাদ-চিঠির অন্তর্গত করিবেন।" পত্রলেখকের নাম মীর মুলতালী। [তখনও মখ্‌সুসাবাদের নাম মুরশিদাবাদ করা হয় নাই এবং দ্বিতীয় নামের সৃষ্টিকর্ত্তা তখনও কার্ তলব্ খাঁ নামে পরিচিত, মুরশিদ কুলী খাঁ উপাধি পান নাই।]

সুতরাং গঙ্গারামের লঘু অপরাধে জীবন্ত সমাধির হুকুম সে যুগের বাঙ্গলার ঐতিহাসিক সত্যের অনুযায়ী; এটি বঙ্কিমের কল্পনা-প্রসূত অসম্ভব ঘটনা নহে। এই অবিচারী ধর্ম্মান্ধ সম্রাটের বিরুদ্ধে প্রজাপুঞ্জের স্বাভাবিক ন্যায্য প্রতিক্রিয়া রাজপুত, শিখ, মারাঠা ও জাঠদের মধ্যে যাহা তখন ঘটে, তাহা ভারত-ইতিহাস হইতে সকলেই জানেন। বাঙ্গলায় তাহাই উপন্যাসছলে বঙ্কিম আঁকিয়াছেন।

সীতারাম-চরিত্র

তবে সীতারামের পতন হইল কেন? যশোহর-খুলনার ইতিহাসের জন্মভূমিভক্ত গবেষক সতীশচন্দ্র মিত্র স্বীকার করিয়াছেন যে, রাজা হইবার পর সীতারাম বড় বিলাসী ও ইন্দ্রিয়-পরায়ণ হইয়া পড়েন, এরূপ কথা সেই অঞ্চলে এখনও প্রচলিত। রাজা-নবাবরা আরাম ও নেশায় মত্ত থাকিবে, রংমহালে যুবতিশত-বৃতং হইয়া অহোরাত্র লীলা করিবে, এটা আর আশ্চর্য্য কথা কি? কিন্তু এইখানেই বঙ্কিম তাঁহার কবি-প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন, এই তুচ্ছ নিত্যনৈমিত্তিক ভোগ-বিলাসের অন্তরে একটি গূঢ় কারণ নিহিত করিয়া ইহাকে সাধারণ বাস্তব জগৎ হইতে অনেক দূরে, অনেক উর্দ্ধে আনিয়াছেন। তাঁহার সীতারাম রায় প্রথমে আমাদের কাছে দেখা দেন—অনন্যসামান্য মহাপ্রাণ উদ্যোগী পুরুষসিংহ-রূপে। তাহার পর ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতে তাঁহার চরিত্রের অভিব্যক্তি হইয়া ক্রমে গভীর অবনতিতে আসিয়া পড়েন,—যদিও জীবনের শেষ মুহূর্ত্তে তাঁহার বীরত্ব মনুষ্যত্ব আবার দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। নায়কের এই চরিত্র-পরিবর্ত্তনই 'সীতারাম' উপন্যাসকে শেক্ষপীয়রের 'ম্যাক্‌বেথে'র মত শ্রেষ্ঠ বিয়োগান্ত নাটক করিয়া তুলিয়াছে। এই দুই কাব্যেই আমরা দেখি, কেমন করিয়া ধীরে ধীরে, প্রায় অদৃশ্য গতিতে বাহ্য ঘটনার আঘাতে অর্থাৎ স্বাভাবিক কারণে, একজন দেব-চরিত্র বীর অবশেষে দানব হইয়া উঠেন। 'আনন্দমঠ' ও 'দেবীচৌধুরাণী'তে চরিত্রের ক্রমবিকাশ উপরের দিকে, ক্রমে মহৎ হইতে মহত্তর হইতেছে,—যেমন বৌদ্ধ-গল্পে এক একজন বোধিসত্ত্ব মানুষ হইয়া জন্মিলেও ক্রমে আত্মসংযম, স্বার্থত্যাগ এবং সুবুদ্ধির ফলে উচ্চ হইতে উচ্চতর জন্মের ভিতর দিয়া অবশেষে চরম স্তরে পৌঁছিয়া একজন সম্পূর্ণ বুদ্ধ হইয়া নির্ব্বাণ লাভ করেন। সীতারামের হৃদয়ের গতি ঠিক ইহার বিপরীত দিকে। আর একটি উপমা দিই—শেক্ষপীয়রের 'জুলিয়াস সিজার' নাটকের এণ্টনি কি বীর দক্ষ কর্মকুশল যোদ্ধা! আর সেই লোকটিই 'এণ্টনি এণ্ড ক্লিওপ্যাট্রা' নাটকে উদ্যোগহীন ইন্দ্রিয়পরায়ণ কামিনীর দাস হইয়া প্রাণ দিলেন।

আমাদের এই উপন্যাসখানির আরম্ভে আমরা সীতারামের পরিচয় পাই—এক অসাধারণ সত্যব্রতী, স্বার্থত্যাগী, পরহিতপরায়ণ, তীক্ষ্ণবুদ্ধি, দ্রুতসিদ্ধান্তে অভ্যস্ত কর্ম্মবীর,

যেন ঈশ্বর তাঁহাকে জননেতা হইবার জন্যই সৃষ্টি করিয়াছেন। ক্রমে তিনি বাড়িয়া উঠিলেন, পার্থিব সফলতার চরমে পৌঁছিলেন, আর তার পরই তাঁহার চরিত্রে পতন আরম্ভ হইল। ইহার কারণ, কাম বা সৌন্দর্য্যপিপাসা নহে। যদি তাহাই হইত, তবে তাঁহার রাণী রমা বা অন্য কোন মোমের পুতুল সে তৃষ্ণা মিটাইতে পারিত। কিন্তু এই গণনেতা, এই কর্ম্মবীর সফলতার শিখরে দাঁড়াইয়া দেখিলেন যে, নিজে নিঃসঙ্গ, একেলা; তাঁহার জীবনের ধ্যেয় কাজটি সুসম্পন্ন করিবার জন্য চাহিলেন একজন হৃদয়সঙ্গিনী (যাহার ইংরাজী অনুবাদ soul-mate, এবং কালিদাসী অনুবাদ—গৃহিণী সচিবঃ সখী মিথঃ)। বঙ্কিমের ভাষায়ই বলি—"কিন্তু সহ-ধর্মিণী কই? যে তাঁহার উচ্চ আশায় আশাবতী, হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষার ভাগিনী, কঠিন কার্য্যের সহায়, সঙ্কটে মন্ত্রী, বিপদে সাহসদায়িনী, জয়ে আনন্দময়ী, সে কই?" (সীতারাম, ১ম খণ্ড, ১০ম পরিচ্ছেদ)।

ঠিক এই অভাবের ফলে গল্পের এই স্থলে বিষবৃক্ষের বীজ অজ্ঞাতসারে বপন করা হইল, গল্পের অবশিষ্ট অংশের ভিতর দিয়া তাহাই ক্রমে স্বাভাবিক বৃদ্ধি পাইয়া, অঙ্কুরিত, পল্লবিত, ফলপ্রসূ হইয়া সীতারাম, মহম্মদপুর, ভূষণারাজ্য, সকলকে বিনষ্ট করিল, নিষ্ঠুর কালস্রোতে অর্থাৎ অদৃষ্টশক্তিতে এ সব ভাসিয়া গেল।

গ্রীক অলঙ্কার-লেখকেরা বলেন যে, বিয়োগান্ত নাটকের উদ্দেশ্য—করুণা ও লোমহর্ষণ-ভাব উদ্রেক করিয়া দর্শকের হৃদয় গলিত, ধৌত, মার্জ্জিত করিয়া দেওয়া। সুতরাং 'সীতারাম' নিঃসন্দেহ গদ্য ট্রাজেডী।

আলোচনার উপসংহার

The proper place of historical novels is not [among histories, but among literature.] The shortcomings of the historical novel proper, particularly the historical novel in our own time, which tends more and more to appropriate the authentic figures of the past and to have less and less to do with imaginary characters. On the whole the greater the use the historical novelist makes of invented people and incidents the better are his chances of producing what is called a work of art. "What might have been is not the same as what was," [Dr. Gooch], and fiction, therefore, however conscientious and erudite, could never provide a substitute for genuine historical study. However, it is because of a certain inadequacy in history,—the dead carrying most of their secrets with them to the grave and our knowledge [of past ages] thus remaining eternally—incomplete—that Dr. Gooch championed the case of the historical novel.

Again and again Dr. Gooch illustrated how much the historical novel has contributed to the understanding of history.

Millions have gathered from the historical novel a knowledge of history which they would not have acquired by any other means. Finally, "historical fiction has

played an active part in reviving and sustaining the sentiment of nationality, which for good or evil has changed the face of Europe in the nineteenth and twentieth centuries." (*Times, Lit. Sup*, 30 June 1945, p. 307)

"ইতিহাস এবং উপন্যাস এক বস্তু নহে। ঐতিহাসিক উপন্যাসের প্রকৃত স্থান সাহিত্যের শ্রেণীতে, ইতিহাসের শ্রেণীতে নহে।...আজকাল ইউরোপে যে সব ঐতিহাসিক উপন্যাস লেখা হইতেছে, তাহার প্রধান দোষ এই যে, তাহার মধ্যে অতীত কালের সত্য ব্যক্তি এবং ঘটনার ভাগ অতিমাত্রায় বাড়িয়া চলিয়াছে এবং গ্রন্থকারের কল্পনায় প্রসূত চরিত্র কমিয়া যাইতেছে। লেখক যতই বেশী পরিমাণে নিজ কল্পনায় সৃষ্ট চরিত্র ও ঘটনা রঙ্গমঞ্চে নামাইবেন, ততই তাঁহার একখানা সাহিত্যগ্রন্থ, একটি প্রকৃত কলার বস্তু রচনা করিবার সুযোগ বাড়িবে।

"রয়াল হিষ্টরিকাল সোসাইটীর সম্মুখে জুন মাসের শেষ সপ্তাহে বক্তৃতা করিবার সময়, অধ্যাপক গুচ বলিয়াছেন, 'যাহা হইলেও হইতে পারিত, তাহা এবং সত্যই সংঘটিত ব্যাপার, এক জিনিষ নহে।' অতএব ঐতিহাসিক উপন্যাস যতই যত্নে লিখিত ও পণ্ডিতোচিত তথ্যে পূর্ণ হউক না কেন, তাহা আসল ইতিহাস পাঠের স্থান কখনই লইতে পারে না। তথাপি, ঐতিহাসিক উপন্যাসের একটা সার্থকতা আছে; তাহার কারণ, সত্য ইতিহাসের মধ্যে একটা কি-যেন অভাব বোধ হয়; অর্থাৎ অতীত যুগের মৃত নায়ক নায়িকাগণ তাঁহাদের জীবনের প্রায় সব গোপনীয় ব্যাপারগুলি সঙ্গে লইয়া তিরোধান করিয়াছেন, এবং আধুনিকেরা অতীত যুগকে চিরদিনই শুধু ভাঙ্গা ভাঙ্গা রকমে চিনিতে পারে। পাঠক-হৃদয়ের এই শূন্য স্থান ঐতিহাসিক উপন্যাস পূর্ণ করে। অধ্যাপক গুচ বহু দৃষ্টান্ত দিয়া দেখাইয়াছেন, ঐতিহাসিক উপন্যাস, আমাদের ইতিহাস বুঝিতে কত বেশী সাহায্য করিয়াছে। লক্ষ লক্ষ পাঠক ঐতিহাসিক উপন্যাস হইতে ইতিহাসের যে জ্ঞান লাভ করিয়াছে, তাহা অন্য কোন উপায়ে পাইতে পারিত না। অবশেষে তিনি বলেন—'ঐতিহাসিক উপন্যাস সাধারণের হৃদয়ে জাতীয়তাবোধ জাগাইতে এবং সজীব রাখিতে অতি ক্রিয়াশীল শক্তির কাজ করিয়াছে; আর এই জাতীয়তা-বোধই উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে ইউরোপের রূপ বদলাইয়া দিয়াছে'।"

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের প্রকাশিত বঙ্কিম-গ্রন্থাবলীর এক একটি ঐতিহাসিক উপন্যাসের যে ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছি, তাহাতে যে সকল সিদ্ধান্তে পৌঁছান গিয়াছে, তাহারই আশ্চর্য্য সমর্থন পাওয়া গেল বিলাতের বিখ্যাত 'টাইম্‌স্‌' পত্রিকার নবীনতম সংখ্যার সম্পাদকীয় প্রবন্ধে, যাহার সারাংশ উপরে উদ্ধৃত হইল। বাঙ্গালী পাঠক দেখিবেন যে, বঙ্কিম নিজেই এই সাহিত্যিক নীতি অনুসরণ করিয়াছেন এবং তাঁহার ঐতিহাসিক

উপন্যাসগুলি বিলাতের অতি আধুনিক মনীষিগণের সিদ্ধান্ত অক্ষরে অক্ষরে সত্য বলিয়া প্রমাণ করিতেছে।

শ্রীযদুনাথ সরকার

ভূমিকা

[সম্পাদকীয়]

'সীতারামে'র বিজ্ঞাপনে বঙ্কিমচন্দ্র সীতারামকে ঐতিহাসিক ব্যক্তি স্বীকার করিয়াও তাঁহার উপন্যাসের সীতারামের অনৈতিহাসিকতা মানিয়া লইয়াছেন; কারণ, তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন, গ্রন্থের উদ্দেশ্য অন্য। প্রারম্ভে উদ্ধৃত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার শ্লোক কয়টির মধ্যে সেই উদ্দেশ্যের আভাস আছে। এতৎসত্ত্বেও ইতিহাসবিষয়ে কৌতূহলী পাঠকের উপর তিনি "Westland সাহেবের কৃত যশোহরের বৃত্তান্ত এবং Stewart সাহেবের কৃত বাঙ্গালার ইতিহাস পাঠ"-এর বরাদ্দ করিয়াছেন। কিন্তু তাহাতেই ইতিহাসের ছাত্রের বিশেষ সুবিধা হইবে বলিয়া মনে হয় না, দুইটি বৃত্তান্ত পরস্পরবিরোধী। ঐতিহাসিক সীতারামকে লইয়া সর্ব্বপ্রথম বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন—ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়, ১৩০২ বঙ্গাব্দের 'সাহিত্য' পত্রিকার কার্ত্তিক হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত ছয় সংখ্যায়। ঐতিহাসিক সীতারামের বীরত্ব ও শৌর্য্যের কথা স্মরণ করিয়া মৈত্রেয় মহাশয় বঙ্কিম-বর্ণিত সীতারামের অপদার্থতায় অত্যন্ত পীড়া বোধ করিয়াছেন। ১৩২৩ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের 'সাহিত্যে' রমাপ্রসাদ চন্দ "সীতারাম-প্রসঙ্গ" লেখেন। ১৩৩১ সালের আষাঢ়-শ্রাবণ সংখ্যা 'মানসী'তে তাঁহার "বঙ্কিমচন্দ্র ও বাঙ্গালার ইতিহাস" প্রবন্ধেও কিছু আলোচনা আছে। ১৩২৭ সালে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত কবিরত্ন মহাশয়ের 'বঙ্কিমচন্দ্র' পুস্তকের চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদে 'সীতারামে'র ঐতিহাসিকতা আলোচিত হইয়াছে। ১৩৩০ সালের 'মানসী ও মর্ম্মবাণী' পত্রিকার মাঘ ও ফাল্গুন সংখ্যায় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, অযোধ্যানাথ বিদ্যাবিনোদ ও কাজী মোহাম্মদ বক্স সীতারামের ঐতিহাসিকত্ব বিচার করিয়াছেন। W. W. Hunter-প্রণীত *A Statistical Account of Bengal* পুস্তকের ৭ম খণ্ডেও কিছু বিবরণী আছে। অনুসন্ধিৎসু পাঠক এগুলি হইতে 'সীতারামে'র ঐতিহাসিক পরিচয় সংগ্রহ করিবেন।

'আনন্দমঠ' ও 'দেবী চৌধুরাণী'র ভূমিকায় আমরা দেখাইয়াছি যে, শেষ জীবনে অর্থাৎ ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের পর হইতেই কতকগুলি কারণে ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্রের মানসিকতার পরিবর্ত্তন ঘটে, শুধু উপন্যাস রচনার খেয়ালেই উপন্যাস রচনা হইতে তিনি বিরত হন। এই কালে 'অনুশীলনতত্ত্ব' লইয়া তিনি বিশেষভাবে আলোচনা করিতেছিলেন এবং এই তত্ত্বের সহজ প্রচারের জন্যই শেষ তিনটি উপন্যাসের আশ্রয় লন। 'সীতারাম'—'আনন্দমঠ' ও 'দেবী চৌধুরাণী'রও পরের রচনা; ইহাই তাঁহার শেষ উপন্যাস।

১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর-নবেম্বর মাসে শোভাবাজার রাজবাটীর একটি শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করিয়া পাদ্রি হেষ্টি 'ষ্টেট্স্‌ম্যান' পত্রিকায় হিন্দুধর্ম্মের উপর যে আক্রমণ চালাইয়াছিলেন, "রামচন্দ্র" এই বেনামে তাহার জবাব দিতে গিয়া হিন্দুধর্ম্মের মূল তত্ত্বগুলি সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের মনে নানা প্রশ্ন জাগে। ইহা 'আনন্দমঠ' প্রকাশের অব্যবহিত পরের ঘটনা। ইহারই ফল তৎকালীন প্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষকে লিখিত *Letters on Hinduism*। এই অসম্পূর্ণ পত্রগুলিতে হিন্দুধর্ম্মের মূল তত্ত্বের ব্যাখ্যার একটা প্রয়াস আছে। ইহার পরেই 'দেবী চৌধুরাণী'—ইহার দ্বিতীয় খণ্ড পর্য্যন্ত প্রকাশ করিয়া 'বঙ্গদর্শন' বিলুপ্ত হয়; সম্পূর্ণ পুস্তক প্রকাশিত হয় ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের গোড়াতেই। ঐ সালের জুলাই মাস (শ্রাবণ, ১২৯১) হইতে বঙ্কিমচন্দ্র-পরিচালিত 'প্রচার' পত্রিকার আবির্ভাব ঘটে। ঐ শ্রাবণ মাসেই অক্ষয়চন্দ্র সরকার-সম্পাদিত 'নবজীবন'ও আত্মপ্রকাশ করে। এই দুইটি সাময়িক-পত্রের সহায়তায় বঙ্কিমচন্দ্র হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁহার নূতন ধারণা প্রচার করিতে থাকেন। এই প্রচারে 'সীতারাম' অন্যতম "কল" মাত্র। প্রথম সংখ্যা হইতেই ইহা প্রকাশিত হইতে থাকে; ১২৯৩ সালের মাঘ পর্য্যন্ত ধারাবাহিক ভাবে ইহা প্রকাশিত হয়, মধ্যে কয়েক মাস বন্ধ ছিল।

'প্রচারে'র প্রথম সংখ্যাতেই (শ্রাবণ, ১২৯১) বঙ্কিমচন্দ্র পর পর দুইটি প্রবন্ধ লেখেন—"বাঙ্গালার কলঙ্ক" ও "হিন্দুধর্ম্ম"। এই দুইটি রচনায় 'সীতারাম' উপন্যাসের প্রতিপাদ্য তত্ত্ব অতি স্পষ্ট ভাষায় লিখিত আছে। নিম্নে প্রবন্ধ দুইটি হইতে আমাদের প্রয়োজনীয় অংশ উদ্ধৃত করিতেছি।—

> …কদাচিৎ অন্যান্য ভারতবাসীর বাহুবলের প্রশংসা শুনা যায়, কিন্তু বাঙ্গালীর বাহুবলের প্রশংসা কেহ কখনও শুনে নাই। সকলেরই বিশ্বাস, বাঙ্গালী চিরকাল দুর্ব্বল, চিরকাল ভীরু, চিরকাল স্ত্রীস্বভাব, চিরকাল ঘুসি দেখিলেই পলাইয়া যায়। মেকলে বাঙ্গালীর চরিত্র সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, এরূপ জাতীয় নিন্দা কখন কোন লেখক কোন জাতি সম্বন্ধে কলমবন্দ করে নাই। ভিন্নদেশীয় মাত্রেরই বিশ্বাস যে, সে সকল কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। ভিন্নজাতীয়ের কথা দূরে থাকুক, অধিকাংশ বাঙ্গালীরও এইরূপ বিশ্বাস। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালীর চরিত্র সমালোচনা করিলে কথাটা কতকটা যদি সত্য বোধ হয়, তবে বলা যাইতে পারে, বাঙ্গালীর এখন এ দুর্দ্দশা হইবার অনেক কারণ আছে। মানুষকে মারিয়া ফেলিয়া তাহাকে মরা বলিলে মিথ্যা কথা বলা হয় না। কিন্তু যে বলে যে, বাঙ্গালীর চিরকাল এই চরিত্র, চিরকাল দুর্ব্বল, চিরকাল ভীরু, স্ত্রীস্বভাব, তাহার মাথায় বজ্রাঘাত হউক, তাহার কথা মিথ্যা।…
>
> বাঙ্গালীর চিরদুর্ব্বলতা এবং চিরভীরুতার আমরা কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ পাই নাই। কিন্তু বাঙ্গালী যে পূর্ব্বকালে বাহুবলশালী, তেজস্বী, বিজয়ী ছিল, তাহার অনেক প্রমাণ পাই।…
> "বাঙ্গালার কলঙ্ক"—'প্রচার,' শ্রাবণ ১২৯১, পৃ. ৬-৮*

* বিবিধ প্রবন্ধ (দ্বিতীয় ভাগ), পরিষৎ-সংস্করণ, পৃ. ৩১৪-১৫।

এই প্রমাণের উপরেই বঙ্কিমচন্দ্র সীতারাম-চরিত্রের পরিকল্পনা করিয়াছেন; মেনাহাতীও নিতান্ত তাঁহার মানস পুত্র নন।

এই গেল এক দিক্। অন্য দিকে "হিন্দুধর্ম্ম"। প্রথম সংখ্যা 'প্রচারে'র এই দ্বিতীয় প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র লিখিলেন—

> …জাতীয় ধর্ম্মের পুনর্জ্জীবন ব্যতীত ভারতবর্ষের মঙ্গল নাই, ইহা আমাদিগের দৃঢ় বিশ্বাস। …এক্ষণে আমাদিগের কি করা কর্ত্তব্য? দুইটি মাত্র পথ আছে। এক, হিন্দুধর্ম্ম একেবারে পরিত্যাগ করা, আর এক, হিন্দুধর্ম্মের সার ভাগ অর্থাৎ যেটুকু লইয়া সমাজ চলিতে পারে, এবং চলিলে সমাজ উন্নত হইতে পারে, তাহাই অবলম্বন করা। হিন্দুধর্ম্ম একেবারে পরিত্যাগ করা আমরা ঘোরতর অনিষ্টকর মনে করি।…যে সমাজ ধর্ম্মশূন্য, তাহার উন্নতি দূরে থাকুক, বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। আর তাঁহারা যদি বলেন যে, হিন্দুধর্ম্মের পরিবর্ত্তে ধর্ম্মান্তরকে সমাজ আশ্রয় করুক, তাহা হইলে আমরা জিজ্ঞাসা করি যে, কোন্ ধর্ম্মকে আশ্রয় করিতে হইবে? পৃথিবীতে আর যে কয়টি শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম আছে, বৌদ্ধ ধর্ম্ম, ইস্‌লাম ধর্ম্ম, এবং খ্রীষ্ট ধর্ম্ম, এই তিন ধর্ম্মই ভারতবর্ষে…হিন্দুধর্ম্মকে স্থানচ্যুত করিতে পারে নাই।…কতকগুলা বন্য জাতি এবং হিন্দুনামধারী কতকগুলা অনার্য্য জাতিকে অধিকৃত করিয়াছে বটে, কিন্তু ভারতীয় প্রকৃত আর্য্যসমাজের কোন অংশ বিচলিত করিতে পারে নাই।…
>
> যখন ধর্ম্মশূন্য সমাজের বিনাশ নিশ্চিত,* যদি হিন্দুধর্ম্মের স্থান অধিকার করিবার শক্তি আর কোন ধর্ম্মেরই নাই, তখন হিন্দুধর্ম্ম রক্ষা ভিন্ন হিন্দু সমাজের আর কি গতি আছে?…
>
> …যাহাতে মনুষ্যের যথার্থ উন্নতি, শারীরিক, মানসিক এবং সামাজিক সর্ব্ববিধ উন্নতি হয়; তাহাই ধর্ম্ম।…এইরূপ উন্নতিকর তত্ত্বসকল, সকল ধর্ম্মাপেক্ষা হিন্দুধর্ম্মেই প্রবল। হিন্দুধর্ম্মেই তাহার প্রকৃত সম্পূর্ণতা আছে।…"হিন্দুধর্ম্ম"—'প্রচার,' শ্রাবণ ১২৯১, পৃ. ১৫-২২।

হিন্দুধর্ম্মের প্রতি এই বিশ্বাস এবং আস্থা লইয়া 'সীতারামে'র সূত্রপাত। "হিন্দুধর্ম্ম রক্ষা ভিন্ন হিন্দু সমাজের আর কি গতি আছে?"—এই মন্তব্য সপ্রমাণ করিবার জন্যই যেন গঙ্গারাম ও ফকিরের কথা দিয়া উপন্যাস আরম্ভ করা হইয়াছে। গ্রন্থশেষে "পাঠভেদ" অংশে কয়েকটি পরিত্যক্ত পরিচ্ছেদের সহিত 'প্রচারে' প্রকাশিত উক্ত অংশ মিলাইয়া দেখিলেই দেখা যাইবে, বঙ্কিমচন্দ্র সীতারামকে দিয়া "হিন্দু-সাম্রাজ্য-স্থাপনে"র স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের হাতেই সেই স্বপ্ন ভাঙিয়া-চুরিয়া ছারখার হইয়াছে। এই কারণে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলির মধ্যে ট্র্যাজেডি হিসাবে 'সীতারাম'ই সর্ব্বাপেক্ষা শোচনীয় এবং ভয়াবহ। 'সীতারাম' উপন্যাসে হিন্দুধর্ম্ম অভ্যুদয়ের সূচনা আছে, কিন্তু পরিণতি নাই। সূচনার মুখেই তাহা ধ্বংস হইয়াছে।

১২৯৩ বঙ্গাব্দে ১৭ই ফাল্গুন (মার্চ, ১৮৮৭) 'সীতারাম' প্রথম পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়, পৃষ্ঠা-সংখ্যা ছিল ৪১৯। ইহা 'প্রচারে'রই প্রায় পুনর্মুদ্রণ। ১২৯৫ সালে প্রকাশিত

দ্বিতীয় সংস্করণে (পৃ. ৩০০) বহুল পরিবর্ত্তন সাধিত হয়, অনেকগুলি পরিচ্ছেদ ইহাতে পরিত্যক্ত হয়। তৃতীয় সংস্করণ বঙ্কিমচন্দ্রের জীবিতকালে মুদ্রিত হইলেও প্রকাশিত হইয়াছিল ১৩০১ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে, তাঁহার মৃত্যুর কয়েক দিন পরে।

বঙ্কিমচন্দ্রের শেষ তিনখানি উপন্যাস "ত্রয়ী" নামে খ্যাত। এই "ত্রয়ী" লইয়া অনেকে অনেক আলোচনা করিয়াছেন। 'বঙ্গবাণী' মাসিক-পত্রিকায় বিপিনচন্দ্র পাল ও 'নারায়ণে' পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই উপন্যাসগুলির মূল তত্ত্ব লইয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনীকারেরাও সংক্ষেপে এই "ত্রয়ী"-কথা বিবৃত করিয়াছেন। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে গিরিজাপ্রসন্ন রায় চৌধুরী-প্রণীত 'বঙ্কিমচন্দ্র' পুস্তকের তৃতীয় ভাগ প্রকাশিত হয়। ইহাতে 'সীতারামে'র নানা চরিত্র লইয়া বিস্তৃত আলোচনা আছে। ১৩২২ বঙ্গাব্দের বৈশাখ-সংখ্যা 'নারায়ণ' পত্রিকায় প্রকাশিত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের "বঙ্কিমচন্দ্রের ত্রয়ী" প্রবন্ধ উল্লেখযোগ্য। আমরা 'দেবী চৌধুরাণী'র ভূমিকায় এই প্রবন্ধের অংশবিশেষ উদ্ধৃত করিয়াছি। বিশেষভাবে 'সীতারাম' সম্বন্ধে তাঁহার বক্তব্য নিম্নে উদ্ধৃত হইল।—

> সীতারাম উপন্যাসে যেন দেবীচৌধুরাণীর obverse proposition solve বা কতকটা বিরোধী ভাবের ব্যঞ্জনা দেখান হইয়াছে। এখানে পুরুষ প্রকট; সীতারাম রায় কর্ম্মী ও তেজস্বী পুরুষ। তাঁহার তিন স্ত্রী—শ্রী, নন্দা এবং রমা। শ্রী যেন ঐশ্বর্য্য, নন্দা যেন হ্লাদিনী, রমা যেন স্ত্রী বা মোদিনী। রাজার রাণী যেমন হইতে হয়, ঘরণী-গৃহিণী যেমন হইতে হয়, নন্দা তেমনই।··· রমা যেন মোমের পুতুল, সোহাগের খুঁচি, যেন আদিরসের মঞ্জুষা,···কিন্তু শ্রী—সে কেমন নারী!··· শ্রী একটা প্রহেলিকা; সন্ন্যাসিনী ভৈরবী বটে, কিন্তু জগন্নাথের রথের দড়ীর টানের মত তাহার হৃদয়ে স্বামী-ঘর করিবার সাধটুকু বেশ জাগিতেছে। অথচ যখন সীতারাম তাহার দ্বারস্থ, তাহার জন্য পাগল, সে পাগলামীর ফলে রাজ্য যায়, স্বাধীনতা যায়, তখন শ্রী পাষাণী। এই পাষাণ ভাবটাই সীতারামের পুরুষকারের তাসের ঘর শেষে ভাঙ্গিয়া দিল।॥ শ্রীকে allegory বলিতে পারি না; কারণ, allegoryর হিসাবে শ্রীর চরিত্রোন্মেষ ঘটান হয় নাই। শ্রী একটা abstractionও নহে; কারণ, অমন ভাবে abstraction ফুটিয়া উঠে না।···সাধনশাস্ত্রের মাপকাঠিতে ইহা বুঝি না, আধুনিক ইউরোপীয় দর্শনশাস্ত্রের মাপকাঠি লইয়া ইহার পরিমাণ করিতে পারি না।···

'সীতারাম' রচনার সময় বঙ্কিমচন্দ্র প্রধানতঃ কলিকাতাতেই (হাবড়ার ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হিসাবে) বাস করিয়াছিলেন। ইহার অব্যবহিত পূর্ব্বে জাজপুর (কটক)-প্রবাসের স্মৃতি 'সীতারাম' রচনায় তাঁহাকে কিছু সাহায্য করিয়াছিল।

'সীতারামে'র শিবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়-কৃত ইংরেজী অনুবাদ ১৯০৩ সালে কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হয়। ১৯০১ সালে বি. বেঙ্কটাচার্য্য মহীশূর হইতে ইহার কানাড়ী অনুবাদ ও ১৯১০ সালে এস. টি. পিলাই মাদ্রাজ হইতে তামিল অনুবাদ প্রকাশ করেন।

কলিকাতার সাধারণ-রঙ্গালয়গুলিতে 'সীতারামে'র নাট্য-রূপ বহু বার প্রদর্শিত হইয়াছে। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৭এ অক্টোবর বসুমতী-কার্য্যালয়, গিরিশচন্দ্র ঘোষ-কৃত 'সীতারামে'র নাট্য-রূপ পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়াছেন; পুস্তকের আখ্যা-পত্রে ভ্রমক্রমে "অতুলকৃষ্ণ মিত্র কর্ত্তৃক নাট্যাকারে গ্রথিত" বলিয়া মুদ্রিত হইয়াছে। এ-সম্বন্ধে 'শনিবারের চিঠি'তে (আশ্বিন ১৩৫২) প্রকাশিত শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

সীতারাম

সর্ব্বশাস্ত্রে পণ্ডিত,

সর্ব্বগুণের আধার,

সকলের প্রিয়,

আমার বিশেষ স্নেহের পাত্র,

৺রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের

স্মরণার্থ

এই গ্রন্থ

উৎসর্গ করিলাম।

বিজ্ঞাপন

সীতারাম ঐতিহাসিক ব্যক্তি। এই গ্রন্থে সীতারামের ঐতিহাসিকতা কিছুই রক্ষা করা যায় নাই। গ্রন্থের উদ্দেশ্য ঐতিহাসিকতা নহে। যাঁহারা সীতারামের প্রকৃত ইতিহাস জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা Westland সাহেবের কৃত যশোহরের বৃত্তান্ত, এবং Stewart সাহেবের কৃত বাঙ্গালার ইতিহাস পাঠ করিবেন।

দ্বিতীয় বারের বিজ্ঞাপন

সীতারামের কিয়দংশ পরিত্যক্ত এবং কিয়দংশ পরিবর্ত্তিত হইল। গ্রন্থের আকার অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র হইল, এ জন্য ইহার দামও কমান গেল।

অর্জ্জুন উবাচ

জ্যায়সী চেৎ কর্ম্মণস্তে মতা বুদ্ধির্জনার্দ্দন।
তৎ কিং কর্ম্মণি ঘোরে মাং নিয়োজয়সি কেশব ॥
ব্যামিশ্রেণেব বাক্যেন বুদ্ধিং মোহয়সীব মে।
তদেকং বদ নিশ্চিত্য যেন শ্রেয়োঽহমাপ্নুয়াম্ ॥

শ্রীভগবানুবাচ

লোকেঽস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়ানঘ।
জ্ঞানযোগেন সাঙ্খ্যানাং কর্ম্মযোগেন যোগিনাম্ ॥
ন কর্ম্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে।
নচ সন্ন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি ॥
নহি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।
কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ ॥
কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে ॥
যস্ত্বিন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্যারভতেঽর্জ্জুন।
কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্ম্মযোগমসক্তঃ স বিশিষ্যতে ॥
নিয়তং কুরু কর্ম্ম ত্বং কর্ম্ম জ্যায়ো হ্যকর্ম্মণঃ।
শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিধ্যেদকর্ম্মণঃ ॥
যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর ॥

গীতা। ৩। ১-৯।

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে ॥
ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি ॥
রাগদ্বেষবিমুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্।
আত্মবশ্যৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি ॥

গীতা। ২। ৬২-৬৪।

প্রথম খণ্ড

দিবা—গৃহিণী

প্রথম পরিচ্ছেদ

পূর্ব্বকালে, পূর্ব্ববাঙ্গালায় ভূষণা নামে এক নগরী ছিল। এখন উহার নাম "ভূষ্‌নো।" যখন কলিকাতা নামে ক্ষুদ্র গ্রামের কুটীরবাসীরা বাঘের ভয়ে রাত্রে বাহির হইতে পারিত না, তখন সেই ভূষণায় একজন ফৌজদার বাস করিতেন। ফৌজদারেরা স্থানীয় গবর্ণর ছিলেন; এখনকার স্থানীয় গবর্ণর অপেক্ষা তাঁহাদের বেতন অনেক বেশী ছিল। সুতরাং ভূষণা স্থানীয় রাজধানী ছিল।

আজি হইতে প্রায় এক শত আশী বৎসর পূর্ব্বে এক দিন রাত্রিশেষে ভূষণা নগরের একটি সরু গলির ভিতর, পথের উপর এক জন মুসলমান ফকির শুইয়াছিল। ফকির, আড় হইয়া একেবারে পথ বন্ধ করিয়া শুইয়া আছে। এমন সময়ে সেখানে এক জন পথিক আসিয়া উপস্থিত হইল। পথিক বড় দ্রুত আসিতেছিল, কিন্তু ফকির পথ বন্ধ করিয়া শুইয়া আছে দেখিয়া, ক্ষুণ্ণ হইয়া দাঁড়াইল।

পথিক হিন্দু। জাতিতে উত্তররাঢ়ী কায়স্থ। তাহার নাম গঙ্গারাম দাস। বয়সে নবীন। গঙ্গারাম বড় বিপন্ন। বাড়ীতে মাতা মরে, অন্তিম কাল উপস্থিত। তাই তাড়াতাড়ি কবিরাজ ডাকিতে যাইতেছিল। এখন সম্মুখে পথ বন্ধ।

সে কালে মুসলমান ফকিরেরা বড় মান্য ছিল। খোদ আকবর শাহ ইসলাম ধর্ম্মে অনাস্থাযুক্ত হইয়াও এক জন ফকিরের আজ্ঞাকারী ছিলেন। হিন্দুরা ফকিরদিগকে সম্মান করিত, যাহারা মানিত না, তাহারা ভয় করিত। গঙ্গারাম সহসা ফকিরকে লঙ্ঘন করিয়া যাইতে সাহস করিলেন না। বলিলেন, "সেলাম শাহ সাহেব। আমাকে একটু পথ দিন।"

শাহ সাহেব নড়িল না, কোন উত্তরও করিল না।—গঙ্গারাম যোড়হাত করিল, বলিল, "আল্লা তোমার উপর প্রসন্ন হইবেন, আমার বড় বিপদ্। আমায় একটু পথ দাও।'

শাহ সাহেব নড়িলেন না। গঙ্গারাম যোড়হাত করিয়া অনেক অনুনয় বিনয় এবং কাতরোক্তি করিল, ফকির কিছুতেই নড়িল না, কথাও কহিল না। অগত্যা গঙ্গারাম তাহাকে লঙ্ঘন করিয়া গেল। লঙ্ঘন করিবার সময় গঙ্গারামের পা ফকিরের গায়ে ঠেকিয়াছিল; বোধ হয়, সেটুকু ফকিরের নষ্টামি। গঙ্গারাম বড় ব্যস্ত, কিছু না বলিয়া কবিরাজের বাড়ীর দিকে চলিয়া গেল। ফকিরও গাত্রোত্থান করিল—সে কাজির বাড়ীর দিকে চলিয়া গেল।

গঙ্গারাম কবিরাজের সাক্ষাৎ পাইয়া, তাহাকে আপনার বাড়ীতে ডাকিয়া আনিল; কবিরাজ তার মাকে দেখিল, নাড়ী টিপিল, বচন আওড়াইল, ঔষধের কথা দুই চারি বার বলিল, শেষে তুলসীতলা ব্যবস্থা করিল। তুলসীতলায় হরিনাম করিতে করিতে গঙ্গারামের মা পরলোক লাভ করিলেন। তখন গঙ্গারাম মার সৎকারের জন্য পাড়া প্রতিবাসীদিগকে ডাকিতে গেল। পাঁচ জন স্বজাতি যুটিয়া যথাবিধি গঙ্গারামের মার সৎকার করিল।

সৎকার করিয়া অপরাহ্ণে শ্রীনাম্নী ভগিনী এবং প্রতিবাসিগণ সঙ্গে গঙ্গারাম বাটী ফিরিয়া আসিতেছিলেন, এমন সময়ে দুই জন পাইক, ঢাল সড়কি-বাঁধা—আসিয়া গঙ্গারামকে ধরিল। পাইকেরা জাতিতে ডোম, গঙ্গারাম তাহাদিগের স্পর্শে বিষণ্ণ হইলেন। সভয়ে দেখিলেন, পাইকদিগের সঙ্গে সেই শাহ সাহেব। গঙ্গারাম জিজ্ঞাসা করিল, "কোথা যাইতে হইবে? কেন ধর?—আমি কি করিয়াছি?"

শাহ সাহেব বলিল, "কাফের! বদ্‌বখ্‌ত্! বেত্‌মিজ্! চল্।"

পাইকেরা বলিল, "চল্।"

এক জন পাইক ধাক্কা মারিয়া গঙ্গারামকে ফেলিয়া দিল। আর এক জন তাহাকে দুই চারিটা লাথি মারিল। এক জন গঙ্গারামকে বাঁধিতে লাগিল, আর এক জন তাহার ভগিনীকে ধরিতে গেল। সে উর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল। যে প্রতিবাসীরা সঙ্গে ছিল, তাহারা কে কোথা পলাইল, কেহ দেখিতে পাইল না। পাইকেরা গঙ্গারামকে বাঁধিয়া মারিতে মারিতে কাজির কাছে লইয়া গেল। ফকির মহাশয় দাড়ি নাড়িতে নাড়িতে হিন্দুদিগের দুর্নীতি সম্বন্ধে অতি দুর্বোধ্য ফার্‌সি ও আর্‌বি শব্দ সকল সংযুক্ত নানাবিধ বক্তৃতা করিতে করিতে সঙ্গে গেলেন।

গঙ্গারাম কাজি সাহেবের কাছে আনীত হইলে, তাহার বিচার আরম্ভ হইল। ফরিয়াদি শাহ সাহেব—সাক্ষীও শাহ সাহেব এবং বিচারকর্ত্তাও শাহ সাহেব। কাজি মহাশয় তাঁহাকে আসন ছাড়িয়া দিয়া দাঁড়াইলেন, এবং ফকিরের বক্তৃতা সমাপ্ত হইলে, কোরাণ ও নিজের চসমা এবং শাহ সাহেবের দীর্ঘবিলম্বিত শুভ্র শ্মশ্রুর সম্যক্ সমালোচনা করিয়া পরিশেষে আজ্ঞা প্রচার করিলেন যে, ইহাকে জীয়ন্ত পুঁতিয়া ফেল। যে যে হুকুম শুনিল, সকলেই শিহরিয়া উঠিল। গঙ্গারাম বলিল, "যা হইবার তা ত হইল, তবে আর মনের আক্ষেপ রাখি কেন?"

এই বলিয়া গঙ্গারাম শাহ সাহেবের মুখে এক লাথি মারিল। তোবা তোবা বলিতে বলিতে শাহ সাহেব মুখে হাত দিয়া ধরাশায়ী হইলেন। এ বয়সে তাঁর যে দুই চারিটি দাঁত অবশিষ্ট ছিল, গঙ্গারামের পাদস্পর্শে তাহার মধ্যে অনেকগুলিই মুক্তিলাভ করিল। তখন হামরাহি পাইকেরা ছুটিয়া আসিয়া গঙ্গারামকে ধরিল এবং কাজি সাহেবের আজ্ঞানুসারে

তাহার হাতে হাতকড়ি ও পায়ে বেড়ী দিল এবং যে সকল কথার অর্থ হয় না, এরূপ শব্দ প্রয়োগপূর্ব্বক তাহাকে গালি দিতে দিতে এবং ঘুসী, কীল ও লাথি মারিতে মারিতে কারাগারে লইয়া গেল। সে দিন সন্ধ্যা হইয়াছিল; সে দিন আর কিছু হয় না—পরদিন তাহার জীবন্তে কবর হইবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

যেখানে গাছতলায় পড়িয়া এলোচুলে মাটিতে লুটাইয়া গঙ্গারামের ভগিনী কাঁদিতেছিল, সেইখানে এ সংবাদ পৌছিল। ভগিনী শুনিল, ভাইয়ের কাল জীয়ন্তে কবর হইবে। তখন সে উঠিয়া বসিয়া চক্ষু মুছিয়া এলোচুল বাঁধিল।

গঙ্গারামের ভগিনী শ্রীর বয়স পঁচিশ বৎসর হইতে পারে। সে গঙ্গারামের অনুজা।

সংসারে গঙ্গারাম, গঙ্গারামের মা এবং শ্রী ভিন্ন কেহই ছিল না। গঙ্গারামের মা ইদানীং অতিশয় রুগ্না হইয়াছিলেন, সুতরাং শ্রীই ঘরের গৃহিণী ছিল। শ্রী সধবা বটে, কিন্তু অদৃষ্টক্রমে স্বামিসহবাসে বঞ্চিতা।

ঘরে একটি শালগ্রাম ছিল,—এতটুকু ক্ষুদ্র একখানি নৈবেদ্য দিয়া প্রত্যহ তাহার একটু পূজা হইত। শ্রী ও শ্রীর মা জানিত যে, ইনিই সাক্ষাৎ নারায়ণ। শ্রী চুল জড়াইয়া সেই শালগ্রামের ঘরের দ্বারের বাহিরে থাকিয়া মনে মনে অসংখ্য প্রণাম করিল। পরে হাত যোড় করিয়া বলিতে লাগিল, "হে নারায়ণ! হে পরমেশ্বর! হে দীনবন্ধু! হে অনাথনাথ! আমি আজ যে দুঃসাহসের কাজ করিব, তুমি ইহাতে সহায় হইও। আমি স্ত্রীলোক—পাপিষ্ঠা। আমা হইতে কি হইবে! তুমি দেখিও ঠাকুর!"

এই বলিয়া সেখান হইতে শ্রী অপসৃতা হইয়া বাটীর বাহিরে গেল। পাঁচকড়ির মা নামে তাহার এক বর্ষীয়সী প্রতিবাসিনী ছিল। ঐ প্রতিবাসিনীর সঙ্গে ইহাদিগের বিলক্ষণ আত্মীয়তা ছিল, সে শ্রীর মার অনেক কাজ কর্ম্ম করিয়া দিত। এক্ষণে তাহার নিকটে গিয়া শ্রী চুপি চুপি কি বলিল। পরে দুই জনে রাজপথে নিষ্ক্রান্ত হইয়া, অন্ধকারে গলি ঘুঁজি পার হইয়া অনেক্ পথ হাঁটিল। সে দেশে কোটা ঘর তত বেশী নয়, কিন্তু এখনকার অপেক্ষা তখন কোটা ঘর অধিক ছিল, মধ্যে মধ্যে একটি একটি বড় বড় অট্টালিকাও পাওয়া যাইত। ঐ দুই জন স্ত্রীলোক আসিয়া, এমনই একটা বড় অট্টালিকার সম্মুখে উপস্থিত হইল। বাড়ীর সম্মুখে দীঘি, দীঘিতে বাঁধা ঘাট। বাঁধা ঘাটের উপর কতকগুলা দ্বারবান্ বসিয়া, কেহ সিদ্ধি ঘুঁটিতেছিল, কেহ টপ্পা গাইতেছিল, কেহ স্বদেশের প্রসঙ্গে চিত্ত সমর্পণ করিতেছিল। তাহাদেরই মধ্যে এক জনকে ডাকিয়া পাঁচকড়ির মা বলিল, "পাঁড়ে

ঠাকুর। ভাণ্ডারীকে ডেকে দাও না?" দ্বারবান্ বলিল, "হাম্ পাঁড়ে নেহি, হাম্ মিশর হোতে হেঁ।"

পাঁচকড়ির মা। তা আমি জানি না, বাছা। পাঁড়ে কিসের বামুন? মিশর যেমন বামুন।

তখন মিশ্রদেব প্রসন্ন হইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোম্ ভাণ্ডারী লেকে কেয়া করোগে?"

পাঁচকড়ির মা। কি আর করিব? আমার ঘরে কতকগুলা নাউ কুম্ড়া তরকারী হয়েছে, তাই বলে যাব যে, কাল গিয়ে যেন কেটে নিয়ে আসে।

দ্বারবান্। আচ্ছা, সো হাম্ বোলেঙ্গে। তোম্ ঘর্‌মে যাও।

পাঁচকড়ির মা। ঠাকুর, তুমি বলিলে কি আর সে ঠিকানা পাবে কার ঘরে তরকারী হয়েছে?

দ্বারবান্। আচ্ছা। তোমারি নাম বোল্‌কে যাও।

পাঁচকড়ির মা। যা আবাগির বেটা। তোকে একটা নাউ দিতাম, তা তোর কপালে হলো না।

দ্বারবান্। আচ্ছা, তোম্ খাড়ি রহো। হাম্ ভাণ্ডারীকো বোলাতে হেঁ।

তখন মিশ্রঠাকুর গুন্ গুন্ করিয়া পিলু ভাঁজিতে ভাঁজিতে অট্টালিকামধ্যে প্রবেশ করিলেন, এবং অচিরাৎ জীবন ভাণ্ডারীকে সংবাদ দিলেন যে, "এক্‌ঠো তরকারিওয়ালি আয়ি হৈ। মুঝ্‌কো কুছ্ মেলেগা, তোম্‌কো বি কুছ্ মেল সক্‌তা হায়। তোম্ জল্‌দী আও।"

জীবন ভাণ্ডারীর বয়স কিছু বেশী, কতকগুলো চাবি ঘুন্‌সিতে ঝোলান। মুখ বড় রুক্ষ। কিঞ্চিৎ লাভের প্রত্যাশা পাইয়া সে শীঘ্র বাহির হইয়া আসিল। দেখিল, দুইটি স্ত্রীলোক দাঁড়াইয়া আছে। জিজ্ঞাসা করিল, "কে ডেকেছ গা?"

পাঁচকড়ির মা বলিল, "এই আমার ঘরে কিছু তরকারি হয়েছে, তাই ডেকেছি। কিছু বা তুমি নিও, কিছু বা দরওয়ান্‌জীকে দিও, আর কিছু বা সরকারীতে দিও।"

জীবন ভাণ্ডারী। তা তোর বাড়ী কোথা বলে যা, কাল যাব।

পাঁচকড়ির মা। আর একটি দুঃখী অনাথা মেয়ে এয়েছে, ও কি বল্‌বে একবার শোন।

শ্রী গলা পর্য্যন্ত ঘোম্‌টা টানিয়া প্রাচীরে মিশিয়া এক পাশে দাঁড়াইয়াছিল। জীবন ভাণ্ডারী তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া রুক্ষভাবে বলিল, "ও ভিক্ষে শিক্ষের কথা আমি হুজুরে কিছু বলিতে পারিব না।" পাঁচকড়ির মা তখন অস্ফুট স্বরে ভাণ্ডারী মহাশয়কে বলিল, "ভিক্ষে যদি কিছু পায় ত অর্দ্ধেক তোমার।"

ভাণ্ডারী মহাশয় তখন প্রসন্নবদনে বলিলেন, "কি বল মা ?" ভিখারির পক্ষে ভাণ্ডারীর প্রভুর দ্বার অবারিত। শ্রী ভিক্ষার অভিপ্রায় জানাইল, সুতরাং ভাণ্ডারী মহাশয় তাহাকে মুনিবের কাছে লইয়া যাইতে বাধ্য হইলেন।

ভাণ্ডারী শ্রীকে পৌছাইয়া দিয়া প্রভুর আজ্ঞামত চলিয়া গেল।

শ্রী আসিয়া দ্বারদেশে দাঁড়াইল। অবগুণ্ঠনবতী, বেপমানা। গৃহকর্ত্তা বলিলেন, "তুমি কে ?"

শ্রী বলিল, "আমি শ্রী।"

"শ্রী! তুমি তবে কি আমাকে চেন না ? না চিনিয়া আমার কাছে আসিয়াছ ? আমি সীতারাম রায়।"

তখন শ্রী মুখের ঘোম্‌টা তুলিল। সীতারাম দেখিলেন, অশ্রুপূর্ণ, বর্ষাবারি-নিষিক্ত পদ্মের ন্যায়, অনিন্দ্যসুন্দরমুখী। বলিলেন, "তুমি শ্রী! এত সুন্দরী!"

শ্রী বলিল, "আমি বড় দুঃখী। তোমার ব্যঙ্গের যোগ্য নহি।" শ্রী কাঁদিতে লাগিল।

সীতারাম বলিলেন, "এত দিনের পর কেন আসিয়াছ ? আসিয়াছ ত অত কাঁদিতেছ কেন ?"

শ্রী তবু কাঁদে—কথা কহে না। সীতারাম বলিল, "নিকটে এসো।"

তখন শ্রী অতি মৃদুস্বরে বলিল, "আমি বিছানা মাড়াইব না—আমার অশৌচ।"

সীতা। সে কি ?

গদ্‌গদস্বরে অশ্রুপূর্ণলোচনে শ্রী বলিতে লাগিল, "আজ আমার মা মরিয়াছেন।"

সীতারাম। সেই বিপদে পড়িয়া কি তুমি আজ আমার কাছে আসিয়াছ ?

শ্রী। না—আমার মার কাজ আমিই যথাসাধ্য করিব। সে জন্য তোমায় দুঃখ দিব না। কিন্তু আমার আজ ভারি বিপদ্!

সীতা। আর কি বিপদ্!

শ্রী। আমার ভাই যায়। কাজি সাহেব তাহার জীয়ন্তে কবরের হুকুম দিয়াছেন। সে এখন হাবুজখানায় আছে।

সীতা। সে কি ? কি করেছে ?

তখন শ্রী যাহা যাহা শুনিয়াছিল এবং যাহা যাহা দেখিয়াছিল, তাহা মৃদুস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে আদ্যোপান্ত বলিল। শুনিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া সীতারাম বলিলেন, "এখন উপায় ?"

শ্রী। এখন উপায় তুমি। তাই এত বৎসরের পর এসেছি।

সীতারাম। আমি কি করিব ?

শ্রী। তুমি কি করিবে? তবে কে করিবে? আমি জানি, তুমি সব পার।

সীতা। দিল্লীর বাদশাহের চাকর এই কাজি। দিল্লীর বাদশাহের সঙ্গে বিরোধ করে কার সাধ্য?

শ্রী বলিল, "তবে কি কোন উপায় নাই?"

সীতারাম অনেক ভাবিয়া বলিলেন, "উপায় আছে। তোমার ভাইকে বাঁচাইতে পারি। কিন্তু আমি মরিব।"

শ্রী। দেখ, দেবতা আছেন, ধর্ম্ম আছেন, নারায়ণ আছেন। কিছুই মিথ্যা নয়। তুমি দীন দুঃখীকে বাঁচাইলে তোমার কখনও অমঙ্গল হইবে না। হিন্দুকে হিন্দু না রাখিলে কে রাখিবে?

সীতারাম অনেক ক্ষণ ভাবিল। পরে বলিল, "তুমি সত্যই বলিয়াছ, হিন্দুকে হিন্দু না রাখিলে কে রাখিবে? আমি তোমার কাছে স্বীকার করিলাম, গঙ্গারামের জন্য আমি যথাসাধ্য করিব।"

তখন প্রীতমনে ঘোম্‌টা টানিয়া শ্রী প্রস্থান করিল।

সীতারাম দ্বার অর্গলবদ্ধ করিয়া ভৃত্যকে আদেশ করিলেন, "আমি যত ক্ষণ না দ্বার খুলি, তত ক্ষণ আমাকে কেহ না ডাকে।" মনে মনে একবার আবার ভাবিলেন, "শ্রী এমন শ্রী? তা ত জানি না। আগে শ্রীর কাজ করিব, তার পর অন্য কথা।" ভাবিলেন, "হিন্দুকে হিন্দু না রাখিলে কে রাখিবে?"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সীতারামের এক গুরুদেব ছিলেন। তিনি ভট্টাচার্য্য অধ্যাপক গোছ মানুষ, তসর নামাবলী পরা, মাথাটি যত্নপূর্ব্বক কেশশূন্য করিয়াছেন, অবশিষ্ট আছে—কেবল এক "রেফ।" কেশাভাবে চন্দনের যথেষ্ট ঘটা,—খুব লম্বা ফোঁটা, আর আর বামুনগিরির সমান সব আছে। তাঁহার নাম চন্দ্রচূড় তর্কালঙ্কার। তিনি সীতারামের নিতান্ত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। সীতারাম যখন যেখানে বাস করিতেন, চন্দ্রচূড়ও তখন সেইখানে বাস করিতেন। সম্প্রতি ভূষণায় বাস করিতেছিলেন। আমরা আজিকার দিনেও এমন দুই এক জন অধ্যাপক দেখিয়াছি যে, টোলে ব্যাকরণ সাহিত্য পড়াইতে যেমন পটু, অশাসিত তালুকে দাঙ্গা করিতেও তেমনি মজবুত। চন্দ্রচূড় সেই শ্রেণীর লোক।

কিছু ক্ষণ পরে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া সীতারাম গুরুদেবের নিকেতনে উপস্থিত হইলেন। চন্দ্রচূড়ের সঙ্গে নিভৃতে সীতারামের অনেক কথা হইল। কি কি কথা হইল,

তাহা আমাদের সবিস্তারে লিখিবার প্রয়োজন নাই। কথাবার্ত্তার ফল এই হইল যে, সীতারাম ও চন্দ্রচূড় উভয়ে সেই রাত্রিতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া সহরের অনেক লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন, এবং সীতারাম রাত্রিশেষে গৃহে ফিরিয়া আসিয়া আপনার পরিবারবর্গ একজন আত্মীয় লোকের সঙ্গে মধুমতীপারে পাঠাইয়া দিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

এক খুব বড় ফর্‌দা জায়গায়, সহরের বাহিরে, গঙ্গারাম দাসের কবর প্রস্তুত হইয়াছিল। বন্দী সেখানে আসিবার আগেই লোক আসিতে আরম্ভ হইল। অতি প্রত্যূষে,—তখনও গাছের আশ্রয় হইতে অন্ধকার সরিয়া যায় নাই—অন্ধকারের আশ্রয় হইতে নক্ষত্র সব সরিয়া যায় নাই, এমন সময়ে দলে দলে পালে পালে জীয়ন্ত মানুষের কবর দেখিতে লোক আসিতে লাগিল। একটা মানুষ মরা, জীবিতের পক্ষে একটা পর্ব্বের সমান। যখন সূর্য্যোদয় হইল, তখন মাঠ প্রায় পূরিয়া গিয়াছে, অথচ নগরের সকল গলি, পথ, রাস্তা হইতে পিপীলিকাশ্রেণীর মত মনুষ্য বাহির হইতেছে। শেষ সে বিস্তৃত স্থানেও স্থানাভাব হইয়া উঠিল। দর্শকেরা গাছে উঠিয়া কোথাও হনূমানের মতন আসীন—যেন লাঙ্গুলাভাবে কিঞ্চিৎ বিরস;—কোথাও বাদুড়ের মত দুল্যমান, দিনোদয়ে যেন কিঞ্চিৎ সরস। পশ্চাতে, নগরের যে কয়টা কোটাবাড়ী দেখা যাইতেছিল, তাহার ছাদ মানুষে ভরিয়া গিয়াছে, আর স্থান নাই। কাঁচা ঘরই বেশী, তাহাতেও মই লাগাইয়া, মইয়ে পা রাখিয়া, অনেকে চালে বসিয়া দেখিতেছে। মাঠের ভিতর কেবল কালো মাথার সমুদ্র—ঠেসাঠেসি, মিশামিশি। কেবল মানুষ আসিতেছে, জমাট বাঁধিতেছে, সরিতেছে, ঘুরিতেছে, ফিরিতেছে, আবার মিশিতেছে। কোলাহল অতিশয় ভয়ানক। বন্দী এখনও আসিল না দেখিয়া দর্শকেরা অতিশয় অধীর হইয়া উঠিল। চীৎকার, গণ্ডগোল, বকাবকি, মারামারি আরম্ভ করিল। হিন্দু মুসলমানকে গালি দিতে লাগিল, মুসলমান হিন্দুকে গালি দিতে লাগিল। কেহ বলে, "আল্লা!" কেহ বলে, "হরিবোল!" কেহ বলে, "আজ হবে না, ফিরে যাই!" কেহ বলে, "ঐ এয়েছে দেখ্।" যাহারা বৃক্ষারূঢ়, তাহারা কার্য্যাভাবে গাছের পাতা, ফুল, এবং ছোট ছোট ডাল ভাঙ্গিয়া নিম্নচারীদিগের মাথার উপর ফেলিতে লাগিল। কেহ কেহ তাহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া নিষ্ঠীবন প্রক্ষেপ করিতে লাগিল। এই সকল কারণে, যেখানে যেখানে বৃক্ষ, সেইখানে সেইখানে তলচারী এবং শাখাবিহারীদিগের ভীষণ কোন্দল উপস্থিত হইতে লাগিল। কেবল একটি গাছের তলায় সেরূপ গোলযোগ নাই। সে বৃক্ষের তলে বড় লোক দাঁড়ায় নাই। সমুদ্রমধ্যে ক্ষুদ্র দ্বীপের মত তাহা প্রায়

জনশূন্য। দুই চারি জন লোক সেখানে আছে বটে, কিন্তু তাহারা কোন গোলযোগ করিতেছে না; নিঃশব্দ। কেবল অন্য কোন লোক সে বৃক্ষতলে দাঁড়াইতে আসিলে, তাহারা উহাদিগকে গলা টিপিয়া বাহির করিয়া দিতেছে। তাহাদিগকে বড় বড় যোয়ান ও হাতে বড় বড় লাঠি দেখিয়া সকলে নিঃশব্দে সরিয়া যাইতেছে। সেই বৃক্ষের শিকড়ের উপর দাঁড়াইয়া কেবল এক জন স্ত্রীলোক বৃক্ষকাণ্ড অবলম্বন করিয়া ঊর্দ্ধমুখে বৃক্ষারূঢ় কোন ব্যক্তির সঙ্গে কথা কহিতেছে। তাহার চোখ মুখ ফুলিয়াছে; বেশভূষা বড় আলুথালু—যেন সমস্ত রাত্রি কাঁদিয়াছে। কিন্তু এখন আর কাঁদিতেছে না। যে বৃক্ষারূঢ়, তাহাকে ঐ স্ত্রীলোক বলিতেছে, "ঠাকুর! এখন কিছু দেখা যায় না।"

বৃক্ষারূঢ় ব্যক্তি উপর হইতে বলিল, "না।"

"তবে বোধ হয়, নারায়ণ রক্ষা করিলেন।"

পাঠক বুঝিয়া থাকিবেন যে, এই স্ত্রীলোক শ্রী। বৃক্ষোপরি স্বয়ং চন্দ্রচূড় তর্কালঙ্কার। বৃক্ষশাখা ঠিক তাঁর উপযুক্ত স্থান নহে, কিন্তু তর্কালঙ্কার মনে করিতেছিলেন, "আমি ধর্ম্মাচরণনিযুক্ত, ধর্ম্মের জন্য সকলই কর্ত্তব্য।"

শ্রীর কথার উত্তরে চন্দ্রচূড় বলিলেন, "নারায়ণ অবশ্য রক্ষা করিবেন। আমার সে ভরসা আছে। তুমি উতলা হইও না। কিন্তু এখনও রক্ষার উপায় হয় নাই বোধ হইতেছে। কতকগুলা লালপাগড়ি আসিতেছে, দেখিতে পাইতেছি।"

শ্রী। কিসের লাল পাগড়ি?

চন্দ্রচূড়। বোধ হয় ফৌজদারি সিপাহী।

বাস্তবিক দুই শত ফৌজদারি সিপাহী সশস্ত্র শ্রেণীবদ্ধ হইয়া গঙ্গারামকে ঘেরিয়া লইয়া আসিতেছিল। দেখিয়া সেই অসংখ্য জনতা একেবারে নিস্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল। যেমন যেমন দেখিতে লাগিলেন, চন্দ্রচূড় সেইরূপ শ্রীকে বলিতে লাগিলেন। শ্রী জিজ্ঞাসা করিল, "কত সিপাই?"

চন্দ্র। দুই শত হইবে।

শ্রী। আমরা দীন দুঃখী—নিঃসহায়। আমাদের মারিবার জন্য এত সিপাহী কেন?

চন্দ্র। বোধ হয়, বহু লোকের সমাগম হইয়াছে শুনিয়া, সতর্ক হইয়া ফৌজদার এত সিপাহী পাঠাইয়াছেন।

শ্রী। তার পর কি হইতেছে?

চন্দ্র। সিপাহীরা আসিয়া, শ্রেণী বাঁধিয়া, প্রস্তুত কবরের নিকট দাঁড়াইল। মধ্যে গঙ্গারাম। পিছনে খোদ কাজি, আর সেই ফকির।

শ্রী। দাদা কি করিতেছেন?

চন্দ্র। পাপিষ্ঠেরা তার হাতে হাতকড়ি, পায়ে বেড়ী দিয়াছে।

শ্রী। কাঁদিতেছেন কি ?

চন্দ্র। না। নিঃশব্দ—নিস্তব্ধ। মূর্ত্তি বড় গম্ভীর, বড় সুন্দর।

শ্রী। আমি একবার দেখিতে পাই না ? জন্মের শোধ দেখিব।

চন্দ্র। দেখিবার সুবিধা আছে। তুমি এই নীচের ডালে উঠিতে পার ?

শ্রী। আমি স্ত্রীলোক, গাছে উঠিতে জানি না।

চন্দ্র। এ কি লজ্জার সময় মা ?

শিকড় হইতে হাত দুই উঁচুতে একটি সরল ডাল ছিল। সে ডালটি উঁচু হইয়া না উঠিয়া, সোজা হইয়া বাহির হইয়া গিয়াছিল। হাতখানিক গিয়া, ঐ ডাল দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছিল। সেই দুই ডালের উপর দুইটি পা দিয়া, নিকটস্থ আর একটি ডাল ধরিয়া দাঁড়াইবার বড় সুবিধা। চন্দ্রচূড় শ্রীকে ইহা দেখাইয়া দিলেন। শ্রী লজ্জা ত্যাগ করিয়া উঠিবার চেষ্টা করিল—শ্মশানে লজ্জা থাকে না।

প্রথম দুই একবার চেষ্টা করিয়া উঠিতে পারিল না—কাঁদিতে লাগিল। তার পর, কি কৌশলে কে জানে, শ্রী ত জানে না—সে সেই নিম্ন শাখায় উঠিয়া, সেই যোড়া ডালে যুগল চরণ রাখিয়া, আর একটি ডাল ধরিয়া দাঁড়াইল।

তাতে বড় গোলযোগ উপস্থিত হইল। যেখানে শ্রী দাঁড়াইয়াছিল, সেখানে সম্মুখদিকে পাতার আবরণ ছিল না—শ্রী সেই অসংখ্য জনতার সম্মুখবর্ত্তিনী হইয়া দাঁড়াইল। সকলে দেখিল, সহসা অতুলনীয়া রূপবতী বৃক্ষের ডাল ধরিয়া, শ্যামল পত্ররাশিমধ্যে বিরাজ করিতেছে। প্রতিমার ঠাটের মত, চারি দিকে বৃক্ষশাখা, বৃক্ষপত্র ঘেরিয়া রহিয়াছে ; চুলের উপর পাতা পড়িয়াছে, স্থূল বাহুর উপর পাতা পড়িয়াছে, বক্ষঃস্থ কেশদাম কতক কতক মাত্র ঢাকিয়া পাতা পড়িয়াছে, একটি ডাল আসিয়া পা দুখানি ঢাকিয়া ফেলিয়াছে, কেহ দেখিতে পাইতেছে না, এ মূর্ত্তিমতী বনদেবী কিসের উপর দাঁড়াইয়াছে। দেখিয়া নিকটস্থ জনতা বাত্যাতাড়িত সাগরবৎ, সহসা সংক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল।

শ্রী তাহা কিছুই জানিতে পারিল না। আপনার অবস্থান প্রতি তাহার কিছুমাত্র মনোযোগ ছিল না। অনিমেষলোচনে গঙ্গারামের পানে চাহিয়া দেখিতেছিল, দুই চক্ষু দিয়া অবিরল জলধারা পড়িতেছিল। এমন সময়ে শাখান্তর হইতে চন্দ্রচূড় ডাকিয়া বলিলেন, "এ দিকে দেখ ! এ দিকে দেখ। ঘোড়ার উপর কে আসিতেছে ?"

শ্রী দিগন্তরে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিল, ঘোড়ার উপর কে আসিতেছে। যোদ্ধৃবেশ, অথচ নিরস্ত্র। অশ্বী বড় তেজস্বিনী, কিন্তু লোকের ভিড় ঠেলিয়া আগুইতে পারিতেছে

না। অশ্বী নাচিতেছে, দুলিতেছে, গ্রীবা বাঁকাইতেছে, কিন্তু তবু বড় আশু হইতে পারিতেছে না। শ্রী চিনিলেন, অশ্বপৃষ্ঠে সীতারাম।

এ দিকে গঙ্গারামকে সিপাহীরা করবে ফেলিতেছিল। সেই সময়ে দুই হাত তুলিয়া সীতারাম নিষেধ করিলেন। সিপাহীরা নিরস্ত হইল। শাহ সাহেব বলিলেন, "কিয়া দেখ্‌তে হো। কাফেরকো মাট্টি দেও।"

কাজি সাহেব ভাবিলেন। কাজি সাহেবের সে সময়ে সেখানে আসিবার কোন প্রয়োজন ছিল না, কেবল জনতা শুনিয়া শখ করিয়া আসিয়াছিলেন। যখন আসিয়াছিলেন, তখন তিনিই কর্ত্তা। তিনি বলিলেন, "সীতারাম যখন বারণ করিতেছে, তখন কিছু কারণ আছে। সীতারাম আসা পর্য্যন্ত বিলম্ব কর।"

শাহ সাহেব অসন্তুষ্ট হইলেন, কিন্তু অগত্যা সীতারাম পৌঁছান পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইল। গঙ্গারামের মনে একটু আশার সঞ্চার হইল।

সীতারাম কাজি সাহেবের নিকট পৌঁছিলেন। অশ্ব হইতে অবতরণপূর্ব্বক প্রণতমস্তকে শাহ সাহেবকে বিনয়পূর্ব্বক অভিবাদন করিলেন। তৎপরে কাজি সাহেবকে তদ্রূপ করিলেন। কাজি সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন, রায় সাহেব। আপনার মেজাজ সরীফ্।"

সীতারাম। অলহম্-দল্-ইল্লা। মেজাজে মবারকের সংবাদ পাইলেই এ ক্ষুদ্র প্রাণী চরিতার্থ হয়।

কাজি। খোদা নফরকে যেমন রাখিয়াছেন। এখন এই উমর, বাল সফেদ, কাজা পৌঁছিলেই হয়। দৌলতখানার কুশল সংবাদ ত?

সীতা। হজুরের একবালে গরিবখানার অমঙ্গলের সম্ভাবনা কি?

কাজি। এখন এখানে কি মনে করিয়া?

সীতা। এই গঙ্গারাম—বদ্‌বখ্‌ত্—বেত্‌মিজ্‌ যাই হৌক, আমার স্বজাতি। তাই দুঃখে পড়িয়া হজুরে হাজির হইয়াছি, জান বখ্‌শিশ্‌ ফরমায়েস্ করুন।

কাজি। সে কি? তাও কি হয়?

সীতা। মেহেরবান ও কদরদান সব পারে।

কাজি। খোদা মালেক। আমা হইতে এ বিষয়ের কিছু হইবে না।

সীতা। হাজার আসরফি জরমানা দিবে। জান বখ্‌শিশ্ ফরমায়েস্ করুন।

কাজি সাহেব ফকিরের মুখ পানে চাহিলেন। ফকির ঘাড় নাড়িল। কাজি বলিলেন, "সে সব কিছু হইবে না। কবরমে কাফেরকো ডারো।"

সীতা। দুই হাজার আসরফি দিব। আমি যোড় হাত করিতেছি, গ্রহণ করুন। আমার খাতির।

কাজি ফকিরের মুখ পানে চাহিল, ফকির নিষেধ করিল, সে কথাও উড়িয়া গেল। শেষ সীতারাম চারি হাজার আসরফি স্বীকার করিল। তাও না। পাঁচ হাজার—তাও না। আট হাজার—দশ হাজার, তাও না; সীতারামের আর নাই। শেষ সীতারাম জানু পাতিয়া করযোড় করিয়া অতি কাতরস্বরে বলিলেন, "আমার আর নাই। তবে, আর অন্য যা কিছু আছে, তাও দিতেছি। আমার তালুক মুলুক, জমি জেওরাত, বিষয় আশয় সর্ব্বস্ব দিতেছি। সব গ্রহণ করুন। উহাকে ছাড়িয়া দিন।"

কাজি সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "ও তোমার এমন কে যে, উহার জন্য সর্ব্বস্ব দিতেছ?"

সীতা। ও আমার যেই হৌক, আমি উহার প্রাণদানে স্বীকৃত—আমি সর্ব্বস্ব দিয়া উহার প্রাণ রাখিব। এই আমাদের হিন্দুর ধর্ম্ম।

কাজি। হিন্দুধর্ম্ম যাহাই হৌক, মুসলমানের ধর্ম্ম তাহার বড়। এ ব্যক্তি মুসলমান ফকিরের অপমান করিয়াছে, উহার প্রাণ লইব—তাহাতে সন্দেহ নাই। কাফেরের প্রাণ ভিন্ন ইহার আর অন্য দণ্ড নাই।

তখন সীতারাম জানু পাতিয়া কাজি সাহেবের আলখাল্লার প্রান্তভাগ ধরিয়া, বাষ্পগদ্গদস্বরে বলিতে লাগিলেন, "কাফেরের প্রাণ? আমিও কাফের। আমার প্রাণ লইলে এ প্রায়শ্চিত্ত হয় না? আমি এই কবরে নামিতেছি—আমাকে মাটি চাপা দিউন—আমি হরিনাম করিতে করিতে বৈকুণ্ঠে যাইব—আমার প্রাণ লইয়া এই দুঃখীর প্রাণদান করুন। দোহাই তোমার কাজি সাহেব। তোমার যে আল্লা, আমারও সেই বৈকুণ্ঠেশ্বর। ধর্ম্মাচরণ করিও। আমি প্রাণ দিতেছি—বিনিময়ে এই ক্ষুদ্র ব্যক্তির প্রাণদান কর।"

কথাটা নিকটস্থ হিন্দু দর্শকেরা শুনিতে পাইয়া হরিধ্বনি দিয়া উঠিল। করতালি দিয়া বলিতে লাগিল, "ধন্য রায়জী। ধন্য রায় মহাশয়। জয় কাজি সাহেবকা। গরিবকে ছাড়িয়া দেও।"

যাহারা কথা কিছুই শুনিতে পায় নাই, তাহাবাও হরিধ্বনি শুনিয়া হরিধ্বনি দিতে লাগিল। তুমুল কোলাহল পড়িয়া গেল। কাজি সাহেবও বিস্মিত হইয়া সীতারামকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কি বলিতেছেন, রায় মহাশয়। এ আপনার কে যে, ইহার জন্য আপনার প্রাণ দিতে চাহিতেছেন?"

সীতা। এ আমার ভ্রাতার অপেক্ষা, পুত্রের অপেক্ষাও আত্মীয়; কেন না, আমার শরণাগত। হিন্দুশাস্ত্রের বিধি এই যে, সর্ব্বস্ব দিয়া, প্রাণ দিয়া শরণাগতকে রক্ষা করিবে।

রাজা ঔশীনর, আপনার শরীরের সকল মাংস কাটিয়া দিয়া একটি পায়রাকে রক্ষা করিয়াছিলেন। অতএব আমাকে গ্রহণ করুন—ইহাকে ছাড়ুন।

কাজি সাহেব সীতারামের উপর কিছু প্রসন্ন হইলেন। শাহ সাহেবকে অন্তরালে লইয়া চুপি চুপি কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। বলিলেন, "এ ব্যক্তি দশ হাজার আসরফি দিতে চাহিতেছে। নিলে সরকারি তহবিলে কিছু সুসার হইবে। দশ হাজার আসরফি লইয়া, এই হতভাগ্যকে ছাড়িয়া দিলে হয় না?"

শাহ সাহেব বলিলেন, "আমার ইচ্ছা, দুইটাকেই এক কবরে পুঁতি। আপনি কি বলেন?"

কাজি। তোবা! আমি তাহা পারিব না। সীতারাম কোন অপরাধ করে নাই—বিশেষ এ ব্যক্তি মান্য, গণ্য ও সচ্চরিত্র। তা হইবে না।

এতক্ষণ গঙ্গারাম কোন কথা কহে নাই, মনে জানিত যে, তাহার নিষ্কৃতি নাই। কিন্তু শাহ সাহেবের সঙ্গে কাজি সাহেবের নিভৃতে কথা হইতেছে দেখিয়া সে যোড় হাত করিয়া কাজি সাহেবকে বলিল, "হুজুরের মর্‌জি মবারকে কি হয় বলিতে পারি না, কিন্তু এ গরিবের প্রাণ রক্ষা সম্বন্ধে গরিবেরও একটা কথা শুনিতে হয়। একের অপরাধে অন্যের প্রাণ লইবেন, এ কোন্ সরায় আছে? সীতারামের প্রাণ লইয়া, আমায় প্রাণদান দিবেন—আমি এমন প্রাণদান লইব না। এই হাতকড়ি মাথায় মারিয়া আপনার মাথা ফাটাইব।"

তখন ভিড়ের ভিতর হইতে কে ডাকিয়া বলিল, "হাতকড়ি মাথায় মারিয়াই মর। মুসলমানের হাত এড়াইবে।"

বক্তা, স্বয়ং চন্দ্রচূড় ঠাকুর। তিনি আর গাছে নাই। এক জন জমাদার শুনিয়া বলিল, "পাকড়ো বস্কো।" কিন্তু চন্দ্রচূড় তর্কালঙ্কারকে পাক্‌ড়ান বড় শক্ত কথা। সে কাজ হইল না।

এ দিকে হাতকড়ি মাথায় মারার কথা শুনিয়া ফকির মহাশয়ের কিছু ভয় হইল, পাছে জীয়ন্ত মানুষ পোঁতার সুখে তিনি বঞ্চিত হন। কাজি সাহেবকে বলিলেন, "এখন আর উহার হাতকড়িতে প্রয়োজন কি? হাতকড়ি খসাইতে বলুন।"

কাজি সাহেব সেইরূপ হুকুম দিলেন। কামার আসিয়া গঙ্গারামের হাত মুক্ত করিল। কামার সেখানে উপস্থিত থাকিবার প্রয়োজন ছিল না, তবে সরকারি বেড়ি হাতকড়ি সব তাহার জিম্মা, সেই উপলক্ষে সে আসিয়াছিল। তাহার ভিতর কিছু গোপন কথাও ছিল। রাত্রিশেষে কর্ম্মকার মহাশয় চন্দ্রচূড় ঠাকুরের কিছু টাকা খাইয়াছিলেন।

তখন ফকির বলিল, "আর বিলম্ব কেন? উহাকে গাড়িয়া ফেলিতে হুকুম দিন।"

শুনিয়া কামার বলিল, "বেড়ি পায়ে থাকিবে কি? সরকারি বেড়ি নোক্‌সান্‌ হইবে কেন? এখন ভাল লোহা বড় পাওয়া যায় না। আর বদমায়েসেরও এত হুড়াহুড়ি পড়িয়া গিয়াছে যে, আমি আর বেড়ি যোগাইতে পারিতেছি না।" শুনিয়া কাজি সাহেব বেড়ি খুলিতে হুকুম দিলেন। বেড়ি খোলা হইল।

শৃঙ্খল-মুক্ত হইয়া গঙ্গারাম দাঁড়াইয়া একবার এদিক্‌ ওদিক্‌ দেখিল। তার পর গঙ্গারাম এক অদ্ভুত কাজ করিল। নিকটে সীতারাম ছিলেন; ঘোড়ার চাবুক তাঁহার হাতে ছিল। সহসা তাঁহার হাত হইতে সেই চাবুক কাড়িয়া লইয়া গঙ্গারাম এক লম্ফে সীতারামের শূন্য অশ্বের উপর উঠিয়া অশ্বকে দারুণ আঘাত করিল। তেজস্বী অশ্ব আঘাতে ক্ষিপ্ত হইয়া এক লম্ফে কবরের খাদ পার হইয়া সিপাহীদিগের উপর দিয়া চলিয়া গিয়া জনতার ভিতর প্রবেশ করিল।

যতক্ষণে একবার বিদ্যুৎ চমকে, ততক্ষণে এই কাজ সম্পন্ন হইল। দেখিয়া, সেই লোকারণ্যমধ্যে তুমুল হরিধ্বনি পড়িয়া গেল। সিপাহীরা "পাক্‌ড়ো পাক্‌ড়ো" বলিয়া পিছু পিছু ছুটিল। কিন্তু তাহাতে একটা ভারী গোলযোগ উপস্থিত হইল। বেগবান্‌ অশ্বের সম্মুখ হইতে লোকে ভয়ে সরিয়া যাইতে লাগিল, গঙ্গারাম পথ পাইতে লাগিল, কিন্তু সিপাহীরা পথ পাইল না। তাহাদের সম্মুখে লোক জমাট বাঁধিয়া দাঁড়াইল। তখন তাহারা হাতিয়ার চালাইয়া পথ করিবার উদ্যোগ করিল।

সেই সময়ে তাহারা সবিস্ময়ে দেখিল যে, কালান্তক যমের ন্যায় কতকগুলি বলিষ্ঠ অস্ত্রধারী পুরুষ, একে একে ভিড়ের ভিতর হইতে আসিয়া সারি দিয়া তাহাদের সম্মুখে পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইল। তখন আরও সিপাহী আসিল। দেখিয়া আরও ঢাল শড়কীওয়ালা হিন্দু আসিয়া তাহাদের পথ রোধ করিল। তখন দুই দলে ভারী দাঙ্গা উপস্থিত হইল।

দেখিয়া, সক্রোধে কাজি সাহেব সীতারামকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কি ব্যাপার?"

সীতা। আমি ত কিছু বুঝিতে পারিতেছি না।

কাজি। বুঝিতে পারিতেছ না? আমি বুঝিতে পারিতেছি, এ তোমারই খেলা।

সীতা। তাহা হইলে আপনার কাছে নিরস্ত্র হইয়া, মৃত্যুভিক্ষা চাহিতে আসিতাম না।

কাজি। আমি এখন তোমার সে প্রার্থনা মঞ্জুর করিব। এ কবরে তোমাকেই পুঁতিব।

এই বলিয়া কাজি সাহেব কামারকে হুকুম দিলেন, "ইহারই হাতে পায়ে ঐ হাতকড়ি, বেড়ি লাগাও।" দ্বিতীয় ব্যক্তিকে তিনি ফৌজদারের নিকট পাঠাইলেন—

ফৌজদার সাহেব যাহাতে আরও সিপাহী লইয়া স্বয়ং আইসেন, এমন প্রার্থনা জানায়। ফৌজদারের নিকট লোক গেল। কামার আসিয়া সীতারামকে ধরিল। সেই বৃক্ষারূঢ়া বনদেবী শ্রী তাহা দেখিল।

এ দিকে গঙ্গারাম কষ্টে অথচ নির্ব্বিঘ্নে অশ্ব লইয়া লোকারণ্য হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। কষ্টে—কেন না, আসিতে আসিতে দেখিলেন যে, সেই জনতামধ্যে একটা ভারী গণ্ডগোল উপস্থিত হইল। কোলাহল ভয়ানক হইল, লোকসকল সম্মুখে ছুটিতে লাগিল। তাঁহার অশ্ব এই সকলে অতিশয় ভীত হইয়া দুর্দ্দমনীয় হইয়া উঠিল। অশ্বারোহণের কৌশল গঙ্গারাম তেমন জানিতেন না; ঘোড়া সামলাইতেই তাঁহাকে এত ব্যতিব্যস্ত হইতে হইল যে, তিনি আর কোন দিকে চাহিয়া দেখিতে পারিলেন না যে, কোথায় কি হইতেছে। কেবল "মার! মার!" একটা শব্দ কাণে গেল।

লোকারণ্য হইতে কোন মতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গঙ্গারাম অশ্বকে ছাড়িয়া দিয়া, এক বটবৃক্ষে আরোহণ করিলেন, দেখিবেন—কি হইতেছে। দেখিলেন, ভারী গোলযোগ। সেই মহতী জনতা দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। এক দিকে সব মুসলমান—আর এক দিকে সব হিন্দু। মুসলমানদিগের অগ্রভাগে কতকগুলি সিপাহী, হিন্দুদিগের অগ্রভাগে কতকগুলি ঢাল শড়কীওয়ালা। হিন্দুরা বাছা বাছা যোয়ান, আর সংখ্যাতে বেশী। মুসলমানেরা তাহাদিগের কাছে হঠিতেছে। অনেকে পলাইতেছে। হিন্দুরা "মার মার" শব্দে পশ্চাদ্ধাবিত হইতেছে।

এই মার্ মার্ শব্দে আকাশ, প্রান্তর, কানন প্রতিধ্বনিত হইতেছিল। যে লড়াই করিতেছে, সেও মার্ মার্ শব্দ করিতেছে, যে লড়াই না করিতেছে, সেও মার্ মার্ শব্দ করিতেছে। মার্ মার্ শব্দে হিন্দুরা চারি দিক্ হইতে চারি দিকে ছুটিতেছে। আবার গঙ্গারাম সবিস্ময়ে শুনিলেন, যাহারা এই মার্ মার্ শব্দ করিতেছে, তাহারা মধ্যে মধ্যে বলিতেছে, "জয় চণ্ডিকে! মা চণ্ডী এয়েছেন! চণ্ডীর হুকুম, মার্ মার্! মার্! জয় চণ্ডিকে!" গঙ্গারাম ভাবিলেন, "এ কি এ?" তখন দেখিতে দেখিতে গঙ্গারাম দেখিলেন, মহামহীরুহের শ্যামল-পল্লবরাশি-মণ্ডিতা চণ্ডীমূর্ত্তি, দুই শাখায় দুই চরণ স্থাপন করিয়া, বাম হস্তে এক কোমল শাখা ধরিয়া, দক্ষিণ হস্তে অঞ্চল ঘুরাইতে ঘুরাইতে ডাকিতেছে, "মার্! মার্! শত্রু মার্!"—অঞ্চল ঘুরিতেছে, অনাবৃত আলুলায়িত কেশদাম বায়ুভরে উড়িতেছে—দৃপ্ত পদভরে যুগল শাখা দুলিতেছে, উঠিতেছে, নামিতেছে,—সঙ্গে সঙ্গে সেই মধুরিমময় দেহ উঠিতেছে, নামিতেছে—যেন সিংহবাহিনী সিংহপৃষ্ঠে দাঁড়াইয়া রণরঙ্গে নাচিতেছে। যেন মা অসুর-বধে মত্ত হইয়া ডাকিতেছেন, "মার্! মার্! শত্রু মার্!" শ্রীর আর লজ্জা নাই, জ্ঞান নাই, ভয় নাই, বিরাম নাই—কেবল ডাকিতেছে—"মার্—শত্রু মার্! দেবতার

শত্রু, মানুষের শত্রু, হিন্দুর শত্রু—আমার শত্রু—মার্! শত্রু মার্!” উত্থিত বাহু, কি সুন্দর বাহু! স্ফুরিত অধর, বিস্ফারিত নাসা, বিদ্যুন্ময় কটাক্ষ, স্বেদাক্ত ললাটে স্বেদবিজড়িত চূর্ণকুন্তলের শোভা। সকল হিন্দু সেই দিকে চাহিতেছে, আর “জয় মা চণ্ডিকে!” বলিয়া রণে ছুটিতেছে। গঙ্গারাম প্রথমে মনে করিতেছেন যে, যথার্থই চণ্ডী অবতীর্ণা—তার পর সবিস্ময়ে, সভয়ে চিনিলেন, শ্রী!

এই চণ্ডীর উৎসাহে হিন্দুর রণজয় হইল। চণ্ডীর বলে বলবান্ হিন্দুর বেগ মুসলমানেরা সহ্য করিতে পারিল না। চীৎকার করিতে করিতে পলাইতে লাগিল। অল্পকালমধ্যে রণক্ষেত্র মুসলমানশূন্য হইল। গঙ্গারাম তখন দেখিলেন, একজন ভারী লম্বা যোয়ান সীতারামকে কাঁধে করিয়া লইয়া, আর সকলে তাঁহাকে ঘেরিয়া, সেই চণ্ডীর দিকে লইয়া চলিল। আরও দেখিলেন, পশ্চাৎ আর এক জন শড়কীওয়ালা শাহ সাহেবের কাটামুণ্ড শড়কীতে বিঁধিয়া উঁচু করিয়া সঙ্গে সঙ্গে লইয়া যাইতেছে। এই সময়ে শ্রী সহসা বৃক্ষচ্যুতা হইয়া ভূতলে পড়িয়া মূর্চ্ছিতপ্রায় হইল। গঙ্গারামও তখন বৃক্ষ হইতে নামিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

এমন সময়ে একটা গোল উঠিল যে, কামান, বন্দুক, গোলা গুলি লইয়া, সসৈন্য ফৌজদার বিদ্রোহীদিগের দমনার্থ আসিতেছেন। গোলা গুলির কাছে ঢাল শড়কী কি করিবে? বলা বাহুল্য যে, নিমেষমধ্যে সেই যোয়ানের দল অদৃশ্য হইল। যে নিরস্ত্র বীরপুরুষেরা তাঁহাদের আশ্রয়ে থাকিয়া লড়াই ফতে করিতেছি বলিয়া কোলাহল করিতেছিলেন, তাঁহারা বলিলেন, “আমরা ত বারণ করিয়াছিলাম।” এই বলিয়া আর পশ্চাদ্দৃষ্টি না করিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে গৃহাভিমুখে ধাবিত হইলেন। যাহারা দাঙ্গার কোন সংস্রবে ছিল না, তাহারা ‘চোরা গোরুর অপরাধে কপিলার বন্ধন’ সম্ভাবনা দেখিয়া সীতারাম গঙ্গারামকে নানাবিধ গালিগালাজ করিয়া আর্ত্তনাদপূর্ব্বক পলাইতে লাগিল। অতি অল্পকালমধ্যে সেই লোকারণ্য অন্তর্হিত হইল। প্রান্তর যেমন জনশূন্য ছিল, তেমনই জনশূন্য হইল। লোকজনের মধ্যে কেবল সেই বৃক্ষতলে চন্দ্রচূড়, সীতারাম, গঙ্গারাম, আর মূর্চ্ছিতা, ভূতলস্থা শ্রী।

সীতারাম গঙ্গারামকে বলিলেন, “তুমি যে আমার ঘোড়া চুরি করিয়া পলাইয়াছিলে, সে ঘোড়া কি করিলে? বেচিয়া খাইয়াছ?”

গঙ্গারাম হাসিয়া বলিল, “আজ্ঞে না। ঘোড়া মাঠে ছাড়িয়া দিয়াছি—ধরিয়া দিতেছি।”

সীতা। ধরিয়া, তাহার উপর আর একবার চড়িয়া, পলায়ন কর।

গঙ্গা। আপনাদের ছাড়িয়া?

সীতা। তোমার ভগিনীর জন্য ভাবিও না।

গঙ্গা। আপনাকে ত্যাগ করিয়া আমি যাইব না।

সীতা। তুমি বড় নদী পার হইয়া যাও। শ্যামপুর চেন ত?

গঙ্গা। তা চিনি না?

সীতা। সেইখানে অতি দ্রুতগতি যাও। সেইখানে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবে; নচেৎ তোমার নিস্তার নাই।

গঙ্গা। আমি আপনাকে ত্যাগ করিয়া যাইব না।

সীতারাম ভ্রূকুটি করিলেন।

গঙ্গারাম সীতারামের ভ্রূকুটি দেখিয়া নিস্তব্ধ হইল; এবং সীতারাম কিছু ধমক চমক করায় ভীত হইয়া অশ্বের সন্ধানে গেল।

চন্দ্রচূড় ঠাকুর সীতারামের ইঙ্গিত পাইয়া তাহার অনুবর্ত্তী হইলেন। শ্রী এদিকে চেতনাযুক্ত হইয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিয়া মাথার ঘোমটা টানিয়া দিল। তার পর এদিকে ওদিকে চাহিয়া, উঠিয়া দাঁড়াইল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সীতারাম বলিলেন, "শ্রী, তুমি এখন কোথায় যাইবে?"

শ্রী। আমার স্থান কোথায়?

সীতা। কেন, তোমার মার বাড়ী?

শ্রী। সেখানে কে আছে?—এখন সেখানে আমাকে কে রক্ষা করিবে?

সীতা। তবে তুমি কোথায় যাইতে ইচ্ছা কর?

শ্রী। কোথাও নয়।

সীতা। এইখানে থাকিবে? এ যে মাঠ। এখানে তোমার মঙ্গল নাই।

শ্রী। কেন, এখানে আমার কে কি করিবে?

সীতা। তুমি হাঙ্গামায় ছিলে—ফৌজদার তোমায় ফাঁসি দিতে পারে, মারিয়া ফেলিতে পারে বা সেই রকম আর কোন সাজা দিতে পারে।

শ্রী। ভাল।

সীতা। আমি শ্যামপুরে যাইতেছি। তোমার ভাইও সেইখানে যাইবে। সেখানে তাহার ঘর দ্বার হইবার সম্ভাবনা। তুমি সেইখানে যাও। সেখানে বা যেখানে তোমার অভিলাষ, সেইখানে বাস করিও।

শ্রী। সেখানে কার সঙ্গে যাইব ?

সীতা। আমি কোন লোক তোমার সঙ্গে দিব।

শ্রী। এমন লোক কাহাকে সঙ্গে দিবে যে, দুরন্ত সিপাহীদিগের হাত হইতে আমাকে রক্ষা করিবে ?

সীতারাম কিছুক্ষণ ভাবিলেন ; বলিলেন, "চল, আমি তোমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতেছি।"

শ্রী সহসা উঠিয়া বসিল। উন্মুখী হইয়া স্থিরনেত্রে সীতারামের মুখ পানে কিছুক্ষণ নীরবে চাহিয়া রহিল। শেষে বলিল, "এত দিন পরে, এ কথা কেন ?"

সীতা। সে কথা বুঝান বড় দায়। নাই বুঝিলে ?

শ্রী। না বুঝিলে আমি তোমার সঙ্গে যাইব না। যখন তুমি ত্যাগ করিয়াছ, তখন আর আমি তোমার সঙ্গে যাইব কেন ? যাইব বই কি ? কিন্তু তুমি দয়া করিয়া আমাকে কেবল প্রাণে বাঁচাইবার জন্য যে, এক দিন আমাকে সঙ্গে লইয়া যাইবে, আমি সে দয়া চাহি না। আমি তোমার বিবাহিতা স্ত্রী, তোমার সর্ব্বস্বের অধিকারিণী,—আমি তোমার শুধু দয়া লইব কেন ? যাহার আর কিছুতেই অধিকার নাই, সেই দয়া চায়। না প্রভু, তুমি যাও,—আমি যাইব না। এত কাল তোমা বিনা যদি আমার কাটিয়াছে, তবে আজিও কাটিবে।

সীতা। এসো, কথাটা আমি বুঝাইয়া দিব।

শ্রী। কি বুঝাইবে ? আমি তোমার সহধর্ম্মিণী, সকলের আগে। তোমার আর দুই স্ত্রী আছে, কিন্তু আমি সহধর্ম্মিণী—আমি কুলটাও নই, জাতিভ্রষ্টাও নই। অথচ বিনাপরাধে বিবাহের কয় দিন পরে হইতে তুমি আমাকে ত্যাগ করিয়াছ। কখনও বল নাই যে, কি অপরাধে ত্যাগ করিয়াছ। জিজ্ঞাসা করিয়াও জানিতে পারি নাই। অনেক দিন মনে করিয়াছি, তোমার এই অপরাধে আমি প্রাণত্যাগ করিব ; তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত আমি করিয়া তোমাকে পাপ হইতে মুক্ত করিব। সে পরিচয় তোমার কাছে আজ না পাইলে, আমি এখান হইতে যাইব না।

সীতা। সে কথা সব বলিব। কিন্তু একটা কথা আমার কাছে আগে স্বীকার কর—কথাগুলি শুনিয়া তুমি আমায় ত্যাগ করিয়া যাইবে না।

শ্রী। আমি তোমায় ত্যাগ করিব ?

সীতা। স্বীকার কর, করিবে না।

শ্রী। এমন কি কথা? তবে না শুনিয়া আগে স্বীকার করি, কি প্রকার?

সীতা। দেখ, সিপাহীদিগের বন্দুকের শব্দ শোনা যাইতেছে। যাহারা পলাইতেছে, সিপাহীরা তাহাদের পাছু ছুটিয়াছে। এই বেলা যদি আইস, এখনও বোধ হয় তোমাকে নগরের বাহিরে লইয়া যাইতে পারি। আর মুহূর্ত্তও বিলম্ব করিলে উভয়ে নষ্ট হইব।

তখন শ্রী উঠিয়া সীতারামের সঙ্গে চলিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

সীতারাম নির্ব্বিঘ্নে নগর পার হইয়া নদীকূলে পঁহুছিলেন। পলায়নের অনেক বিঘ্ন। কাজেই বিলম্ব ঘটিয়াছিল। এক্ষণে রাত্রি হইয়াছে। সীতারাম নক্ষত্রালোকে, নদীসৈকতে বসিয়া, শ্রীকে নিকটে বসিতে আদেশ করিলেন। শ্রী বসিলেন; তিনি বলিতে লাগিলেন, "এখন যাহা শুনিতে ইচ্ছা করিয়াছিলে, তাহা শোন। না শুনিলেই ভাল হইত।

তোমার সঙ্গে আমার বিবাহের যখন কথাবার্ত্তা স্থির হয়, তখন আমার পিতা তোমার কোষ্ঠী দেখিতে চাহিয়াছিলেন মনে আছে? তোমার কোষ্ঠী ছিল না, কাজেই আমার পিতা তোমার সঙ্গে আমার বিবাহ দিতে অস্বীকৃত হইয়াছিলেন। কিন্তু তুমি বড় সুন্দরী বলিয়া আমার মা জিদ করিয়া তোমার সঙ্গে বিবাহ দিয়াছিলেন। বিবাহের মাসেক পরে আমাদের বাড়ীতে একজন বিখ্যাত দৈবজ্ঞ আসিল। সে আমাদের সকলের কোষ্ঠী দেখিল। তাহার নৈপুণ্যে আমার পিতৃঠাকুর বড় আপ্যায়িত হইলেন। সে ব্যক্তি নষ্টকোষ্ঠী উদ্ধার করিতে জানিত। পিতৃঠাকুর তাহাকে তোমার কোষ্ঠী প্রস্তুত করণে নিযুক্ত করিলেন।

দৈবজ্ঞ কোষ্ঠী প্রস্তুত করিয়া আনিল। পড়িয়া পিতৃঠাকুরকে শুনাইল; সেই দিন হইতে তুমি পরিত্যাজ্যা হইলে।"

শ্রী। কেন?

সীতা। তোমার কোষ্ঠীতে বলবান্ চন্দ্র স্বক্ষেত্রে অর্থাৎ কর্কট রাশিতে থাকিয়া শনির ত্রিংশাংশগত হইয়াছিল।

শ্রী। তাহা হইলে কি হয়?

সীতা। যাহার এরূপ হয়, সে প্রিয়-প্রাণহন্ত্রী হয়।* অর্থাৎ আপনার প্রিয়জনকে বধ করে। স্ত্রীলোকের "প্রিয়" বলিলে স্বামীই বুঝায়। পতিবধ তোমার কোষ্ঠীর ফল বলিয়া তুমি পরিত্যাজ্যা হইয়াছ।

* চন্দ্রাগারে থাগ্নিভাবে কুজস্য স্বেচ্ছাবৃত্তির্জ্জস্য শিল্পে প্রবীণা।
বাচাং পত্যুঃ সদ্‌গুণা ভার্গবস্য সাধ্বী মন্দস্য প্রিয়প্রাণহন্ত্রী॥
ইতি জাতকাভরণে।

বলিয়া সীতারাম কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। তার পর বলিতে লাগিলেন, "দৈবজ্ঞ পিতাকে বলিলেন, 'আপনি এই পুত্রবধূটিকে পরিত্যাগ করুন, এবং পুত্রের দ্বিতীয় দারপরিগ্রহের ব্যবস্থা করুন। কারণ, দেখুন, যদিও স্ত্রীজাতির সাধারণতঃ পতিই প্রিয়, কিন্তু যে পতি স্ত্রীর অপ্রিয় হয়, সেখানে এই ফল পতির প্রতি না ঘটিয়া অন্য প্রিয়জনের প্রতি ঘটিবে। স্ত্রীপুরুষে দেখা সাক্ষাৎ না থাকিলে, পতি স্ত্রীর প্রিয় হইবে না; এবং পতি প্রিয় না হইলে, তাহার পতিবধের সম্ভাবনা নাই। অতএব যাহাতে আপনার পুত্রবধূর সঙ্গে আপনার পুত্রের কখন সহবাস না হয় বা প্রীতি না জন্মে, সেই ব্যবস্থা করুন।' পিতৃদেব এই পরামর্শ উত্তম বিবেচনা করিয়া, সেই দিনই তোমাকে পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দিলেন। এবং আমাকে আজ্ঞা করিলেন যে, আমি তোমাকে গ্রহণ বা তোমার সঙ্গে সহবাস না করি। এই কারণে তুমি আমার কাছে সেই অবধি পরিত্যক্ত।"

শ্রী দাঁড়াইয়া উঠিল। কি বলিতে যাইতেছিল, সীতারাম তাহাকে ধরিয়া বসাইলেন, বলিলেন, "আমার কথা বাকি আছে। যখন পিতা বর্ত্তমান ছিলেন—আমি তাঁহার অধীন ছিলাম—তিনি যা করাইতেন, তাই হইত।"

শ্রী। এখন তিনি স্বর্গে গিয়াছেন বলিয়া কি তুমি আর তাঁহার অধীন নও?

সীতা। পিতার আজ্ঞা সকল সময়েই পালনীয়—তিনি যখন আছেন, তখনও পালনীয়—তিনি যখন স্বর্গে, তখনও পালনীয়। কিন্তু পিতা যদি অধর্ম্ম করিতে বলেন, তবে তাহা কি পালনীয়? পিতা মাতা বা গুরুর আজ্ঞাতেও অধর্ম্ম করা যায় না—কেন না, যিনি পিতা মাতার পিতা মাতা এবং গুরুর গুরু, অধর্ম্ম করিলে তাঁহার বিধি লঙ্ঘন করা হয়। বিনাপরাধে স্ত্রী ত্যাগ ঘোরতর অধর্ম্ম—অতএব আমি পিতৃ-আজ্ঞা পালন করিয়া অধর্ম্ম করিতেছি—শীঘ্রই আমি তোমাকে এ কথা জানাইতাম, কিন্তু—

শ্রী আবার দাঁড়াইয়া উঠিল। বলিল, "আমাকে পরিত্যাগ করিয়াও যে তুমি আমাকে এত দয়া করিয়াছ, আমার ভাইয়ের প্রাণভিক্ষা দিয়াছ, ইহা তোমার অশেষ গুণ। আর কখনও আমি তোমাকে মুখ দেখাইব না বা তুমি কখনও আমার নামও শুনিবে না। গণকঠাকুর যাই বলুন, স্বামী ভিন্ন স্ত্রীলোকের আর কেহই প্রিয় নহে। সহবাস থাকুক বা না থাকুক, স্বামীই স্ত্রীর প্রিয়। তুমি আমার চিরপ্রিয়—এ কথা লুকান আমার আর উচিত নহে। আমি এখন হইতে তোমার শত যোজন তফাতে থাকিব।"

এই বলিয়া, শ্রী ফিরিয়া না চাহিয়া, সেখান হইতে চলিয়া গেল। অন্ধকারে সে কোথায় মিশাইল, সীতারাম আর দেখিতে পাইলেন না।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

তা, কথাটা কি আজ সীতারামের নূতন মনে হইল? না। কাল শ্রীকে দেখিয়া মনে হইয়াছিল। কাল কি প্রথম মনে হইল? হাঁ, তা বৈ কি। সীতারামের সঙ্গে শ্রীর কতটুকু পরিচয়? বিবাহের পর কয় দিন দেখা—সে দেখাই নয়—শ্রী তখন বড় বালিকা। তার পর সীতারাম ক্রমশঃ দুই বিবাহ করিয়াছিলেন। তপ্তকাঞ্চনশ্যামাঙ্গী নন্দাকে বিবাহ করিয়াও বুঝি শ্রীর খেদ মিটে নাই—তাই তাঁর পিতা আবার হিমরাশিপ্রতিফলিত-কৌমুদী-রূপিণী রমার সঙ্গে পুত্রের বিবাহ দিয়াছিলেন। আজ এক জন বসন্তনিকুঞ্জপ্রহ্লাদিনী অপূর্ণা কল্লোলিনী; আর এক জন বর্ষা-বারিরাশিপ্রমথিতা পরিপূর্ণা স্রোতস্বতী। দুই স্রোতে শ্রী ভাসিয়া গেল। তার পর আর শ্রীর কোন খবরই নাই।

স্বীকার করি, তবু শ্রীকে মনে করা সীতারামের উচিত ছিল। কিন্তু এমন অনেক উচিত কাজ আছে যে, কাহারও মনে হয় না। মনে হইবার একটা কারণ না ঘটিলে, মনে হয় না। যাহার নিত্য টাকা আসে, সে কবে কোথায় সিকিটা আধুলিটা হারাইয়াছে, তার তা বড় মনে পড়ে না। যার এক দিকে নন্দা, আর দিকে রমা, তার কোথাকার শ্রীকে কেন মনে পড়িবে? যার এক দিকে গঙ্গা, এক দিকে যমুনা, তার কবে কোথায় বালির মধ্যে সরস্বতী শুকাইয়া লুকাইয়া আছে, তা কি মনে পড়ে? যার এক দিকে চিত্রা, আর এক দিকে চন্দ্র, তার কবে কোথাকার নিবান বাতির আলো কি মনে পড়ে? রমা সুখ, নন্দা সম্পদ্, শ্রী বিপদ্—যার এক দিকে সুখ, আর এক দিকে সম্পদ্, তার কি বিপদ্‌কে মনে পড়ে?

তবে সে দিন রাত্রিতে শ্রীর চাঁদপানা মুখখানা, ঢল ঢল ছল ছল জলভরা বলহারা চোক দুটো, বড় গোল করিয়া গিয়াছে। রূপের মোহ? আ ছি! ছি! তা না! তবে তার রূপেতে, তার দুঃখেতে, আর সীতারামের স্বকৃত অপরাধে, এই তিনটায় মিশিয়া গোলযোগ বাধাইয়াছিল। তা যা হউক—তার একটা বুঝা পড়া হইতে পারিত; ধীরে সুস্থে, সময় বুঝিয়া, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য ধর্ম্মাধর্ম্ম বুঝিয়া, গুরু পুরোহিত ডাকিয়া, পিতার আজ্ঞা লঙ্ঘনের একটা প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করিয়া, যা হয় না হয় হইত।—কিন্তু সেই সিংহবাহিনী মূর্ত্তি! আ মরি মরি—এমন কি আর হয়!

তবে সীতারামের হইয়া এ কথাটাও আমার বলা কর্ত্তব্য যে, কেবল সেই সিংহবাহিনী মূর্ত্তি স্মরণ করিয়াই সীতারাম, পত্নীত্যাগের অধার্ম্মিকতা হৃদয়ঙ্গম করেন নাই। পূর্ব্বরাত্রিতে যখনই প্রথম শ্রীকে দেখিয়াছিলেন, তখনই মনে হইয়াছিল যে, আমি পিতৃ-আজ্ঞা পালন করিতে গিয়া পাপাচরণ করিতেছি। মনে করিয়াছিলেন যে, আগে শ্রীর ভাইয়ের জীবন রক্ষা করিয়া, নন্দা রমাকে পূর্ব্বেই শান্তভাবাবলম্বন করাইয়া, চন্দ্রচূড় ঠাকুরের সঙ্গে একটু বিচার

করিয়া, যাহা কর্ত্তব্য, তাহা করিবেন। কিন্তু পরদিনের ঘটনার স্রোতে সে সব অভিসন্ধি ভাসিয়া গেল। উচ্ছ্বসিত অনুরাগের তরঙ্গে বালির বাঁধ সব ভাঙ্গিয়া গেল। নন্দা, রমা, চন্দ্রচূড়, সব দূরে থাক—এখন কৈ শ্রী!

শ্রী সহসা নৈশ অন্ধকারে অদৃশ্য হইলে সীতারামের মাথায় যেন বজ্রাঘাত পড়িল।

সীতারাম গাত্রোত্থান করিয়া, যে দিকে শ্রী বনমধ্যে অন্তর্হিতা হইয়াছিল, সেই দিকে দ্রুতবেগে ধাবিত হইলেন। কিন্তু অন্ধকারে কোথাও তাহাকে দেখিতে পাইলেন না। বনের ভিতর তাল তাল অন্ধকার বাঁধিয়া আছে, কোথায় শাখাচ্ছেদ জন্য বা বৃক্ষবিশেষের শাখার উজ্জ্বল বর্ণ জন্য, যেন সাদা বোধ হয়, সীতারাম সেই দিকে দৌড়িয়া যান—কিন্তু শ্রীকে পান না। তখন শ্রীর নাম ধরিয়া সীতারাম তাহাকে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিলেন। নদীর উপকূলবর্ত্তী বৃক্ষরাজিতে শব্দ প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল—বোধ হইল যেন, সে উত্তর দিল। শব্দ লক্ষ্য করিয়া সীতারাম সেই দিকে যান—আবার শ্রী বলিয়া ডাকেন, আবার অন্য দিকে প্রতিধ্বনি হয়—আবার সীতারাম সেই দিকে ছুটেন—কই, শ্রী কোথাও নাই। হায় শ্রী! হায় শ্রী! হায় শ্রী! করিতে করিতে রাত্রি প্রভাত হইল—শ্রী মিলিল না।

কই, যাকে ডাকি, তা ত পাই না। যা খুঁজি, তা ত পাই না। যা পাইয়াছিলাম, হেলায় হারাইয়াছি, তা ত আর পাই না। রত্ন হারায়, কিন্তু হারাইলে আর পাওয়া যায় না কেন? সময়ে খুঁজিলে হয় ত পাইতাম—এখন আর খুঁজিয়া পাই না। মনে হয়, বুঝি চক্ষু গিয়াছে, বুঝি পৃথিবী বড় অন্ধকার হইয়াছে, বুঝি খুঁজিতে জানি না। তা কি করিব,—আরও খুঁজি। যাহাকে ইহজগতে খুঁজিয়া পাইলাম না, ইহজীবনে সেই প্রিয়। এই নিশা প্রভাতকালে শ্রী, সীতারামের হৃদয়ে প্রিয়ার উপর বড় প্রিয়া, হৃদয়ের অধিকারিণী। শ্রীর অনুপম রূপমাধুরী, তাঁহার হৃদয়ে তরঙ্গে তরঙ্গে ভাসিয়া উঠিতে লাগিল। শ্রীর গুণ এখন তাঁহার হৃদয়ে জাগরূক হইতে লাগিল। যে বৃক্ষারূঢ়া মহিষমর্দ্দিনী অঞ্চলসঙ্কেতে সৈন্যসঞ্চালন করিয়া রণজয় করিয়াছিল, যদি সেই শ্রী সহায় হয়, তবে সীতারাম কি না করিতে পারেন?

সহসা সীতারামের মনে এক ভরসা হইল। শ্রীর ভাই গঙ্গারামকে শ্যামপুরে তিনি যাইতে আদেশ করিয়াছিলেন, গঙ্গারাম অবশ্য শ্যামপুরে গিয়াছে। সীতারাম তখন দ্রুতবেগে শ্যামপুরের অভিমুখে চলিলেন। শ্যামপুরে পৌঁছিয়া দেখিলেন যে, গঙ্গারাম তাঁহার প্রতীক্ষা করিতেছে। প্রথমেই সীতারাম তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "গঙ্গারাম! তোমার ভগিনী কোথায়?" গঙ্গারাম বিস্মিত হইয়া উত্তর করিল, "আমি কি জানি!"

সীতারাম বিষণ্ণ হইয়া বলিলেন, "সব গোল হইয়াছে। সে এখানে আসে নাই?"

গঙ্গা। না।

সীতা। তুমি এইক্ষণেই তাহার সন্ধানে যাও। সন্ধানের শেষ না করিয়া ফিরিও না। আমি এইখানেই আছি। তুমি সাহস করিয়া সকল স্থানে যাইতে না পার, লোক নিযুক্ত করিও। সে জন্য টাকাকড়ি যাহা আবশ্যক হয়, আমি দিতেছি।

গঙ্গারাম প্রয়োজনীয় অর্থ লইয়া ভগিনীর সন্ধানে গেল। বহু যত্নপূর্ব্বক, এক সপ্তাহ তাঁহার সন্ধান করিল। কোন সন্ধান পাইল না। নিষ্ফল হইয়া ফিরিয়া আসিয়া সীতারামের নিকট সবিশেষ নিবেদিত হইল।

নবম পরিচ্ছেদ

মধুমতী নদীর তীরে শ্যামপুর নামক গ্রাম, সীতারামের পৈতৃক সম্পত্তি। সীতারাম সেইখানে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। ভূষণায় যে হাঙ্গমা উপস্থিত হইয়াছিল, ইহা যে সীতারামের কার্য্য, তাহা বলা বাহুল্য। ভূষণা নগরে সীতারামের অনুগত, বাধ্য প্রজা বা খাদক বিস্তর লোক ছিল। সীতারাম তাহাদের সঙ্গে রাত্রিতে সাক্ষাৎ করিয়া এই হাঙ্গামার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। তবে সীতারামের এমন ইচ্ছা ছিল যে, যদি বিনা বিবাদে গঙ্গারামের উদ্ধার হয়, তবে আর তাহার প্রয়োজন নাই। তবে বিবাদ হয়, মন্দ নয়;—মুসলমানের দৌরাত্ম্য বড় বেশী হইয়া উঠিয়াছে, কিছু দমন হওয়া ভাল। চন্দ্রচূড় ঠাকুরের মনটা সে বিষয়ে আরও পরিষ্কার—মুসলমানের অত্যাচার এত বেশী হইয়াছে যে, গোটাকত নেড়া মাথা লাঠির ঘায়ে না ভাঙ্গিলেই নয়। তাই সীতারামের অভিপ্রায়ের অপেক্ষা না করিয়াই চন্দ্রচূড় তর্কালঙ্কার দাঙ্গা আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রাদ্ধটা বেশী গড়াইয়াছিল—ফকিরের প্রাণবধ এমন গুরুতর ব্যাপার যে, সীতারাম ভীত হইয়া কিছু কালের জন্য ভূষণা ত্যাগ করাই স্থির করিলেন। যাহারা সে দিনের হাঙ্গামায় লিপ্ত ছিল, তাহারা সকলেও আপনাদিগকে অপরাধী জানিয়া, এবং কোন দিন না কোন দিন ফৌজদার কর্ত্তৃক দণ্ডিত হইবার আশঙ্কায় বাস ত্যাগ করিয়া, শ্যামপুরে সীতারামের আশ্রয়ে ঘর দ্বার বাঁধিতে লাগিল। সীতারামের প্রজা, অনুচরবর্গ এবং খাদক, যে যেখানে ছিল, তাহারাও সীতারাম কর্ত্তৃক আহূত হইয়া আসিয়া শ্যামপুরে বাস করিল। এইরূপে ক্ষুদ্র গ্রাম শ্যামপুর সহসা বহুজনাকীর্ণ হইয়া বৃহৎ নগরে পরিণত হইল।

তখন সীতারাম নগরনির্ম্মাণে মনোযোগ দিলেন। যেখানে বহুজন-সমাগম, সেই-খানেই ব্যবসায়ীরা আসিয়া উপস্থিত হয়; এই জন্য ভূষণা এবং অন্যান্য নগর হইতে দোকানদার, শিল্পী, আড়দ্দার, মহাজন, এবং অন্যান্য ব্যবসায়ীরা আসিয়া শ্যামপুরে অধিষ্ঠান করিল। সীতারামও তাহাদিগকে যত্ন করিয়া বসাইতে লাগিলেন। এইরূপে সেই নূতন নগর,

হাট, বাজার, গঞ্জ, গোলা, বন্দরে পরিপূর্ণ হইল। সীতারামের পূর্ব্বপুরুষের সংগৃহীত অর্থ ছিল, ইহা পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে। তাহা ব্যয় করিয়া তিনি নূতন নগর সুশোভিত করিতে লাগিলেন। বিশেষ এখন প্রজাবাহুল্য ঘটাতে, তাঁহার বিশেষ আয়বৃদ্ধি হইয়াছিল। আবার এক্ষণে জনরব উঠিল যে, সীতারাম হিন্দুরাজধানী স্থাপন করিতেছেন; ইহা শুনিয়া দেশে বিদেশে যেখানে মুসলমানপীড়িত, রাজভয়ে ভীত বা ধর্ম্মরক্ষার্থে হিন্দুরাজ্যে বাসের ইচ্ছুক, তাহারা সকলে দলে দলে আসিয়া সীতারামের অধিকারে বাস করিতে লাগিল। অতএব সীতারামের ধনাগম সম্যক্ প্রকারে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তিনি রাজপ্রাসাদতুল্য আপন বাসভবন, উচ্চ দেবমন্দির, স্থানে স্থানে সোপানাবলীশোভিত সরোবর, এবং রাজবর্ত্ম সকল নির্ম্মাণ করিয়া নূতন নগরী অত্যন্ত সুশোভিতা ও সমৃদ্ধিশালিনী করিলেন। প্রজাগণও হিন্দুরাজ্যের সংস্থাপন জন্য ইচ্ছাপূর্ব্বক তাঁহাকে ধন দান করিতে লাগিল। যাহার ধন নাই, সে শারীরিক পরিশ্রমের দ্বারা নগরনির্ম্মাণ ও রাজ্যরক্ষার সহায়তা করিতে লাগিল।

সীতারামের কর্ম্মঠতা, এবং প্রজাবর্গের হিন্দুরাজ্য স্থাপনের উৎসাহে অতি অল্পদিনেই এই সকল ব্যাপার সুসম্পন্ন হইয়া উঠিল। কিন্তু তিনি রাজা নাম গ্রহণ করিলেন না; কেন না, দিল্লীর বাদশাহ তাঁহাকে রাজা না করিলে, তিনি যদি রাজোপাধি গ্রহণ করেন, তবে মুসলমানেরা তাঁহাকে বিদ্রোহী বিবেচনা করিয়া তাঁহার উচ্ছেদের চেষ্টা করিবে, ইহা তিনি জানিতেন। এ পর্য্যন্ত তিনি বিদ্রোহিতার কোন কার্য্য করেন নাই। গঙ্গারামের উদ্ধারের জন্য যে হাঙ্গামা হইয়াছিল, তাহাতে তিনি প্রকাশ্যে অস্ত্রধারী বা উৎসাহী ছিলেন বলিয়া ফৌজদারের জানিবার কোন কারণ উপস্থিত হয় নাই। কাজেই তাঁহাকে বিদ্রোহী বিবেচনা করার কোন কারণ ছিল না। যখন তিনি রাজা নাম এখনও গ্রহণ করেন নাই; বরং দিল্লীশ্বরকে সম্রাট্ স্বীকার করিয়া জমিদারীর খাজনা পূর্ব্বমত রাজ-কোষাগারে পৌঁছিয়া দিতে লাগিলেন, এবং সর্ব্বপ্রকারে মুসলমানের সঙ্গে সদ্ভাব রাখিতে লাগিলেন; আর নূতন নগরীর নাম "মহম্মদপুর" রাখিয়া, হিন্দু ও মুসলমান প্রজার প্রতি তুল্য ব্যবহার করিতে লাগিলেন, তখন মুসলমানের অপ্রীতিভাজন হইবার আর কোন কারণই রহিল না।

তথাপি, তাঁহার প্রজাবৃদ্ধি, ক্ষমতাবৃদ্ধি, প্রতাপ, খ্যাতি এবং সমৃদ্ধি শুনিয়া ফৌজদার তোরাব খাঁ উদ্বিগ্নচিত্ত হইলেন। মনে মনে স্থির করিলেন, একটা কোন ছল পাইলেই মহম্মদপুর লুঠপাঠ করিয়া সীতারামকে বিনষ্ট করিবেন। ছল ছুতারই বা অভাব কি? তোরাব খাঁ সীতারামকে আজ্ঞা করিয়া পাঠাইলেন যে, তোমার জমিদারীতে অনেকগুলি বিদ্রোহী ও পলাতক বদমাস বাস করিতেছে, ধরিয়া পাঠাইয়া দিবা। সীতারাম উত্তর করিলেন যে, অপরাধীদিগের নাম পাঠাইয়া দিলে, তিনি তাহাদিগকে ধরিয়া পাঠাইয়া দিবেন। ফৌজদার পলাতক প্রজাদিগের নামের একটি তালিকা পাঠাইয়া দিলেন। শুনিয়া

পলাতক প্রজারা সকলেই নাম বদলাইয়া বসিল। সীতারাম কাহারও নামের সহিত তালিকার মিল না দেখিয়া, লিখিয়া পাঠাইলেন যে, ফর্দ্দের লিখিত নাম কোন প্রজা স্বীকার করে না।

এইরূপে বাগ্‌বিতণ্ডা চলিতে লাগিল। উভয়ে উভয়ের মনের ভাব বুঝিলেন। তোরাব খাঁ, সীতারামের ধ্বংসের জন্য সৈন্য সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। সীতারামও আত্মরক্ষার্থ, মহম্মদপুরের চারি পার্শ্বে দুর্লঙ্ঘ্য গড় প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। প্রজাদিগকে অস্ত্রবিদ্যা ও যুদ্ধরীতি শিখাইতে লাগিলেন, এবং সুন্দরবন-পথে গোপনে অস্ত্র সংগ্রহ করিতে লাগিলেন।

এই সকল কার্য্যে সীতারাম তিন জন উপযুক্ত সহায় পাইয়াছিলেন। এই তিন জন সহায় ছিল বলিয়া এই গুরুতর কার্য্য এত শীঘ্র এবং সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হইয়াছিল। প্রথম সহায় চন্দ্রচূড় তর্কালঙ্কার, দ্বিতীয়ের নাম মৃণ্ময়, তৃতীয় গঙ্গারাম। বুদ্ধিতে চন্দ্রচূড়, বলে ও সাহসে মৃণ্ময়, এবং ক্ষিপ্রকারিতায় গঙ্গারাম। গঙ্গারাম সীতারামের একান্ত অনুগত ও কার্য্যকারী হইয়া মহম্মদপুরে বাস করিতেছিল। এই সময়ে চাঁদ শাহ নামে এক জন মুসলমান ফকির, সীতারামের সভায় যাতায়াত আরম্ভ করিল। ফকির বিজ্ঞ, পণ্ডিত, নিরীহ এবং হিন্দু মুসলমানে সমদর্শী। তাঁহার সহিত সীতারামের বিশেষ সম্প্রীতি হইল। তাঁহারই পরামর্শমতে, নবাবকে সন্তুষ্ট রাখিবার জন্য, সীতারাম রাজধানীর নাম রাখিলেন, "মহম্মদপুর"।

ফকির আসে যায়। জিজ্ঞাসামতে সৎপরামর্শ দেয়। কেহ বিবাদের কথা তুলিলে তাহাকে ক্ষান্ত করে। অতএব আপাততঃ সকল বিষয় সুচারুমতে নির্ব্বাহ হইতে লাগিল।

দশম পরিচ্ছেদ

সীতারামের যেমন তিন জন সহায় ছিল, তেমনই তাঁহার এই মহৎ কার্য্যে এক জন পরম শত্রু ছিল। শত্রু—তাঁহার কনিষ্ঠা পত্নী রমা।

রমা বড় ছোট মেয়েটি, জলে ধোয়া যুঁইফুলের মত বড় কোমলপ্রকৃতি। তাহার পক্ষে এই জগতের যাহা কিছু, সকলই দুর্জ্ঞেয় বিষম পদার্থ—সকলই তাহার কাছে ভয়ের বিষয়। বিবাদে রমার বড় ভয়। সীতারামের সাহসকে ও বীর্য্যকে রমার বড় ভয়। বিশেষ মুসলমান রাজা, তাহাদের সঙ্গে বিবাদে রমার বড় ভয়। তার উপর আবার রমা ভীষণ স্বপ্ন দেখিলেন। স্বপ্ন দেখিলেন যে, মুসলমানেরা যুদ্ধে জয়ী হইয়া তাঁহাকে এবং সীতারামকে ধরিয়া প্রহার করিতেছে। এখন রমা সেই অসংখ্য মুসলমানের দন্তশ্রেণী-

প্রভাসিত বিশাল শ্মশ্রুল বদনমণ্ডল রাত্রিদিন চক্ষুতে দেখিতে লাগিল। তাহাদের বিকট চীৎকার রাত্রিদিন কানে শুনিতে লাগিল। রমা সীতারামকে পীড়াপীড়ি করিয়া ধরিল যে, ফৌজদারের পায়ে গিয়া কাঁদিয়া পড়—মুসলমান দয়া করিয়া ক্ষমা করিবে। সীতারাম সে কথায় কান দিলেন না—রমাও আহার নিদ্রা ত্যাগ করিল। সীতারাম বুঝাইলেন যে, তিনি মুসলমানের কাছে কোন অপরাধ করেন নাই—রমা তত বুঝিতে পারিল না। শ্রাবণ মাসের মত, রাত্রিদিন রমার চক্ষুতে জলধারা বহিতে লাগিল। বিরক্ত হইয়া সীতারাম আর তত রমার দিকে আসিতেন না। কাজেই জ্যেষ্ঠা (শ্রীকে গণিয়া মধ্যমা) পত্নী নন্দার একাদশে বৃহস্পতি লাগিয়া গেল।

দেখিয়া, বালিকাবুদ্ধি রমা আরও পাকা রকম বুঝিল যে, মুসলমানের সঙ্গে এই বিবাদে, তাঁহার ক্রমে সর্ব্বনাশ হইবে। অতএব রমা উঠিয়া পড়িয়া সীতারামের পিছনে লাগিল। কাঁদাকাটি, হাতে ধরা, পায় পড়া, মাথা খোঁড়ার জ্বালায় রমা যে অঞ্চলে থাকিত, সীতারাম আর সে প্রদেশ মাড়াইতেন না। তখন রমা, যে পথে তিনি নন্দার কাছে যাইতেন, সেই পথে লুকাইয়া থাকিত; সুবিধা পাইলে সহসা তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া ধরিয়া লইয়া যাইত; তার পর—সেই কাঁদাকাটি, হাতে ধরা, পায়ে পড়া, মাথা খোঁড়া—ঘ্যান্ ঘ্যান্ প্যান্ প্যান্—কখনও মুষলের ধার, কখনও ইল্‌সে গুড়ুনি, কখনও কালবৈশাখী, কখনও কার্ত্তিকে ঝড়। ধুয়োটা সেই এক—মুসলমানের পায়ে কাঁদিয়া গিয়া পড়—নহিলে কি বিপদ্ ঘটিবে। সীতারামের হাড় জ্বালাতন হইয়া উঠিল।

তার পর যখন রমা দেখিল, মহম্মদপুর ভূষণার অপেক্ষা জনাকীর্ণা রাজধানী হইয়া উঠিল, তাহার গড়খাই, প্রাচীর, পরিখা, তাহার উপর কামান সাজান, সেলেখানা, গোলাগুলি কামান বন্দুক নানা অস্ত্রে পরিপূর্ণ, দলে দলে সিপাহী কাওয়াজ করিতেছে, তখন রমা একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়া, বিছানা লইল। যখন একবার পূজাহ্নিকের জন্য শয্যা হইতে উঠিত, তখন রমা ইষ্টদেবের নিকট নিত্য যুক্তকরে প্রার্থনা করিত—"হে ঠাকুর! মহম্মদপুর ছারেখারে যাক্—আমরা আবার মুসলমানের অনুগত হইয়া নির্ব্বিঘ্নে দিনপাত করি। এ মহা ভয় হইতে আমাদের উদ্ধার কর।" সীতারামের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে তাঁহার সম্মুখেই রমা, দেবতার কাছে সেই কামনা করিত।

বলা বাহুল্য, রমার এই বিরক্তিকর আচরণে সে সীতারামের চক্ষুঃশূল হইয়া উঠিল। তখন সীতারাম মনে মনে বলিতেন, "হায়! এ দিনে যদি শ্রী আমার সহায় হইত।" শ্রী রাত্রিদিন তাঁহার মনে জাগিতেছিল। শ্রীর স্মরণপটস্থা মূর্ত্তির কাছে নন্দাও নয়, রমাও নয়। কিন্তু মনের কথা জানিতে পারিলে রমা, কি নন্দা পাছে মনে ব্যথা পায়, এজন্য

সীতারাম কখন শ্রীর নাম মুখে আনিতেন না। তবে রমার জ্বালায় জ্বালাতন হইয়া এক দিন তিনি বলিয়াছিলেন, "হায়! শ্রীকে ত্যাগ করিয়া কি রমাকে পাইলাম!"

রমা চক্ষু মুছিয়া বলিল, "তা শ্রীকে গ্রহণ কর না কেন? কে তোমায় নিষেধ করে?"

সীতারাম দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "শ্রীকে এখন আর কোথায় পাইব!" কথাটা রমার হাড়ে হাড়ে লাগিল। রমার অপরাধ যাই হোক, স্বামী পুত্রের প্রতি অতিশয় স্নেহই তাহার মূল। পাছে তাহাদের কোন বিপদ্ ঘটে, এই চিন্তাতেই সে এত ব্যাকুল। সীতারাম তাহা না বুঝিতেন, এমন নহে। বুঝিয়াও রমার প্রতি প্রসন্ন থাকিতে পারিলেন না—বড় ঘ্যান্ ঘ্যান্ প্যান্ প্যান্—বড় কাজের বিঘ্ন—বড় যন্ত্রণা। স্ত্রীপুরুষে পরস্পর ভালবাসাই দাম্পত্য সুখ নহে, একাভিসন্ধি—সহৃদয়তা—ইহাই দাম্পত্য সুখ। রমা বুঝিল, বিনাপরাধে আমি স্বামীর স্নেহ হারাইয়াছি। সীতারাম ভাবিল, "গুরুদেব! রমার ভালবাসা হইতে আমায় উদ্ধার কর।"

রমার দোষে, সীতারামের হৃদয়স্থিত সেই চিত্রপট দিন দিন আরও উজ্জ্বল প্রভাবিশিষ্ট হইতে লাগিল। সীতারাম মনে করিয়াছিলেন, রাজ্যসংস্থাপন ভিন্ন আর কিছুকেই তিনি মনে স্থান দিবেন না—কিন্তু এখন শ্রী আসিয়া ক্রমে ক্রমে সেই সিংহাসনের আধখান জুড়িয়া বসিল। সীতারাম মনে করিলেন, আমি শ্রীর কাছে যে পাপ করিয়াছি, রমার কাছে তাহার দণ্ড পাইতেছি। ইহার অন্য প্রায়শ্চিত্ত চাই।

কিন্তু এ মন্দিরে এ প্রতিমা স্থাপনে যে রমাই একা ব্রতী, এমন নহে। নন্দাও তাহার সহায়, কিন্তু আর এক রকমে। মুসলমান হইতে নন্দার কোন ভয় নাই। যখন সীতারামের সাহস আছে, তখন নন্দার সে কথার আন্দোলনে প্রয়োজন নাই। নন্দা বিবেচনা করিত, সে কথার ভাল মন্দের বিচারক আমার স্বামী—তিনি যদি ভাল বুঝেন, তবে আমার সে ভাবনায় কাজ কি? তাই নন্দা সে সকল কথাকে মনে স্থান না দিয়া, প্রাণপাত করিয়া পতিপদসেবায় নিযুক্তা। মাতার মত স্নেহ, কন্যার মত ভক্তি, দাসীর মত সেবা, সীতারাম সকলই নন্দার কাছে পাইতেছিলেন। কিন্তু সহধর্ম্মিণী কই? যে তাঁহার উচ্চ আশায় আশাবতী, হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষার ভাগিনী, কঠিন কার্য্যের সহায়, সঙ্কটে মন্ত্রী, বিপদে সাহস-দায়িনী, জয়ে আনন্দময়ী, সে কই? বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মী ভাল, কিন্তু সমরে সিংহবাহিনী কই? তাই নন্দার ভালবাসায়, সীতারামের পদে পদে শ্রীকে মনে পড়িত, পদে পদে সেই সংক্ষুব্ধ-সৈন্য-সঞ্চালিনীকে মনে পড়িত। "মার! মার! শত্রু মার! দেশের শত্রু, হিন্দুর শত্রু, আমার শত্রু, মার!"—সেই কথা মনে পড়িত। সীতারাম তাই মনে মনে সেই মহিমাময়ী সিংহবাহিনী মূর্ত্তি পূজা করিতে লাগিলেন।

প্রেম কি, তাহা আমি জানি না। দেখিল আর মজিল, আর কিছু মানিল না, কই— এমন দাবানল ত সংসারে দেখিতে পাই না। প্রেমের কথা পুস্তকে পড়িয়া থাকি বটে, কিন্তু সংসারে "ভালবাসা," স্নেহ ভিন্ন প্রেমের মত কোন সামগ্রী দেখিতে পাই নাই, সুতরাং তাহার বর্ণনা করিতে পারিলাম না। প্রেম, যাহা পুস্তকে বর্ণিত, তাহা আকাশকুসুমের মত কোন একটা সামগ্রী হইতে পারে, যুবক যুবতীগণের মনোরঞ্জন জন্য কবিগণ কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়াছে বোধ হয়। তবে একটা কথা স্বীকার করিতে হয়। ভালবাসা বা স্নেহ, যাহা সংসারে এত আদরের, তাহা পুরাতনেরই প্রাপ্য, নূতনের প্রতি জন্মে না। যাহার সংসর্গে অনেক কাল কাটাইয়াছি, বিপদে, সম্পদে, সুদিনে, দুর্দ্দিনে যাহার গুণ বুঝিয়াছি, সুখ দুঃখের বন্ধনে যাহার সঙ্গে বদ্ধ হইয়াছি, ভালবাসা বা স্নেহ তাহারই প্রতি জন্মে। কিন্তু নূতন, আর একটা সামগ্রী পাইয়া থাকে। নূতন বলিয়াই তাহার একটা আদর আছে। কিন্তু তাহা ছাড়া আরও আছে। তাহার গুণ জানি না, কিন্তু চিহ্ন দেখিয়া অনুমান করিয়া লইতে পারি। যাহা পরীক্ষিত, তাহা সীমাবদ্ধ; যাহা অপরীক্ষিত, কেবল অনুমিত, তাহার সীমা দেওয়া না দেওয়া মনের অবস্থার উপর নির্ভর করে। তাই নূতনের গুণ অনেক সময়ে অসীম বলিয়া বোধ হয়। তাই সে নূতনের জন্য বাসনা দুর্দ্দমনীয় হইয়া পড়ে। যদি ইহাকে প্রেম বল, তবে সংসারে প্রেম আছে। সে প্রেম বড় উন্মাদকর বটে। নূতনেরই তাহা প্রাপ্য। তাহার টানে পুরাতন অনেক সময়ে ভাসিয়া যায়। শ্রী সীতারামের পক্ষে নূতন। শ্রীর প্রতি সেই উন্মাদকর প্রেম সীতারামের চিত্ত অধিকৃত করিল। তাহার স্রোতে, নন্দা রমা ভাসিয়া গেল।

হায় নূতন! তুমিই কি সুন্দর? না, সেই পুরাতনই সুন্দর। তবে, তুমি নূতন! তুমি অনন্তের অংশ। অনন্তের একটুখানিমাত্র আমরা জানি। সেই একটুখানি আমাদের কাছে পুরাতন; অনন্তের আর সব আমাদের কাছে নূতন। অনন্তের যাহা অজ্ঞাত, তাহাও অনন্ত। নূতন, তুমি অনন্তেরই অংশ। তাই তুমি এত উন্মাদকর। শ্রী, আজ সীতারামের কাছে—অনন্তের অংশ।

হায়! তোমার আমার কি নূতন মিলিবে না? তোমার আমার কি শ্রী মিলিবে না? যে দিন সব পুরাতন ছাড়িয়া যাইব, সেই দিন সব নূতন পাইব, অনন্তের সম্মুখে মুখামুখী হইয়া দাঁড়াইব। নয়ন মুদিলে শ্রী মিলিবে। তত দিন এসো, আমরা বুক বাঁধিয়া, হরিনাম করি। হরিনামে অনন্ত মিলে।

একাদশ পরিচ্ছেদ

"এই ত বৈতরণী। পার হইলে না কি সকল জ্বালা জুড়ায়। আমার জ্বালা জুড়াইবে কি?"

খরবাহিনী বৈতরণীসৈকতে দাঁড়াইয়া একাকিনী শ্রী এই কথা বলিতেছিল। পশ্চাৎ অতি দূরে নীলমেঘের মত নীলগিরির* শিখরপুঞ্জ দেখা যাইতেছিল; সম্মুখে নীলসলিল-বাহিনী বক্রগামিনী তটিনী রজতপ্রস্তরবৎ বিস্তৃত সৈকতমধ্যে বাহিতা হইতেছিল; পারে কৃষ্ণপ্রস্তরনির্ম্মিত সোপানাবলীর উপর সপ্ত মাতৃকার মণ্ডপ শোভা পাইতেছিল; তন্মধ্যে আসীনা সপ্ত মাতৃকার প্রস্তরময়ী মূর্ত্তিও কিছু কিছু দেখা যাইতেছিল; রাজ্ঞীশোভাসমন্বিতা ইন্দ্রাণী, মধুররূপিণী বৈষ্ণবী, কৌমারী, ব্রহ্মাণী, সাক্ষাৎ বীভৎসরসরূপধারিণী যমপ্রসূতি ছায়া, নানালঙ্কারভূষিতা বিপুলোরুকরচরণোরসী কম্বুকণ্ঠান্দোলিতরত্নহারা লম্বোদরা চীনাম্বরা বরাহবদনা বারাহী, বিশুষ্কাস্থিচর্ম্মমাত্রাবশেষা পলিতকেশা নগ্নবেশা চণ্ডমুণ্ডধারিণী ভীষণা চামুণ্ডা, রাশি রাশি কুসুম চন্দন বিল্বপত্রে প্রপীড়তা হইয়া বিরাজ করিতেছে। তৎপশ্চাৎ বিষ্ণুমণ্ডপের উচ্চ চূড়া নীলাকাশে চিত্রিত; তৎপরে নীলপ্রস্তরের উচ্চস্তম্ভোপরি আকাশমার্গে খগপতি গরুড় সমাসীন।† অতিদূরে উদয়গিরির ও ললিতগিরির বিশাল নীল কলেবর আকাশপ্রান্তে শয়ান।‡ এই সকলের প্রতি শ্রী চাহিয়া দেখিল; বলিল, "হায়! এই ত বৈতরণী। পার হইলে আমার জ্বালা জুড়াইবে কি?"

"এ সে বৈতরণী নহে—
যমদ্বারে মহাঘোরে তপ্তা বৈতরণী নদী—
আগে যমদ্বারে উপস্থিত হও—তবে সে বৈতরণী দেখিবে।"

পিছন হইতে শ্রীর কথার কেহ এই উত্তর দিল। শ্রী ফিরিয়া দেখিল, এক সন্ন্যাসিনী।

শ্রী বলিল, "ও মা! সেই সন্ন্যাসিনী! তা, মা, যমদ্বার বৈতরণীর এ পারে, না ও পারে?"

সন্ন্যাসিনী হাসিল; বলিল, "বৈতরণী পার হইয়া যমপুরে পৌঁছিতে হয়। কেন মা, এ কথা জিজ্ঞাসা করিলে? তুমি এ পারেই কি যমযন্ত্রণা ভোগ করিতেছ?"

* বালেশ্বর জেলার উত্তরভাগস্থিত কতকগুলি পর্ব্বতকে নীলগিরি বলে। তাহাই কোন কোন স্থানে বৈতরণীতীর হইতে দেখা যায়।

† এই গরুড়স্তম্ভ দেখিতে অতি চমৎকার।

‡ পুরুষোত্তম যাইবার আধুনিক যে রাজপথ, এই সকল পর্ব্বত, তাহার বামে থাকে। নিকট নহে।

শ্রী। যন্ত্রণা বোধ হয় দুই পারেই আছে।

সন্ন্যাসিনী। না, মা, যন্ত্রণা সব এই পারেই। ও পারে যে যন্ত্রণার কথা শুনিতে পাও, সে আমরা এই পার হইতে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাই। আমাদের এ জন্মের সঞ্চিত পাপগুলি আমরা গাঁটরি বাঁধিয়া, বৈতরণীর সেই ক্ষেয়ারীর ক্ষেয়ায় বোঝাই দিয়া, বিনা কড়িতে পার করিয়া লইয়া যাই। পরে যমালয়ে গিয়া গাঁটরি খুলিয়া ধীরে সুস্থে সেই ঐশ্বর্য্য একা একা ভোগ করি।

শ্রী। তা, মা, বোঝাটা এ পারে রাখিয়া যাইবার কোন উপায় আছে কি? থাকে ত আমায় বলিয়া দাও, আমি শীঘ্র শীঘ্র উহার বিলি করিয়া বেলায় বেলায় পার হইয়া চলিয়া যাই, রাত করিবার দরকার দেখি না—

সন্ন্যাসিনী। এত তাড়াতাড়ি কেন মা? এখনও তোমার সকাল বেলা।

শ্রী। বেলা হ'লে বাতাস উঠিবে।

সন্ন্যাসিনীর আজিও তুফানের বেলা হয় নাই—বয়সটা কাঁচা রকমের। তাই শ্রী এই রকমের কথা কহিতে সাহস করিতেছিল। সন্ন্যাসিনীও সেই রকম উত্তর দিল, "তুফানের ভয় কর মা। কেন, তোমার কি তেমন পাকা মাঝি নাই?"

শ্রী। পাকা মাঝি আছে, কিন্তু তাঁর নৌকায় উঠিলাম না। কেন তাঁর নৌকা ভারি করিব?

সন্ন্যাসিনী। তাই কি খুঁজিয়া খুঁজিয়া বৈতরণী-তীরে আসিয়া বসিয়া আছ?

শ্রী। আরও পাকা মাঝির সন্ধানে যাইতেছি। শুনিয়াছি, শ্রীক্ষেত্রে যিনি বিরাজ করেন, তিনিই না কি পারের কাণ্ডারী।

সন্ন্যাসিনী। আমিও সেই কাণ্ডারী খুঁজিতে যাইতেছি। চল না, দুই জনে একত্রে যাই। কিন্তু আজ তুমি একা কেন? সে দিন সুবর্ণরেখাতীরে তোমাকে দেখিয়াছিলাম, তখন তোমার সঙ্গে অনেক লোক ছিল—আজ একা কেন?

শ্রী। আমার কেহ নাই। অর্থাৎ আমার অনেক আছে, কিন্তু আমি ইচ্ছাক্রমে সর্ব্বত্যাগী। আমি এক যাত্রীর দলে যুটিয়া শ্রীক্ষেত্রে যাইতেছিলাম, কিন্তু যে যাত্রাওয়ালার (পাণ্ডা) সঙ্গে আমরা যাইতেছিলাম, তিনি আমার প্রতি কিছু কৃপাদৃষ্টি করার লক্ষণ দেখিলাম। কিছু দৌরাত্ম্যের সম্ভাবনা বিবেচনা করিয়া কালি রাত্রিতে যাত্রীর দল হইতে সরিয়া পড়িয়াছিলাম।

সন্ন্যাসিনী। এখন?

শ্রী। এখন, বৈতরণী-তীরে আসিয়া ভাবিতেছি, দুই বার পারে কাজ নাই। এক বারই ভাল। জল যথেষ্ট আছে।

সন্ন্যাসিনী। সে কথাটা না হয়, তোমায় আমায় দুই দিন বিচার করিয়া দেখা যাইবে। তার পর বিচারে যাহা স্থির হয়, তাহাই করিও। বৈতরণী ত তোমার ভয়ে পলাইবে না। কেমন, আমার সঙ্গে আসিবে কি?

শ্রীর মন টলিল। শ্রীর এক পয়সা পুঁজি নাই। দল ছাড়িয়া আসিয়া অবধি আহার হয় নাই; শ্রী দেখিতেছিল, ভিক্ষা এবং মৃত্যু, এই দুই ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। এই সন্ন্যাসিনীর সঙ্গে যেন উপায়ান্তর হইতে পারে বোধ হইল, কিন্তু তাহাতেও সন্দেহ উপস্থিত হইল। জিজ্ঞাসা করিল, "একটা কথা জিজ্ঞাসা করিব মা? তুমি দিনপাত কর কিসে?"

সন্ন্যাসিনী। ভিক্ষায়।

শ্রী। আমি তাহা পারিব না—বৈতরণী তাহার অপেক্ষা সহজ বোধ হইতেছিল।

সন্ন্যাসিনী। তাহা তোমায় করিতে হইবে না—আমি তোমার হইয়া ভিক্ষা করিব।

শ্রী। বাছা, তোমার এই বয়স—তুমি আমার অপেক্ষা ছোট বৈ বড় হইবে না। তোমার এই রূপের রাশি—

সন্ন্যাসিনী অতিশয় সুন্দরী—বুঝি শ্রীর অপেক্ষাও সুন্দরী। কিন্তু রূপ ঢাকিবার জন্য আচ্ছা করিয়া বিভূতি মাখিয়াছিল। তাহাতে হিতে বিপরীত হইয়াছিল—ঘসা ফানুষের ভিতর আলোর মত রূপের আগুন আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল।

শ্রীর কথার উত্তরে সন্ন্যাসিনী বলিল, "আমরা উদাসীন, সংসারত্যাগী, আমাদের কিছুতেই কোন ভয় নাই। ধর্ম্ম আমাদের রক্ষা করেন।"

শ্রী। তা যেন হইল। তুমি সন্ন্যাসিনী বলিয়া নির্ভয়। কিন্তু আমি বেলপাতের পোকার মত, তোমার সঙ্গে বেড়াইব কি প্রকারে? তুমিই বা লোকের কাছে এ পোকার কি পরিচয় দিবে? বলিবে কি যে, উড়িয়া আসিয়া গায়ে পড়িয়াছে?

সন্ন্যাসিনী হাসিল—ফুল্লাধরে মধুর হাসিতে বিদ্যুদ্দীপ্ত মেঘাবৃত আকাশের ন্যায়, সেই ভস্মাবৃত রূপমাধুরী প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল।

সন্ন্যাসিনী বলিল, "তুমিও কেন বাছা এই বেশ গ্রহণ কর না?"

শ্রী শিহরিয়া উঠিল,—বলিল, "সে কি? আমি সন্ন্যাসিনী হইবার কে?"

সন্ন্যাসিনী। আমি তাহা হইতে বলিতেছি না। তুমি যখন সর্ব্বত্যাগী হইয়াছ বলিতেছ, তখন তোমার চিত্তে যদি পাপ না থাকে, তবে হইলেই বা দোষ কি? কিন্তু এখন সে কথা থাক—এখন তা বলিতেছি না। এখন এই বেশ ছদ্মবেশস্বরূপ গ্রহণ কর না—তাতে দোষ কি?

শ্রী। মাথা মুড়াইতে হইবে? আমি সধবা।

সন্ন্যাসিনী। আমি মাথা মুড়াই নাই দেখিতেছ।

শ্রী। জটা ধারণ করিয়াছ?

সন্ন্যাসিনী। না, তাও করি নাই। তবে চুলগুলাতে কখনও তেল দিই না, ছাই মাখিয়া রাখি, তাই কিছু জট পড়িয়া থাকিবে।

শ্রী। চুলগুলি যেরূপ কুণ্ডলী করিয়া ফণা ধরিয়া আছে, আমার ইচ্ছা করিতেছে, একবার তেল দিয়া আঁচড়াইয়া বাঁধিয়া দিই।

সন্ন্যা। জন্মান্তরে হইবে,—যদি মানবদেহ পাই। এখন তোমায় সন্ন্যাসিনী সাজাইব কি?

শ্রী। কেবল চুলে ছাই মাখিলেই কি সাজ হইবে?

সন্ন্যা। না—গৈরিক, রুদ্রাক্ষ, বিভূতি, সব আমার এই রাঙ্গা ঝুলিতে আছে। সব দিব।

শ্রী কিঞ্চিৎ ইতস্তত: করিয়া সম্মত হইল। তখন নিভৃত এক বৃক্ষতলে বসিয়া সেই রূপসী সন্ন্যাসিনী শ্রীকে আর এক রূপসী সন্ন্যাসিনী সাজাইল। কেশদামে ভস্ম মাখাইল, অঙ্গে গৈরিক পরাইল, কণ্ঠে ও বাহুতে রুদ্রাক্ষ পরাইল, সর্ব্বাঙ্গে বিভূতি লেপন করিল, পরে রঙ্গের দিকে মন দিয়া শ্রীর কপালে একটি চন্দনের টিপ দিয়া দিল। তখন ভুবন-বিজয়াভিলাষী মধুমন্মথের ন্যায় দুই জনে যাত্রা করিয়া, বৈতরণী পার হইয়া, সে দিন এক দেবমন্দিরের অতিথিশালায় রাত্রি যাপন করিল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

পরদিন প্রাতে উঠিয়া, খরস্রোতা* জলে যথাবিধি স্নানাহ্নিক সমাপন করিয়া শ্রী ও সন্ন্যাসিনী, বিভূতি-রুদ্রাক্ষাদি-শোভিতা হইয়া পুনরপি, "সঞ্চারিণী দীপশিখা"দ্বয়ের ন্যায় শ্রীক্ষেত্রের পথ আলো করিয়া চলিল। তৎপ্রদেশবাসীরা সর্ব্বদাই নানাবিধ যাত্রীকে সেই পথে যাতায়াত করিতে দেখে, কোন প্রকার যাত্রী দেখিয়া বিস্মিত হয় না, কিন্তু আজ ইহাদিগকে দেখিয়া তাহারাও বিস্মিত হইল। কেহ বলিল, "কি পরি মাইকিনিয়া মানে যাউছন্তি পারা?" কেহ বলিল, "সে মানে ঠাবতা হ্যাব।" কেহ আসিয়া প্রণাম করিল; কেহ ধন দৌলত বর মাগিল। একজন পণ্ডিত তাহাদিগকে নিষেধ করিয়া বলিল, "কিছু বলিও না; ইহারা বোধ হয় রুক্মিণী সত্যভামা স্বশরীরে স্বামিদর্শনে যাইতেছেন।" অপরে মনে করিল যে, রুক্মিণী সত্যভামা শ্রীক্ষেত্রেই আছেন, তাঁহাদিগের গমন সম্ভব নহে; অতএব

* নদীর নাম।

নিশ্চয়ই ইঁহারা শ্রীরাধিকা এবং চন্দ্রাবলী, গোপকন্যা বলিয়া পদব্রজে যাইতেছেন। এই সিদ্ধান্ত স্থিরীকৃত হইলে, এক দুষ্টা স্ত্রী বলিল, "হুউ হুউ! যা! যা! সেঠিরে তা ভৌউড়ি* অছি, তুমানঙ্কো মারি পকাইব।"

এ দিকে শ্রীরাধিকা চন্দ্রাবলী আপন মনে কথোপকথন করিতে করিতে যাইতেছিল। সন্ন্যাসিনী বিরাগিণী প্রব্রজিতা, অনেক দিন হইতে তাহার সুহৃদ্ কেহ নাই; আজ এক জন সমবয়স্কা প্রব্রজিতাকে পাইয়া তাহার চিত্ত একটু প্রফুল্ল হইয়াছিল। এখনও তার জীবন-স্রোতঃ কিছুই শুকায় নাই। বরং শ্রীর শুকাইয়াছিল; কেন না, শ্রী দুঃখ কি, তাহা জানিয়াছিল, সন্ন্যাসী বৈরাগীর দুঃখ নাই। কথাবার্ত্তা যাহা হইতেছিল, তাহার মধ্যে গোটা দুই কথা কেবল পাঠককে শুনান আবশ্যক।

সন্ন্যাসিনী। তুমি বলিতেছ, তোমার স্বামী আছেন। তিনি তোমাকে লইয়া ঘর সংসার করিতেও ইচ্ছুক। তাতে তুমি গৃহত্যাগিনী হইয়াছ কেন, তাও তোমায় জিজ্ঞাসা করি না। কেন না, তোমার ঘরের কথা আমার জানিয়া কি হইবে? তবে এটা জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি যে, কখনও ঘরে ফিরিয়া যাইবার তোমার ইচ্ছা আছে কি না?

শ্রী। তুমি হাত দেখিতে জান?

সন্ন্যা। না। হাত দেখিয়া কি তাহা জানিতে হইবে?

শ্রী। না। তাহা হইলে আমি তোমাকে হাত দেখাইয়া, তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করিয়া, সে বিষয় স্থির করিতাম।

সন্ন্যা। আমি হাত দেখিতে জানি না। কিন্তু তোমাকে এমন লোকের কাছে লইয়া যাইতে পারি যে, তিনি এ বিদ্যায় ও আর সকল বিদ্যাতেই অভ্রান্ত।

শ্রী। কোথায় তিনি?

সন্ন্যা। ললিতগিরিতে হস্তিগুম্ফায় এক যোগী বাস করেন। আমি তাঁহার কথা বলিতেছি।

শ্রী। ললিতগিরি কোথায়?

সন্ন্যা। আমরা চেষ্টা করিলে আজ সন্ধ্যার পর পৌঁছিতে পারি।

শ্রী। তবে চল।

তখন দুই জনে দ্রুতগতি চলিতে লাগিল। জ্যোতির্ব্বিদ্ দেখিলে বলিত, আজ বৃহস্পতি শুক্র উভয় গ্রহ যুক্ত হইয়া শীঘ্রগামী হইয়াছে।†

---

* সুভদ্রা।

† হিন্দু জ্যোতিষশাস্ত্রে Accelerated Motionকে শীঘ্রগতি বলে। দুইটী গ্রহকে পৃথিবী হইতে যখন একরাশিস্থিত দেখা যায়, তখন তাহাদিগকে যুক্ত বলা যায়।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

এক পারে উদয়গিরি, অপর পারে ললিতগিরি, মধ্যে স্বচ্ছসলিলা কল্লোলিনী বিরূপা নদী, নীলবারিরাশি লইয়া সমুদ্রাভিমুখে চলিয়াছে।* গিরিশিখরদ্বয়ে আরোহণ করিলে নিম্নে সহস্র সহস্র তালবৃক্ষ শোভিত, ধান্য বা হরিৎক্ষেত্রে চিত্রিত, পৃথ্বী অতিশয় মনোমোহিনী দেখা যায়—শিশু যেমন মার কোলে উঠিলে মাকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী দেখে, মনুষ্য পর্ব্বতারোহণ করিয়া পৃথিবী দর্শন করিলে সেইরূপ দেখে। উদয়গিরি (বর্ত্তমান অল্‌তিগিরি) বৃক্ষরাজিতে পরিপূর্ণ, কিন্তু ললিতগিরি (বর্ত্তমান নাল্‌তিগিরি) বৃক্ষশূন্য প্রস্তরময়। এককালে ইহার শিখর ও সানুদেশ অট্টালিকা, স্তূপ, এবং বৌদ্ধ মন্দিরাদিতে শোভিত ছিল। এখন শোভার মধ্যে শিখর-দেশে চন্দনবৃক্ষ, আর মৃত্তিকাপ্রোথিত ভগ্ন-গৃহবিশিষ্ট প্রস্তর, ইষ্টক বা মনোমুগ্ধকর প্রস্তরগঠিত মূর্ত্তিরাশি। তাহার দুই চারিটা কলিকাতার বড় বড় ইমারতের ভিতর থাকিলে কলিকাতার শোভা হইত। হায়! এখন কি না হিন্দুকে ইণ্ডষ্ট্রিয়ল্ স্কুলে পুতুল গড়া শিখিতে হয়! কুমারসম্ভব ছাড়িয়া সুইন্‌বর্ণ্ পড়ি, গীতা ছাড়িয়া মিল্ পড়ি, আর উড়িষ্যার প্রস্তর-শিল্প ছাড়িয়া, সাহেবদের চীনের পুতুল হাঁ করিয়া দেখি। আরও কি কপালে আছে বলিতে পারি না।

আমি যাহা দেখিয়াছি, তাহাই লিখিতেছি। সেই ললিতগিরি আমার চিরকাল মনে থাকিবে। চারি দিকে—যোজনের পর যোজন ব্যাপিয়া—হরিদ্বর্ণ ধান্যক্ষেত্র,—মাতা বসুমতীর অঙ্গে বহু-যোজন-বিস্তৃতা পীতাম্বরী শাটী। তাহার উপর মাতার অলঙ্কার স্বরূপ, তালবৃক্ষশ্রেণী—সহস্র সহস্র, তার পর সহস্র সহস্র তালবৃক্ষ; সরল, সুপত্র, শোভাময়। মধ্যে নীলসলিলা বিরূপা, নীল পীত পুষ্পময় হরিৎক্ষেত্র মধ্য দিয়া বহিতেছে—সুকোমল গালিচার উপর কে নদী আঁকিয়া দিয়াছে। তা হোক—চারি পাশে মৃত মহাত্মাদের মহীয়সী কীর্ত্তি। পাথর এমন করিয়া যে পালিশ করিয়াছিল, সে কি এই আমাদের মত হিন্দু? এমন করিয়া বিনা বন্ধনে যে গাঁথিয়াছিল, সে কি আমাদের মত হিন্দু? আর এই প্রস্তরমূর্ত্তি সকল যে খোদিয়াছিল—এই দিব্য পুষ্পমাল্যাভরণভূষিত বিকম্পিতচেলাঞ্চল-প্রবৃদ্ধসৌন্দর্য্য, সর্ব্বাঙ্গসুন্দরগঠন, পৌরুষের সহিত লাবণ্যের মূর্ত্তিমান্ সম্মিলনস্বরূপ পুরুষ-মূর্ত্তি, যাহারা গড়িয়াছে, তাহারা কি হিন্দু? এই কোপপ্রেমগর্ব্বসৌভাগ্যস্ফুরিতাধরা, চীনাম্বরা, তরলিতরত্নহারা, পীবরযৌবনভারাবনতদেহা—

* এখন বিরূপা অতিশয় বিরূপা। এখন তাহাকে বাঁধিয়া ফেলিয়াছে। ইংরেজের প্রতাপে বৈতরণী স্বয়ং বাঁধা—বিরূপাই বা কে—আর কেই বা কে?

তন্বী শ্যামা শিখরদশনা পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী
মধ্যে ক্ষামা চকিতহরিণীপ্রেক্ষণা নিম্ননাভিঃ—

এই সকল স্ত্রীমূর্ত্তি যারা গড়িয়াছে, তারা কি হিন্দু? তখন হিন্দুকে মনে পড়িল। তখন মনে পড়িল, উপনিষদ্, গীতা, রামায়ণ, মহাভারত, কুমারসম্ভব, শকুন্তলা, পাণিনি, কাত্যায়ন, সাংখ্য, পাতঞ্জল, বেদান্ত, বৈশেষিক, এ সকলই হিন্দুর কীর্ত্তি—এ পুতুল কোন্ ছার! তখন মনে করিলাম, হিন্দুকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া জন্ম সার্থক করিয়াছি।

সেই ললিতগিরির পদতলে বিরূপা-তীরে গিরির শরীরমধ্যে, হস্তিগুম্ফা নামে এক গুহা ছিল। গুহা বলিয়া, আবার ছিল বলিতেছি কেন? পর্ব্বতের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কি আবার লোপ পায়? কাল বিগুণ হইলে সবই লোপ পায়। গুহাও আর নাই। ছাদ পড়িয়া গিয়াছে, স্তম্ভ সকল ভাঙ্গিয়া গিয়াছে,—তলদেশে ঘাস গজাইতেছে। সর্ব্বস্ব লোপ পাইয়াছে, গুহাটার জন্য দুঃখে কাজ কি?

কিন্তু গুহা বড় সুন্দর ছিল। পর্ব্বতাঙ্গ হইতে খোদিত স্তম্ভপ্রাকার প্রভৃতি বড় রমণীয় ছিল। চারি দিকে অপূর্ব্ব প্রস্তরে খোদিত নরমূর্ত্তি সকল শোভা করিত। তাহারই দুই চারিটি আজিও আছে। কিন্তু ছাতা পড়িয়াছে, রঙ্গ জ্বলিয়া গিয়াছে, কাহারও নাক ভাঙ্গিয়াছে, কাহারও হাত ভাঙ্গিয়াছে, কাহারও পা ভাঙ্গিয়াছে। পুতুলগুলাও আধুনিক হিন্দুর মত অঙ্গহীন হইয়া আছে।

কিন্তু গুহার এ দশা আজকাল হইয়াছে। আমি যখনকার কথা বলিতেছি, তখন এমন ছিল না— গুহা সম্পূর্ণ ছিল। তাহার ভিতর পরম যোগী মহাত্মা গঙ্গাধর স্বামী বাস করিতেন।

যথাকালে সন্ন্যাসিনী শ্রীকে সমভিব্যাহারে লইয়া তথা উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, গঙ্গাধর স্বামী তখন ধ্যানে নিমগ্ন। অতএব কিছু না বলিয়া, তাঁহারা সে রাত্রি গুহাপ্রান্তে শয়ন করিয়া যাপন করিলেন।

প্রত্যুষে ধ্যান ভঙ্গ হইলে, গঙ্গাধর স্বামী গাত্রোত্থানপূর্ব্বক, বিরূপায় স্নান করিয়া, প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিলেন। পরে তিনি প্রত্যাগত হইলে সন্ন্যাসিনী প্রণতা হইয়া তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিল; শ্রীও তাহাই করিল।

গঙ্গাধর স্বামী শ্রীর সঙ্গে তখন কোন কথা কহিলেন না, বা তৎসম্বন্ধে সন্ন্যাসিনীকে কিছুই জিজ্ঞাসা করিলেন না; তিনি কেবল সন্ন্যাসিনীর সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। দুর্ভাগ্য—সকল কথাই সংস্কৃত ভাষায় হইল। শ্রী তাহার এক বর্ণ বুঝিল না। যে কয়টা কথা পাঠকের জানিবার প্রয়োজন, তাহা বাঙ্গালায় বলিতেছি।

স্বামী। এ স্ত্রী কে?

সন্ন্যাসিনী। পথিক।

স্বামী। এখানে কেন?

সন্ন্যা। ভবিষ্যৎ লইয়া গোলে পড়িয়াছে। আপনাকে কর দেখাইবার জন্য আসিয়াছে। উহার প্রতি ধর্ম্মানুমত আদেশ করুন।

শ্রী তখন নিকটে আসিয়া আবার প্রণাম করিল। স্বামী তাহার মুখ পানে চাহিয়া দেখিয়া হিন্দীতে বলিলেন, "তোমার কর্কট রাশি।"*

শ্রী নীরব।

"তোমার পুষ্যা নক্ষত্রস্থিত চন্দ্রে জন্ম।"

শ্রী নীরব।

"গুহার বাহিরে আইস—হাত দেখিব।"

তখন শ্রীকে বাহিরে আনিয়া, তাহার বাম হস্তের রেখা সকল, স্বামী নিরীক্ষণ করিলেন। খড়ি পাতিয়া জন্মশক, দিন, বার, তিথি, দণ্ড, পল, সকল নিরূপণ করিলেন। পরে জন্মকুণ্ডলী অঙ্কিত করিয়া, গুহাস্থিত তালপত্রলিখিত প্রাচীন পঞ্জিকা দেখিয়া, দ্বাদশ ভাবে গ্রহগণের যথাযথ সমাবেশ করিলেন। পরে শ্রীকে বলিলেন, "তোমার লগ্নে স্বক্ষেত্রস্থ পূর্ণচন্দ্র এবং সপ্তমে বুধ বৃহস্পতি শুক্র তিনটি শুভগ্রহ আছেন। তুমি সন্ন্যাসিনী কেন মা? তুমি যে রাজমহিষী।"†

শ্রী। শুনিয়াছি, আমার স্বামী রাজা হইয়াছেন। আমি তাহা দেখি নাই।

স্বামী। তুমি তাহা দেখিবে না বটে। এই সপ্তমস্থ বৃহস্পতি নীচস্থ, এবং শুভগ্রহত্রয় পাপগ্রহের ক্ষেত্রে‡ পাপদৃষ্ট হইয়া আছেন। তোমার অদৃষ্টে রাজ্যভোগ নাই।

শ্রী তা কিছুই বুঝে না, চুপ করিয়া রহিল। আরও একটু দেখিয়া স্বামীকে বলিল, "আর কিছু দুর্ভাগ্য দেখিতেছেন?"

স্বামী। চন্দ্র শনির ত্রিংশাংশগত।

শ্রী। তাহাতে কি হয়?

স্বামী। তুমি তোমার প্রিয়জনের প্রাণহন্ত্রী হইবে।

* শরকনকশরীরো দেবনম্রপ্রকাশো
ভবতি বিপুলবক্ষাঃ কর্কটো যস্য রাশিঃ।—কোষ্ঠীপ্রদীপে।

এইরূপ লক্ষণাদি দেখিয়া জ্যোতির্ব্বিদেরা রাশি ও নক্ষত্র নির্ণয় করেন।

† জামাস্থে চ শুভত্রয়ে প্রণয়িনী রাজ্ঞী ভবেদ্ভূপতেঃ।

‡ মকরে।

শ্রী আর বসিল না—উঠিয়া চলিল। স্বামী তাহাকে ইঙ্গিত করিয়া ফিরাইলেন। বলিলেন, "তিষ্ঠ। তোমার অদৃষ্টে এক পরম পুণ্য আছে। তাহার সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই। সময় উপস্থিত হইলে স্বামিসন্দর্শনে গমন করিও।"

শ্রী। কবে সে সময় উপস্থিত হইবে?

স্বামী। এখন তাহা বলিতে পারিতেছি না। অনেক গণনার প্রয়োজন। সে সময়ও নিকট নহে। তুমি কোথা যাইতেছ?

শ্রী। পুরুষোত্তমদর্শনে যাইব, মনে করিয়াছি।

স্বামী। যাও। সময়ান্তরে, আগামী বৎসরে, তুমি আমার নিকট আসিও। সময় নির্দ্দেশ করিয়া বলিব।

তখন স্বামী সন্ন্যাসিনীকেও বলিলেন, "তুমিও আসিও।"

তখন গঙ্গাধর স্বামী বাক্যালাপ বন্ধ করিয়া ধ্যানস্থ হইলেন। সন্ন্যাসিনীদ্বয় তাঁহাকে প্রণাম করিয়া গুহা হইতে বহির্গত হইল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

আবার সেই যুগল সন্ন্যাসিনীমূর্ত্তি উড়িষ্যার রাজপথ আলো করিয়া পুরুষোত্তমাভিমুখে চলিল। উড়িয়ারা পথে সারি দিয়া দাঁড়াইয়া হাঁ করিয়া দেখিতে লাগিল। কেহ আসিয়া তাহাদের পায়ের কাছে লম্বা হইয়া শুইয়া পড়িয়া বলিল, "মো মুণ্ডেরে চরড় দিবারে হউ।" কেহ কেহ বলিল, "টিকে ঠিয়া হৈকিরি ম দুঃখ শুনিবারে হউ।" সকলকে যথাসম্ভব উত্তরে প্রফুল্ল করিয়া সুন্দরীদ্বয় চলিল।

চঞ্চলগামিনী শ্রীকে একটু স্থির করিবার জন্য সন্ন্যাসিনী বলিল, "ধীরে যা গো বহিন্! একটু ধীরে যা। ছুটিলে কি অদৃষ্ট ছাড়াইয়া যাইতে পারিবি?"

স্নেহসম্বোধনে শ্রীর প্রাণ একটু জুড়াইল। দুই দিন সন্ন্যাসিনীর সঙ্গে থাকিয়া, শ্রী তাহাকে ভালবাসিতে আরম্ভ করিয়াছিল। এ দুই দিন, মা! বাছা! বলিয়া কথা হইতেছিল,—কেন না, সন্ন্যাসিনী শ্রীর পূজনীয়া। সন্ন্যাসিনী সে সম্বোধন ছাড়িয়া বহিন্ সম্বোধন করায় শ্রী বুঝিল যে, সেও ভালবাসিতে আরম্ভ করিয়াছে। শ্রী ধীরে চলিল।

সন্ন্যাসিনী বলিতে লাগিল, "আর মা বাছা সম্বোধন তোমার সঙ্গে পোষায় না—আমাদের দুজনেরই সমান্ বয়স, আমরা দুই জনে ভগিনী।"

শ্রী। তুমিও কি আমার মত দুঃখে সংসার ত্যাগ করিয়াছ?

সন্ন্যাসিনী। আমার সুখ দুঃখ নাই। তেমন অদৃষ্ট নয়। তোমার দুঃখের কথা শুনিব। সে এখনকার কথা নয়। তোমার নাম এখনও পর্য্যন্ত জিজ্ঞাসা করা হয় নাই—কি বলিয়া তোমায় ডাকিব?

শ্রী। আমার নাম শ্রী। তোমায় কি বলিয়া ডাকিব?

সন্ন্যাসিনী। আমার নাম জয়ন্তী। আমাকে তুমি নাম ধরিয়াই ডাকিও। এখন তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, স্বামী যাহা বলিলেন, তাহা শুনিলে? এখন বোধ হয় তোমার আর ঘরে ফিরিবার ইচ্ছা নাই। দিন কাটাইবারও অন্য উপায় নাই। দিন কাটাইবে কি প্রকারে, কখনও কি ভাবিয়াছ?

শ্রী। না। ভাবি নাই। কিন্তু এত দিন ত কাটিয়া গেল।

জয়ন্তী। কিরূপে কাটিল?

শ্রী। বড় কষ্টে—পৃথিবীতে এমন দুঃখ বুঝি আর নাই।

জয়ন্তী। ইহার এক উপায় আছে—আর কিছুতে মন দাও।

শ্রী। কিসে মন দিব?

জয়ন্তী। এত বড় জগৎ—কিছুই কি মন দিবার নাই?

শ্রী। পাপে?

জয়ন্তী। না। পুণ্যে।

শ্রী। স্ত্রীলোকের একমাত্র পুণ্য স্বামিসেবা। যখন তাই ছাড়িয়া আসিয়াছি—তখন আমার আবার পুণ্য কি আছে?

জয়ন্তী। স্বামীর এক জন স্বামী আছেন।

শ্রী। তিনি স্বামীর স্বামী—আমার নন। আমার স্বামীই আমার স্বামী—আর কেহ নহে।

জয়ন্তী। যিনি তোমার স্বামীর স্বামী, তিনি তোমারও স্বামী—কেন না, তিনি সকলের স্বামী।

শ্রী। আমি ঈশ্বরও জানি না—স্বামীই জানি।

জয়ন্তী। জানিবে? জানিলে এত দুঃখ থাকিবে না।

শ্রী। না। স্বামী ছাড়িয়া আমি ঈশ্বরও চাহি না। আমার স্বামীকে আমি ত্যাগ করিয়াছি বলিয়া আমার যে দুঃখ, আর ঈশ্বর পাইলে আমার যে সুখ, ইহার মধ্যে আমার স্বামি-বিরহদুঃখই আমি ভালবাসি।

জয়ন্তী। যদি এত ভাল বাসিয়াছিলে—তবে ত্যাগ করিলে কেন?

শ্রী। আমার কোষ্ঠীর ফল শুনিলে না? কোষ্ঠীর ফল শুনিয়াছিলাম।

জয়ন্তী। এত ভাল বাসিয়াছিলে কিসে ?

শ্রী তখন সংক্ষেপে আপনার পূর্ব্ববিবরণ সকল বলিল। শুনিয়া জয়ন্তীর চক্ষু একটু ছল ছল করিল। জয়ন্তী বলিল, "তোমার সঙ্গে তাঁর ত দেখা সাক্ষাৎ নাই বলিলেও হয়—এত ভাল বাসিলে কিসে ?"

শ্রী। তুমি ঈশ্বর ভাল বাস—কয় দিন ঈশ্বরের সঙ্গে তোমার দেখা সাক্ষাৎ হইয়াছে ?

জয়ন্তী। আমি ঈশ্বরকে রাত্রি দিন মনে মনে ভাবি।

শ্রী। যে দিন বালিকা বয়সে তিনি আমায় ত্যাগ করিয়াছিলেন, সে দিন হইতে আমিও তাঁহাকে রাত্রি দিন ভাবিয়াছিলাম।

জয়ন্তী শুনিয়া রোমাঞ্চকলেবর হইয়া উঠিল। শ্রী বলিতে লাগিল, "যদি একত্র ঘর সংসার করিতাম, তাহা হইলে বুঝি এমনটা ঘটিত না। মানুষ মাত্রেরই দোষ গুণ আছে। তাঁরও দোষ থাকিতে পারে। না থাকিলেও আমার দোষে আমি তাঁর দোষ দেখিতাম। কখন না কখন, কথান্তর, মন ভার, অকৌশল ঘটিত। তা হইলে, এ আগুন এত জ্বলিত না। কেবল মনে মনে দেবতা গড়িয়া তাঁকে আমি এত বৎসর পূজা করিয়াছি। চন্দন ঘষিয়া, দেয়ালে লেপন করিয়া মনে করিয়াছি, তাঁর অঙ্গে মাখাইলাম। বাগানে বাগানে ফুল চুরি করিয়া তুলিয়া, দিনভোর কাজ কর্ম্ম ফেলিয়া অনেক পরিশ্রমে মনের মত মালা গাঁথিয়া, ফুলভরা গাছের ডালে ঝুলাইয়া মনে করিয়াছি, তাঁর গলায় দিলাম। অলঙ্কার বিক্রয় করিয়া ভাল খাবার সামগ্রী কিনিয়া পরিপাটি করিয়া রন্ধন করিয়া নদীর জলে ভাসাইয়া দিয়া মনে করিয়াছি, তাঁকে খাইতে দিলাম। ঠাকুরপ্রণাম করিতে গিয়া কখনও মনে হয় নাই যে, ঠাকুরপ্রণাম করিতেছি—মাথার কাছে তাঁরই পাদপদ্ম দেখিয়াছি। তার পর জয়ন্তী—তাঁকে ছাড়িয়া আসিয়াছি। তিনি ডাকিলেন, তবু ছাড়িয়া আসিয়াছি।"

শ্রী আর কথা কহিতে পারিল না। মুখে অঞ্চল চাপিয়া প্রাণ ভরিয়া কাঁদিল।

জয়ন্তীরও চক্ষু ছল ছল করিল। এমন সন্ন্যাসিনী কি সন্ন্যাসিনী ?

দ্বিতীয় খণ্ড

সন্ধ্যা—জয়ন্তী

প্রথম পরিচ্ছেদ

সীতারাম প্রথমাবধিই শ্রীর বহুবিধ অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। মাসের পর মাস গেল, বৎসরের পর বৎসর গেল। এই কয় বৎসর সীতারাম ক্রমশঃ শ্রীর অনুসন্ধান করিতেছিলেন। তীর্থে তীর্থে, নগরে নগরে তাহার সন্ধানে লোক পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু কোন ফল দর্শে নাই। অন্য লোকে শ্রীকে চিনে না বলিয়া সন্ধান হইতেছে না, এই শঙ্কায় গঙ্গারামকেও কিছু দিনের জন্য রাজকর্ম্ম হইতে অবসৃত করিয়া এই কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। গঙ্গারামও বহু দেশ পর্য্যটন করিয়া শেষে নিষ্ফল হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছিল।

শেষে সীতারাম স্থির করিলেন যে, আর শ্রীকে মনে স্থান দিবেন না। রাজ্যস্থাপনেই চিত্তনিবেশ করিবেন। তিনি এ পর্য্যন্ত প্রকৃত রাজা হয়েন নাই; কেন না, দিল্লীর সম্রাট্ তাঁহাকে সনন্দ দেন নাই। তাঁর সনন্দ পাইবার অভিলাষ হইল। সেই অভিপ্রায়ে তিনি অচিরে দিল্লী যাত্রা করিবেন, ইহা স্থির করিলেন।

কিন্তু সময়টা বড় মন্দ উপস্থিত হইল। কেন না, হিন্দুর হিন্দুয়ানি বড় মাথা তুলিয়া উঠিতেছিল, মুসলমানের তাহা অসহ্য হইয়া উঠিল। নিজ মহম্মদপুর উচ্চচূড় দেবালয় সকলে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। নিকটে গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে, গৃহে গৃহে দেবালয় প্রতিষ্ঠা, দৈবোৎসব, নৃত্য গীত, হরিসংকীর্ত্তনে দেশ চঞ্চল হইয়া উঠিল। আবার এই সময়ে, মহাপাপিষ্ঠ, মনুষ্যাধম মুর্‌শিদ্ কুলি খাঁ* মুরশিদাবাদের মসনদে আরূঢ় থাকায়, সুবে বাঙ্গালার আর সকল প্রদেশে হিন্দুর উপর অতিশয় অত্যাচার হইতে লাগিল—বোধ হয়, ইতিহাসে তেমন অত্যাচার আর কোথাও লিখে না। মুর্‌শিদ্ কুলি খাঁ শুনিলেন, সর্ব্বত্র হিন্দু ধূল্যবলুণ্ঠিত, কেবল এইখানে তাহাদের বড় প্রশ্রয়। তখন তিনি তোরাব্ খাঁর প্রতি আদেশ পাঠাইলেন—"সীতারামকে বিনাশ কর।"

অতএব ভূষণায় সীতারামের ধ্বংসের উদ্যোগ হইতে লাগিল। তবে, 'উদ্যোগ কর' বলিবামাত্র উদ্যোগটা হইয়া উঠিল না; কেন না, মুর্‌শিদ্ কুলি খাঁ সীতারামের বধের জন্য

* ইংরেজ ইতিহাসবেত্তৃগণের পক্ষপাত এবং কতকটা অজ্ঞতা নিবন্ধন সেরাজউদ্দৌলা ঘৃণিত, এবং মুর্‌শিদ্ কুলি খাঁ প্রশংসিত। মুর্‌শিদের তুলনায় সেরাজউদ্দৌলা দেবতাবিশেষ ছিলেন।

হুকুম পাঠাইয়াছিলেন, ফৌজ পাঠান নাই। ইহাতে তিনি তোরাবের প্রতি কোন অবিচার করেন নাই, মুসলমানের পক্ষে তাঁহার অবিচার ছিল না। তখনকার সাধারণ নিয়ম এই ছিল যে—সাধারণ 'শান্তিরক্ষার' কার্য্য ফৌজদারেরা নিজ ব্যয়ে করিবেন,—বিশেষ কারণ ব্যতীত নবাবের সৈন্য ফৌজদারের সাহায্যে আসিত না। এক জন জমীদারকে শাসিত করা, সাধারণ শান্তিরক্ষার কার্য্যের মধ্যে গণ্য—তাই নবাব কোন সিপাহী পাঠাইলেন না। এ দিকে ফৌজদার হিসাব করিয়া দেখিলেন যে, যখন শুনা যাইতেছে যে, সীতারাম রায়, আপনার এলাকার সমস্ত বয়ঃপ্রাপ্ত পুরুষদিগকে অস্ত্রবিদ্যা শিখাইয়াছে, তখন ফৌজদারের যে কয় শত সিপাহী আছে, তাহা লইয়া মহম্মদপুর আক্রমণ করিতে যাওয়া বিধেয় হয় না। অতএব ফৌজদারের প্রথম কার্য্য সিপাহী-সংখ্যা বৃদ্ধি করা। সেটা দুই এক দিনে হয় না। বিশেষ তিনি পশ্চিমে মুসলমান—দেশী লোকের যুদ্ধ করিবার শক্তির উপর তাঁহার কিছু মাত্র বিশ্বাস ছিল না। অতএব মুরশিদাবাদ বা বেহার বা পশ্চিমাঞ্চল হইতে সুশিক্ষিত পাঠান আনাইতে নিযুক্ত হইলেন। বিশেষতঃ তিনি শুনিয়াছিলেন যে সীতারামও অনেক শিক্ষিত রাজপুত ও ভোজপুরী (বেহারবাসী) আপনার সৈন্যমধ্যে নিবিষ্ট করিয়াছেন। কাজেই তদুপযোগী সৈন্য সংগ্রহ না করিয়া সীতারামকে ধ্বংস করিবার জন্য যাত্রা করিতে পারিলেন না। তাহাতে একটু কালবিলম্ব হইল। তত দিন যেমন চলিতেছিল, তেমনই চলিতে লাগিল।

তোরাব্ খাঁ বড় গোপনে গোপনে এই সকল উদ্যোগ করিতেছিলেন। সীতারাম অগ্রে যাহাতে কিছুই না জানিতে পারে, হঠাৎ গিয়া তাহার উপর ফৌজ লইয়া পড়েন, ইহাই তাঁহার ইচ্ছা। কিন্তু সীতারাম সমুদয়ই জানিতেন। চতুর চন্দ্রচূড় জানিতেন। গুপ্তচর ভিন্ন রাজ্য নাই—রামচন্দ্রেরও দুর্ম্মুখ ছিল। চন্দ্রচূড়ের গুপ্তচর ভূষণার ভিতরেও ছিল। অতএব সীতারামকে রাজধানী সহিত ধ্বংস করিবার আজ্ঞা যে মুরশিদাবাদ হইতে আসিয়াছে, এবং তজ্জন্য বাছা বাছা সিপাহী সংগ্রহ হইতেছে, ইহা চন্দ্রচূড় জানিলেন।

ইহার সকল উদ্যোগ করিয়া সীতারাম কিছু অর্থ এবং রক্ষকবর্গ সঙ্গে লইয়া দিল্লী যাত্রা করিলেন। গমনকালে সীতারাম রাজ্যরক্ষার ভার চন্দ্রচূড়, মৃণ্ময় ও গঙ্গারামের উপর দিয়া গেলেন। মন্ত্রণা ও কোষাগারের ভার চন্দ্রচূড়ের উপর, সৈন্যের অধিকার মৃণ্ময়কে, নগররক্ষার ভার গঙ্গারামকে, এবং অন্তঃপুরের ভার নন্দাকে দিয়া গেলেন। কাঁদাকাটির ভয়ে সীতারাম রমাকে বলিয়া গেলেন না। সুতরাং রমা কাঁদিয়া দেশ ভাসাইল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কান্নাকাটি একটু থামিলে, রমা একটু ভাবিয়া দেখিল। তাহার বুদ্ধিতে এই উদয় হইল যে, এ সময়ে সীতারাম দিল্লী গিয়াছেন, ভালই হইয়াছে। যদি এ সময় মুসলমান আসিয়া সকলকে মারিয়া ফেলে, তাহা হইলেও সীতারাম বাঁচিয়া গেলেন। অতএব রমার যেটা প্রধান ভয়, সেটা দূর হইল। রমা নিজে মরে, তাহাতে রমার তেমন কিছু আসিয়া যায় না। হয় ত তাহারা বর্শা দিয়া খোঁচাইয়া রমাকে মারিয়া ফেলিবে, নয় ত তরবারি দিয়া টুকরা টুকরা করিয়া কাটিয়া ফেলিবে, নয় ত বন্দুক দিয়া গুলি করিয়া মারিয়া ফেলিবে, নয় ত খোঁপা ধরিয়া ছাদের উপর হইতে ফেলিয়া দিবে। তা যা করে, করুক, রমার তাতে তত ক্ষতি নাই, সীতারাম ত নির্ব্বিঘ্নে দিল্লীতে বসিয়া থাকিবেন। তা, সে এক রকম ভালই হইয়াছে। তবে কি না, রমা তাঁকে আর এখন দেখিতে পাইবে না, তা না পাইল, আর জন্মে দেখিবে। কই, মহম্মদপুরেও ত এখন আর বড় দেখা শুনা হইত না। তা দেখা না হউক, সীতারাম ভাল থাকিলেই হইল।

যদি এক বৎসর আগে হইত, তবে এতটুকু ভাবিয়াই রমা ক্ষান্ত হইত; কিন্তু বিধাতা তার কপালে শান্তি লিখেন নাই। এক বৎসর হইল, রমার একটি ছেলে হইয়াছে। সীতারাম যে আর তাহাকে দেখিতে পারিতেন না, ছেলের মুখ দেখিয়া রমা তাহা একরকম সহিতে পারিয়াছিল। রমা আগে সীতারামের ভাবনা ভাবিল—ভাবিয়া নিশ্চিন্ত হইল। তার পর আপনার ভাবনা ভাবিল—ভাবিয়া মরিতে প্রস্তুত হইল। তার পর ছেলের ভাবনা ভাবিল—ছেলের কি হইবে? "আমি যদি মরি, আমায় যদি মারিয়া ফেলে, তবে আমার ছেলেকে কে মানুষ করিবে? তা ছেলে না হয়, দিদিকে দিয়া যাইব। কিন্তু সতীনের হাতে ছেলে দিয়া যাওয়া যায় না; সৎমায় কি সতীনপোকে যত্ন করে? ভাল কথা, আমাকেই যদি মুসলমানে মারিয়া ফেলে, তা আমার সতীনকেই কি রাখিবে? সেও ত আর পীর নয়। তা, আমিও মরিব, আমার সতীনও মরিবে। তা ছেলে কাকে দিয়ে যাব?"

ভাবিতে ভাবিতে অকস্মাৎ রমার মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইল। একটা ভয়ানক কথা মনে পড়িল, মুসলমানে ছেলেই কি রাখিবে? সর্ব্বনাশ! রমা এতক্ষণ কি ভাবিতেছিল? মুসলমানেরা ডাকাত, চুয়াড়, গোরু খায়, শত্রু—তাহারা ছেলেই কি রাখিবে? সর্ব্বনাশের কথা! কেন সীতারাম দিল্লী গেলেন! রমা এ কথা কাকে জিজ্ঞাসা করে? কিন্তু মনের মধ্যে এ সন্দেহ লইয়াও ত শরীর বহা যায় না। রমা আর ভাবিতে চিন্তিতে পারিল না। অগত্যা নন্দার কাছে জিজ্ঞাসা করিতে গেল।

গিয়া বলিল, "দিদি, আমার বড় ভয় করিতেছে—রাজা এখন কেন দিল্লী গেলেন ?"

নন্দা বলিল, "রাজার কাজ রাজাই বুঝেন—আমরা কি বুঝিব বহিন।'

রমা। তা এখন যদি মুসলমান আসে, তা কে পুরী রক্ষা করিবে ?

নন্দা। বিধাতা করিবেন। তিনি না রাখিলে কে রাখিবে ?

রমা। তা মুসলমান কি সকলকেই মারিয়া ফেলে ?

নন্দা। যে শত্রু, সে কি আর দয়া করে ?

রমা। তা, না হয়, আমাদেরই মারিয়া ফেলিবে—ছেলেপিলের উপর দয়া করিবে না কি ?

নন্দা। ও সকল কথা কেন মুখে আন, দিদি ? বিধাতা যা কপালে লিখেছেন, তা অবশ্য ঘটিবে। কপালে মঙ্গল লিখিয়া থাকেন, মঙ্গলই হইবে। আমরা ত তাঁর পায়ে কোন অপরাধ করি নাই—আমাদের কেন মন্দ হইবে ? কেন তুমি ভাবিয়া সারা হও। আয়, পাশা খেলিবি ? তোর নথের নূতন নোলক জিতিয়া নিই আয়।

এই বলিয়া নন্দা, রমাকে অন্যমনা করিবার জন্য পাশা পাড়িল। রমা অগত্যা এক বাজি খেলিল, কিন্তু খেলায় তার মন গেল না। নন্দা ইচ্ছাপূর্ব্বক বাজি হারিল—রমার নাকের নোলক বাঁচিয়া গেল। কিন্তু রমা আর খেলিল না—এক বাজি উঠিলেই রমাও উঠিয়া গেল।

রমা, নন্দার কাছে আপন জিজ্ঞাস্য কথার উত্তর পায় নাই—তাই সে খেলিতে পারে নাই। কতক্ষণে সে আর এক জনকে সে কথা জিজ্ঞাসা করিবে, সেই ভাবনাই ভাবিতেছিল। রমা আপনার মহলে ফিরিয়া আসিয়াই আপনার এক জন বর্ষীয়সী ধাত্রীকে জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁ গা—মুসলমানেরা কি ছেলে মারে ?"

বর্ষীয়সী বলিল, "তারা কাকে না মারে ? তারা গোরু খায়, নেমাজ করে, তারা ছেলে মারে না ত কি ?"

রমার বুকের ভিতর টিপ্ টিপ্ করিতে লাগিল। রমা তখন যাহাকে পাইল, তাহাকেই সেই কথা জিজ্ঞাসা করিল, পুরবাসিনী আবালবৃদ্ধা সকলকেই জিজ্ঞাসা করিল। সকলেই মুসলমানভয়ে ভীত, কেহই মুসলমানকে ভাল চক্ষুতে দেখে না—সকলেই প্রায় বর্ষীয়সীর মত উত্তর দিল। তখন রমা সর্ব্বনাশ উপস্থিত মনে করিয়া, বিছানায় আসিয়া শুইয়া পড়িয়া, ছেলে কোলে লইয়া কাঁদিতে লাগিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

এ দিকে তোরাব্ খাঁ সংবাদ পাইলেন যে, সীতারাম মহম্মদপুরে নাই, দিল্লী যাত্রা করিয়াছেন। তিনি ভাবিলেন, এই শুভ সময়, এই সময় মহম্মদপুর পোড়াইয়া ছারখার করাই ভাল। তখন তিনি সসৈন্যে মহম্মদপুর যাত্রা করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন।

সে সংবাদও মহম্মদপুরে পৌঁছিল। নগরে একটা ভারি হুলস্থূল পড়িয়া গেল। গৃহস্থেরা যে যেখানে পাইল, পলাইতে লাগিল। কেহ মাসীর বাড়ী, কেহ পিসীর বাড়ী, কেহ খুড়ার বাড়ী, কেহ মামার বাড়ী, কেহ শ্বশুরবাড়ী, কেহ জামাইবাড়ী, কেহ বেহাইবাড়ী, বোনাইবাড়ী, সপরিবার, ঘটি বাটি, সিন্দুক, পেটারা, তক্তপোষ সমেত গিয়া দাখিল হইল। দোকানদার দোকান লইয়া পলাইতে লাগিল, মহাজন গোলা বেচিয়া পলাইতে লাগিল, আড়তদার আড়ত বেচিয়া পলাইল, শিল্পকর যন্ত্র তন্ত্র মাথায় করিয়া পলাইল। বড় হুলস্থূল পড়িয়া গেল।

নগররক্ষক গঙ্গারাম দাস, চন্দ্রচূড়ের নিকট মন্ত্রণার জন্য আসিলেন। বলিলেন, "এখন ঠাকুর কি করিতে বলেন? সহর ত ভাঙ্গিয়া যায়।"

চন্দ্রচূড় বলিলেন, "স্ত্রীলোক বালক বৃদ্ধ যে পলায় পলাক, নিষেধ করিও না। বরং তাহাতে প্রয়োজন আছে। ঈশ্বর না করুন, কিন্তু তোরাব্ খাঁ আসিয়া যদি গড় ঘেরাও করে, তবে গড়ে যত খাইবার লোক কম থাকে, ততই ভাল, তা হলে দুই মাস ছয় মাস চালাইতে পারিব। কিন্তু যাহারা যুদ্ধ শিখিয়াছে, তাহাদের এক জনকেও যাইতে দিবে না, যে যাইবে, তাহাকে গুলি করিবার হুকুম দিবে। অস্ত্র শস্ত্র একখানিও সহরের বাহিরে লইয়া যাইতে দিবে না। আর খাবার সামগ্রী এক মুঠাও বাহিরে লইয়া যাইতে দিবে না।"

সেনাপতি মৃণ্ময় রায় আসিয়া চন্দ্রচূড় ঠাকুরকে মন্ত্রণা জিজ্ঞাসা করিলেন। বলিলেন, "এখানে পড়িয়া মার খাইব কেন? যদি তোরাব্ খাঁ আসিতেছে, তবে সৈন্য লইয়া অর্দ্ধেক পথে গিয়া তাহাকে মারিয়া আসি না কেন?"

চন্দ্রচূড় বলিলেন, "এই প্রবলা নদীর সাহায্য কেন ছাড়িবে? যদি অর্দ্ধপথে তুমি হার, তবে আর আমাদের দাঁড়াইবার উপায় থাকিবে না; কিন্তু তুমি যদি এই নদীর এ পারে, কামান সাজাইয়া দাঁড়াও, কার সাধ্য এ নদী পার হয়? এ হাঁটিয়া পার হইবার নদী নয়। সংবাদ রাখ, কোথায় নদী পার হইবে। সেইখানে সৈন্য লইয়া যাও, তাহা হইলে মুসলমান এ পারে আসিতে পারিবে না। সব প্রস্তুত রাখ, কিন্তু আমায় না বলিয়া যাত্রা করিও না।"

চন্দ্রচূড় গুপ্তচরের প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। গুপ্তচর ফিরিলেই তিনি সংবাদ পাইবেন, কখন্ কোন্ পথে তোরাব্ খাঁর সৈন্য যাত্রা করিবে; তখন ব্যবস্থা করিবেন।

এ দিকে অন্তঃপুরে সংবাদ পৌঁছিল যে, তোরাব্ খাঁ সসৈন্যে মহম্মদপুর লুঠিতে আসিতেছে। বহির্ব্বাটীর অপেক্ষা অন্তঃপুরে সংবাদটা কিছু বাড়িয়া যাওয়াই রীতি। বাহিরে, "আসিতেছে" অর্থে বুঝিল, আসিবার উদ্যোগ করিতেছে। ভিতর মহলে, "আসিতেছে" অর্থে বুঝিল, "প্রায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে।" তখন সে অন্তঃপুর মধ্যে কাঁদাকাটার ভারি ধুম পড়িয়া গেল। নন্দার বড় কাজ বাড়িয়া গেল—কয়জনকে একা বুঝাইবে, কয়জনকে থামাইবে! বিশেষ রমাকে লইয়াই নন্দাকে বড় ব্যস্ত হইতে হইল—কেন না, রমা ক্ষণে ক্ষণে মূর্চ্ছা যাইতে লাগিল। নন্দা মনে মনে ভাবিতে লাগিল, "সতীন মরিয়া গেলেই বাঁচি—কিন্তু প্রভু যখন আমাকে অন্তঃপুরের ভার দিয়া গিয়াছেন, তখন আমাকে আপনার প্রাণ দিয়াও সতীনকে বাঁচাইতে হইবে।" তাই নন্দা সকল কাজ ফেলিয়া রমার সেবা করিতে লাগিল।

এ দিকে পৌরস্ত্রীগণ নন্দাকে পরামর্শ দিতে লাগিল—"মা! তুমি এক কাজ কর—সকলের প্রাণ বাঁচাও। এই পুরী মুসলমানকে বিনা যুদ্ধে সমর্পণ কর—সকলের প্রাণ ভিক্ষা মাঙ্গিয়া লও। আমরা বাঙ্গালী মানুষ, আমাদের লড়াই ঝগড়া কাজ কি মা! প্রাণ বাঁচিলে আবার সব হবে। সকলের প্রাণ তোমার হাতে—মা, তোমার মঙ্গল হোক—আমাদের কথা শোন।"

নন্দা তাহাদিগকে বুঝাইলেন। বলিলেন, "ভয় কি মা! পুরুষ মানুষের চেয়ে তোমরা কি বেশী বুঝ? তাঁরা যখন বলিতেছেন ভয় নাই, তখন ভয় কেন? তাঁদের কি আপনার প্রাণে দরদ নাই—না আমাদের প্রাণে দরদ নাই?"

এই সকল কথার পর রমা বড় মূর্চ্ছা গেল না। উঠিয়া বসিল। কি কথা ভাবিয়া মনে সাহস পাইয়াছিল, তাহা পরে বলিতেছি।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

গঙ্গারাম নগররক্ষক। এ সময়ে রাত্রিতে নগর পরিভ্রমণে তিনি বিশেষ মনোযোগী। যে দিনের কথা বলিলাম, সেই রাত্রিতে, তিনি নগরের অবস্থা জানিবার জন্য, পদব্রজে, সামান্য বেশে, গোপনে, একা নগর পরিভ্রমণ করিতেছিলেন। রাত্রি তৃতীয় প্রহরে, ক্লান্ত হইয়া, তিনি গৃহে প্রত্যাগমন করিবার বাসনায়, গৃহাভিমুখী হইতেছিলেন, এমন সময় কে আসিয়া পশ্চাৎ হইতে তাঁহার কাপড় ধরিয়া টানিল।

গঙ্গারাম পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলেন, এক জন স্ত্রীলোক। রাত্রি অন্ধকার, রাজপথে আর কেহ নাই—কেবল একাকিনী সেই স্ত্রীলোক। অন্ধকারে স্ত্রীলোকের আকার, স্ত্রীলোকের বেশ, ইহা জানা গেল—কিন্তু আর কিছুই বুঝা গেল না। গঙ্গারাম জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে ?"

স্ত্রীলোক বলিল, "আমি যে হই, তাতে আপনার কিছু প্রয়োজন নাই। আমাকে বরং জিজ্ঞাসা করুন যে, আমি কি চাই।"

কথার স্বরে বোধ হইল যে, এই স্ত্রীলোকের বয়স বড় বেশী নয়। তবে কথাগুলা জোর জোর বটে। গঙ্গারাম বলিল, "সে কথা পরে হইবে। আগে বল দেখি, তুমি স্ত্রীলোক, এত রাত্রে একাকিনী রাজপথে কেন বেড়াইতেছ ? আজকাল কিরূপ সময় পড়িয়াছে, তাহা কি জান না ?"

স্ত্রীলোক বলিল, "এত রাত্রে একাকিনী আমি এই রাজপথে, আর কিছু করিতেছি না—কেবল আপনারই সন্ধান করিতেছি।"

গঙ্গারাম। মিছা কথা। প্রথমতঃ তুমি চেনই না যে, আমি কে ?

স্ত্রীলোক। আমি চিনি যে, আপনি দাস মহাশয়, নগররক্ষক।

গঙ্গারাম। ভাল, চেন দেখিতেছি। কিন্তু আমাকে এখানে পাইবার সম্ভাবনা, ইহা তুমি জানিবার সম্ভাবনা নাই; কেন না, আমিই জানিতাম না যে, আমি এখন এ পথে আসিব।

স্ত্রীলোক। আমি অনেকক্ষণ ধরিয়া আপনাকে গলিতে গলিতে খুঁজিয়া বেড়াইতেছি। আপনার বাড়ীতেও সন্ধান লইয়াছি।

গঙ্গারাম। কেন ?

স্ত্রীলোক। সেই কথাই আপনার আগে জিজ্ঞাসা করা উচিত ছিল। আপনি একটা দুঃসাহসিক কাজ করিতে পারিবেন ?

গঙ্গা। কি ?

স্ত্রীলোক। আমি আপনাকে যেখানে লইয়া যাইব, সেইখানে এখনই যাইতে পারিবেন ?

গঙ্গা। কোথায় যাইতে হইবে ?

স্ত্রীলোক। তাহা আমি আপনাকে বলিব না। আপনি তাহা জিজ্ঞাসা করিতে পারিবেন না। সাহস হয় কি ?

গঙ্গা। আচ্ছা, তা না বল, আর দুই একটা কথা বল। তোমার নাম কি ? তুমি কে ? কি কর ? আমাকেই বা কি করিতে হইবে ?

স্ত্রীলোক। আমার নাম মুরলা, ইহা ছাড়া আর কিছুই বলিব না। আপনি আসিতে সাহস না করেন, আসিবেন না। কিন্তু যদি এই সাহস না থাকে, তবে মুসলমানের হাত হইতে নগর রক্ষা করিবেন কি প্রকারে? আমি স্ত্রীলোক যেখানে যাইতে পারি, আপনি নগররক্ষক হইয়া সেখানে এত কথা নহিলে যাইতে পারিবেন না?

কাজেই গঙ্গারামকে মুরলার সঙ্গে যাইতে হইল। মুরলা আগে আগে চলিল, গঙ্গারাম পাছু পাছু। কিছু দূর গিয়া গঙ্গারাম দেখিলেন, সম্মুখে উচ্চ অট্টালিকা। চিনিয়া বলিলেন, "এ যে রাজবাড়ী যাইতেছ?"

মুরলা। তাতে দোষ কি?

গঙ্গারাম। সিং-দরজা দিয়া গেলে দোষ ছিল না। এ যে খিড়কী। অন্তঃপুরে যাইতে হইবে না কি?

মুরলা। সাহস হয় না?

গঙ্গা। না—আমার সে সাহস হয় না, এ আমার প্রভুর অন্তঃপুর। বিনা হুকুমে যাইতে পারি না।

মুরলা। কার হুকুম চাই?

গঙ্গা। রাজার হুকুম।

মুরলা। তিনি ত দেশে নাই। রাণীর হুকুম হইলে চলিবে?

গঙ্গা। চলিবে।

মুরলা। আসুন, আমি রাণীর হুকুম আপনাকে শুনাইব।

গঙ্গা। কিন্তু পাহারাওয়ালা তোমাকে যাইতে দিবে?

মুরলা। দিবে।

গঙ্গা। কিন্তু আমাকে না চিনিলে ছাড়িয়া দিবে না। এ অবস্থায় পরিচয় দিবার আমার ইচ্ছা নাই।

মুরলা। পরিচয় দিবারও প্রয়োজন নাই। আমি আপনাকে লইয়া যাইতেছি।

দ্বারে প্রহরী দণ্ডায়মান। মুরলা তাহার নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন পাঁড়ে ঠাকুর, দ্বার খোলা রাখিয়াছ ত?"

পাঁড়ে ঠাকুর বলিলেন, "হাঁ, রাখিয়েসে। এ কোন্?"

প্রহরী গঙ্গারামের প্রতি দৃষ্টি করিয়া এই কথা বলিল। মুরলা বলিল, "এ আমার ভাই।"

পাঁড়ে। মরদ্ যাতে পারবে না। হুকুম নেহি।

মুরলা তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া বলিল, "ইঃ, কার হুকুম রে? তোর আবার কার হুকুম চাই? আমার হুকুম ছাড়া তুই কার হুকুম খুঁজিস্? খ্যাংরা মেরে দাড়ি মুড়িয়ে দেব জানিস্ না?"

প্রহরী জড়সড় হইল, আর কিছু বলিল না। মুরলা গঙ্গারামকে লইয়া নির্ব্বিঘ্নে অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করিল। এবং অন্তঃপুরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দোতালায় উঠিল। সে একটি কুঠারি দেখাইয়া দিয়া বলিল, "ইহার ভিতর প্রবেশ করুন। আমি নিকটেই রহিলাম, কিন্তু ভিতরে যাইব না।"

গঙ্গারাম কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া কুঠারির ভিতর প্রবেশ করিলেন। মহামূল্য দ্রব্যাদিতে সুসজ্জিত গৃহ, রজতপালঙ্কে বসিয়া একটি স্ত্রীলোক—উজ্জ্বল দীপাবলির স্নিগ্ধ রশ্মি তাহার মুখের উপর পড়িয়াছে, সে অধোবদনে চিন্তা করিতেছে। আর কেহ নাই। গঙ্গারাম মনে করিলেন, এমন সুন্দরী পৃথিবীতে আর জন্মে নাই। সে রমা।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

গঙ্গারাম কখনও সীতারামের অন্তঃপুরে আসে নাই, নন্দা কি রমাকে কখনও দেখে নাই। কিন্তু মহামূল্য গৃহসজ্জা দেখিয়া বুঝিল যে, ইনি এক জন রাণী হইবেন; রাণীদিগের মধ্যে নন্দার অপেক্ষা রমারই সৌন্দর্য্যের খ্যাতিটা বেশী ছিল—এ জন্য গঙ্গারাম সিদ্ধান্ত করিল যে, ইনি কনিষ্ঠা মহিষী রমা। অতএব জিজ্ঞাসা করিল, "মহারাণী কি আমাকে তলব করিয়াছেন?"

রমা উঠিয়া গঙ্গারামকে প্রণাম করিল। বলিল, "আপনি আমার দাদা হন—জ্যেষ্ঠ ভাই, আপনার পক্ষে শ্রীও যেমন, আমিও তাই। অতএব আপনাকে যে এমন সময়ে ডাকাইয়াছি, তাহাতে দোষ ধরিবেন না।"

গঙ্গা। আমাকে যখন আজ্ঞা করিবেন, তখনই আসিতে পারি—আপনিই কর্ত্রী—

রমা। মুরলা বলিল যে, প্রকাশ্যে আপনি আসিতে সাহস করিবেন না। সে আরও বলে—পোড়ারমুখী কত কি বলে, তা আমি কি বল্ব? তা, দাদা মহাশয়! আমি বড় ভীত হইয়াই এমন সাহসের কাজ করিয়াছি। তুমি আমায় রক্ষা কর।

বলিতে বলিতে রমা কাঁদিয়া ফেলিল। সে কান্না দেখিয়া গঙ্গারাম কাতর হইল। বলিল, "কি হইয়াছে? কি করিতে হইবে?"

রমা। কি হইয়াছে? কেন, তুমি কি জান না যে, মুসলমান মহম্মদপুর লুঠিতে আসিতেছে—আমাদের সব খুন করিয়া সহর পোড়াইয়া দিয়া চলিয়া যাইবে?

গঙ্গা। কে তোমাকে ভয় দেখাইয়াছে? মুসলমান আসিয়া সহর পোড়াইয়া দিয়া যাইবে, তবে আমরা কি জন্য? আমরা তবে তোমার অন্ন খাই কেন?

রমা। তোমরা পুরুষ মানুষ, তোমাদের সাহস বড়—তোমরা অত বোঝ না। যদি তোমরা না রাখিতে পার, তখন কি হবে?

রমা আবার কাঁদিতে আরম্ভ করিল।

গঙ্গা। সাধ্যানুসারে আপনাদের রক্ষা করিব, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

রমা। তা ত কর্‌বে—কিন্তু যদি না পারিলে ?

গঙ্গা। না পারি, মরিব।

রমা। তা করিও না। আমার কথা শোন। আজ সকলে বড় রাণীকে বলিতেছিল, মুসলমানকে আদর করিয়া ডাকিয়া, সহর তাদের সুঁপিয়া দাও—আপনাদের সকলের প্রাণভিক্ষা মাঙিয়া লও। বড় রাণী সে কথায় বড় কাণ দিলেন না—তাঁর বুদ্ধি শুদ্ধি বড় ভাল নয়। আমি তাই তোমায় ডাকিয়াছি। তা কি হয় না ?

গঙ্গা। আমাকে কি করিতে বলেন ?

রমা। এই আমার গহনা পাতি আছে, সব নাও। আর আমার টাকা কড়ি যা আছে, সব না হয় দিতেছি, সব নাও। তুমি কাহাকে কিছু না বলিয়া মুসলমানের কাছে যাও। বল গিয়া যে, আমরা রাজ্য ছাড়িয়া দিতেছি, নগর তোমাদের ছাড়িয়া দিতেছি, তোমরা কাহাকে প্রাণে মারিবে না, কেবল এইটি স্বীকার কর। যদি তাহারা রাজি হয়, তবে নগর তোমার হাতে—তুমি তাদের গোপনে এনে কেল্লায় তাদের দখল দিও। সকলে বাঁচিয়া যাইবে।

গঙ্গারাম শিহরিয়া উঠিল—বলিল, "মহারাণী! আমার সাক্ষাতে যা বল্লেন বল্লেন—আর কখনও কাহারও সাক্ষাতে এমন কথা মুখে আনিবেন না। আমি প্রাণে মরিলেও এ কাজ আমা হইতে হইবে না। যদি এমন কাজ আর কেহ করে, আমি স্বহস্তে তাহার মাথা কাটিয়া ফেলিব।"

রমার শেষ আশা ভরসা ফরসা হইল। রমা উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল। বলিল, "তবে আমার বাছার দশা কি হইবে ?" গঙ্গারাম ভীত হইয়া বলিল, "চুপ করুন! যদি আপনার কান্না শুনিয়া কেহ এখানে আসে, তবে আমাদের দুই জনেরই পক্ষে অমঙ্গল। আপনার ছেলের জন্যই আপনি এত ভীত হইয়াছেন, আমি সে বিষয়ে কোন উপায় করিব। আপনি স্থানান্তরে যাইতে রাজি আছেন ?"

রমা। যদি আমায় বাপের বাড়ী রাখিয়া আসিতে পার, তবে যাইতে পারি। তা বড় রাণীই বা যাইতে দিবেন কেন ? ঠাকুর মহাশয় বা যাইতে দিবেন কেন ?

গঙ্গা। তবে লুকাইয়া লইয়া যাইতে হইবে। এক্ষণে তাহার কোন প্রয়োজন নাই। যদি তেমন বিপদ্ দেখি, আমি আসিয়া আপনাদিগকে লইয়া গিয়া রাখিয়া আসিব।

রমা। আমি কি প্রকারে সংবাদ পাইব ?

গঙ্গা। মুরলার দ্বারা সংবাদ লইবেন। কিন্তু মুরলা যেন অতি গোপনে আমার নিকট যায়।

রমা নিশ্বাস ছাড়িয়া, কাঁপিয়া বলিল, "তুমি আমার প্রাণ দান করিলে, আমি চিরকাল তোমার দাসী হইয়া থাকিব। দেবতারা তোমার মঙ্গল করুন।"

এই বলিয়া রমা, গঙ্গারামকে বিদায় দিল। মুরলা গঙ্গারামকে বাহিরে রাখিয়া আসিল।

কাহারও মনে কিছু মলা নাই। তথাপি একটা গুরুতর দোষের কাজ হইয়া গেল। রমা ও গঙ্গারাম উভয়ে তাহা মনে বুঝিল। গঙ্গারাম ভাবিল, "আমার দোষ কি?" রমা বলিল, "এ না করিয়া কি করি—প্রাণ যায় যে।" কেবল মুরলা সন্তুষ্ট।

গঙ্গারামের যদি তেমন চক্ষু থাকিত, তবে গঙ্গারাম ইহার ভিতর আর এক জন লুকাইয়া আছে দেখিতে পাইতেন। সে মনুষ্য নহে—দেখিতেন—

* দক্ষিণাপাঙ্গনিবিষ্টমুষ্টিং নতাংসমাকুঞ্চিতসব্যপাদম্।

* * * চক্রীকৃতচারুচাপং প্রহর্ত্তুমভ্যুদ্যতমাত্মযোনিম্॥

এ দিকে বাদীর মনেও যা, বিধির মনেও তা। চন্দ্রচূড় ঠাকুর তোরাব্ খাঁর কাছে, এই বলিয়া গুপ্তচর পাঠাইলেন যে, "আমরা এ রাজ্য মায় কেল্লা সেলেখানা আপনাদিগকে বিক্রয় করিব—কত টাকা দিবেন? যুদ্ধে কাজ কি—টাকা দিয়া নিন না?"

চন্দ্রচূড় মৃণ্ময়কে ও গঙ্গারামকে এ কথা জানাইলেন। মৃণ্ময় ক্রুদ্ধ হইয়া চোখ ঘুরাইয়া বলিল, "কি! এত বড় কথা?"

চন্দ্রচূড় বলিলেন, "দূর মূর্খ! কিছু বুদ্ধি নাই কি? দরদস্তুর করিতে করিতে এখন দুই মাস কাটাইতে পারিব। তত দিনে রাজা আসিয়া পড়িবেন।"

গঙ্গারামের মনে কি হইল, বলিতে পারি না। সে কিছুই বলিল না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

তা, সে দিন গঙ্গারামের কোন কাজ করা হইল না। রমার মুখখানি বড় সুন্দর। কি সুন্দর আলোই তার উপর পড়িয়াছিল। সেই কথা ভাবিতেই গঙ্গারামের দিন গেল। বাতির আলো বলিয়াই কি অমন দেখাইল? তা হ'লে মানুষ রাত্রিদিন বাতির আলো জ্বালিয়া বসিয়া থাকে না কেন? কি মিস্‌মিসে কোঁকড়া কোঁকড়া চুলের গোছা! কি ফলান রঙ্! কি ভুরু! কি চোখ! কি ঠোঁট—যেমন রাঙা, তেমনই পাতলা! কি গড়ন! তা কোন্‌টাই বা গঙ্গারাম ভাবিবে? সবই যেন দেবীদুর্ল্লভ! গঙ্গারাম ভাবিল, "মানুষ যে এমন সুন্দর হয়, তা জান্‌তেম না! একবার যে দেখিলাম, আমার যেন জন্ম সার্থক হইল। আমি তাই ভাবিয়া যে কয় বৎসর বাঁচিব, সুখে কাটাইতে পারিব।"

তা কি পারা যায় রে মূর্খ। একবার দেখিয়া, অমন হইলে, আর একবার দেখিতে ইচ্ছা করে। তুপুর বেলা গঙ্গারাম ভাবিতেছিল, "একবার যে দেখিয়াছি, আমি তাই ভাবিয়া যে কয় বৎসর বাঁচি, সেই কয় বৎসর সুখে কাটাইতে পারিব।"—কিন্তু সন্ধ্যা বেলা ভাবিল, "আর একবার কি দেখিতে পাই না?" রাত্রি তুই চারি দণ্ডের সময়ে গঙ্গারাম ভাবিল, "আজ আবার মুরলা আসে না।" রাত্রি প্রহরেকের সময়ে মুরলা তাঁহাকে নিভৃত স্থানে গিরেফ্‌তার করিল।

গঙ্গারাম জিজ্ঞাসা করিল, "কি খবর?"

মুরলা। তোমার খবর কি?

গঙ্গা। কিসের খবর চাও?

মুরলা। বাপের বাড়ী যাওয়ার।

গঙ্গা। আবশ্যক হইবে না বোধ হয়। রাজ্য রক্ষা হইবে।

মুরলা। কিসে জানিলে?

গঙ্গা। তা কি তোমায় বলা যায়?

মুরলা। তবে আমি এই কথা বলি গে?

গঙ্গা। বল গে।

মুরলা। যদি আমাকে আবার পাঠান?

গঙ্গা। কাল যেখানে আমাকে ধরিয়াছিলে, সেইখানে আমাকে পাইবে।

মুরলা চলিয়া গিয়া, রাজ্ঞীসমীপে সংবাদ নিবেদন করিল। গঙ্গারাম কিছুই খুলিয়া বলেন নাই, সুতরাং রমাও কিছু বুঝিতে পারিল না। না বুঝিতে পারিয়া আবার ব্যস্ত হইল, আবার মুরলা গঙ্গারামকে ধরিয়া লইয়া তৃতীয় প্রহর রাত্রে রমার ঘরে আনিয়া উপস্থিত করিল। সেই পাহারাওয়ালা সেইখানে ছিল, আবার গঙ্গারাম মুরলার ভাই বলিয়া পার হইলেন।

গঙ্গারাম রমার কাছে আসিয়া মাথা মুণ্ড কি বলিল, তাহা গঙ্গারাম নিজেই কিছু বুঝিতে পারিল না, রমা ত নয়ই। আসল কথা, গঙ্গারামের মাথা মুণ্ড তখন কিছুই ছিল না, সেই ধনুর্দ্ধর ঠাকুর ফুলের বাণ মারিয়া তাহা উড়াইয়া লইয়া গিয়াছিলেন। কেবল তাহার চক্ষু তুইটি ছিল, প্রাণপাত করিয়া গঙ্গারাম দেখিয়া লইল, কাণ ভরিয়া কথা শুনিয়া লইল, কিন্তু তৃপ্তি হইল না।

গঙ্গারামের এতটুকু মাত্র চৈতন্য ছিল যে, চন্দ্রচূড় ঠাকুরের কল কৌশল রমার সাক্ষাতে কিছুই সে প্রকাশ করিল না। বস্তুতঃ কোন কথা প্রকাশ করিতে সে আসে নাই, কেবল দেখিতে আসিয়াছিল। তাই দেখিয়া, দক্ষিণাস্বরূপ আপনার চিত্ত রমাকে দিয়া

চলিয়া গেল। আবার মুরলা তাহাকে বাহির করিয়া দিয়া আসিল। গমনকালে মুরলা গঙ্গারামকে বলিল, "আবার আসিবে ?"

গঙ্গা। কেন আসিব ?

মুরলা বলিল, "আসিবে বোধ হইতেছে।"

গঙ্গারাম চোখ বুজিয়া পিছল পথে পা দিয়াছে—কিছু বলিল না।

এ দিকে চন্দ্রচূড়ের কথায় তোরাব্ খাঁ উত্তর পাঠাইলেন, "যদি অল্প স্বল্প টাকা দিলে মুলুক ছাড়িয়া দাও, তবে টাকা দিতে রাজি আছি। কিন্তু সীতারামকে ধরিয়া দিতে হইবে।"

চন্দ্রচূড় উত্তর পাঠাইলেন, "সীতারামকে ধরাইয়া দিব, কিন্তু অল্প টাকায় হইবে না।"

তোরাব্ খাঁ বলিয়া পাঠাইলেন, "কত টাকা চাও ?" চন্দ্রচূড় একটা চড়া দর হাঁকিলেন; তোরাব্ খাঁ একটা নরম দর দিয়া পাঠাইলেন। তার পর চন্দ্রচূড় কিছু নামিলেন, তোরাব্ খাঁ তদুত্তরে কিছু উঠিলেন। চন্দ্রচূড় এইরূপে মুসলমানকে ভুলাইয়া রাখিতে লাগিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

কালামুখী মুরলা যা বলিল, তাই হইল। গঙ্গারাম আবার রমার কাছে গেল। তার কারণ, গঙ্গারাম না গিয়া আর থাকিতে পারিবে না। রমা আর ডাকে নাই, কেবল মধ্যে মধ্যে মুরলাকে গঙ্গারামের কাছে সংবাদ লইতে পাঠাইত; কিন্তু গঙ্গারাম মুরলার কাছে কোন কথাই বলিত না, বলিত, "তোমাদের বিশ্বাস করিয়া এ সকল গোপন কথা কি বলা যায় ? আমি একদিন নিজে গিয়া বলিয়া আসিব।" কাজেই রমা আবার গঙ্গারামকে ডাকিয়া পাঠাইল—মুসলমান কবে আসিবে, সে বিষয়ে খবর না জানিলে রমার প্রাণ বাঁচে না—যদি হঠাৎ একদিন দুপুর বেলা খাওয়া দাওয়ার সময় আসিয়া পড়ে ?

কাজেই গঙ্গারাম আবার আসিল। এবার গঙ্গারাম সাহস দিল না—বরং একটু ভয় দেখাইয়া গেল। যাহাতে আবার ডাক পড়ে, তার পথ করিয়া গেল। রমাকে আপনার প্রাণের কথা বলে, গঙ্গারামের সে সাহস হয় না—সরলা রমা তার মনের সে কথা অণুমাত্র বুঝিতে পারে না। তা, প্রেমসম্ভাষণের ভরসায় গঙ্গারামের যাতায়াতের চেষ্টা নয়। গঙ্গারাম জানিত, সে পথ বন্ধ। তবু শুধু দেখিয়া, কেবল কথাবার্ত্তা কহিয়াই এত আনন্দ।

একে ভালবাসা বলে না—তাহা হইলে গঙ্গারাম কখন রমাকে ভয় দেখাইয়া, যাহাতে তাহার যন্ত্রণা বাড়ে, তাহা করিয়া যাইতে পারিত না। এ একটা সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট চিত্তবৃত্তি—

যাহার হৃদয়ে প্রবেশ করে, তার সর্ব্বনাশ করিয়া ছাড়ে। এই গ্রন্থে তাহার প্রমাণ আছে।

ভয় দেখাইয়া, গঙ্গারাম চলিয়া গেল। রমা তখন বাপের বাড়ী যাইতে চাহিল, কিন্তু গঙ্গারাম, আজ কালি নহে বলিয়া চলিয়া গেল। কাজেই আজ কাল বাদে রমা আবার গঙ্গারামকে ডাকাইল। আবার গঙ্গারাম আসিল। এই রকম চলিল।

একেবারে "ধরি মাছ, না ছুঁই পানি" চলে না। রমার সঙ্গে লোকালয়ে যদি গঙ্গারামের পঞ্চাশ বার সাক্ষাৎ হইত, তাহা হইলে কিছুই দোষ হইত না; কেন না, রমার মন বড় পরিষ্কার, পবিত্র। কিন্তু এমন ভয়ে ভয়ে, অতি গোপনে, রাত্রি তৃতীয় প্রহরে সাক্ষাৎটা ভাল নহে। আর কিছু হউক না হউক, একটু বেশী আদর, একটু বেশী খোলা কথা, কথাবার্ত্তায় একটু বেশী অসাবধানতা, একটু বেশী মনের মিল হইয়া পড়ে। তাহা হইল না যে এমন নহে। রমা তাহা আগে বুঝিতে পারে নাই। কিন্তু মুরলার একটা কথা দৈববাণীব মত তাহার কাণে লাগিল। এক দিন মুরলার সঙ্গে পাঁড়ে ঠাকুরের সে বিষয়ে কিছু কথা হইল। পাঁড়ে ঠাকুর বলিলেন, "তোমারা ভাই হামেশা রাত্‌কো ভিতর্‌মে যায়া আয়া করতাহৈ কাহেকো?"

মু। তোর কিরে বিট্‌লে? খ্যাংরার ভয় নেই?

পাঁড়ে। ভয় ত হৈ, লেকেন্ জান্‌কাভী ডর হৈ।

মু। তোর আবার আরও জান্ আছে না কি? আমিই ত তোর জান্।

পাঁড়ে। তোম্ ছাড়্‌নেসে মরেঙ্গে নেহি, লেকেন্ জান্ ছোড়্‌নেসে সব আঁধিয়ারা লাগেগী। তোমারা ভাইকো হম্ ঔর্ ছোড়েঙ্গে নেহি।

মু। তা না ছোড়িস্ আমি তোকে ছোড়ঙ্গে। কেমন কি বলিস্?

পাঁড়ে। দেখো, বহ আদমি তোমারা ভাই নেহি, কোই বড়ে আদমি হোগা, বস্কা হিঁয়া কিয়া কাম্ হাম্‌কো কুছু মালুম নেহি, মালুম হোনেভি কুছ্ জরুর নেহি। কিয়া জানে, বহ অন্দরকা খবরদারিকে লিয়ে আতা যাতা হৈ। তৌ ভী, যব্ পুখিদা হোকে আতে যাতে তব্ হম্ লোগকো কুছ্ মিল্‌না চাহিয়ে। তোম্‌কো কুছ মিলা হোগা—আধা হাম্‌কো দে দেও, হম্ নেহি কুছ বোলেঙ্গে।

মু। সে আমায় কিছু দেয় নাই। পাইলে দিব।

পাঁড়ে। আদা কর্‌কে লে লেও।

মুরলা ভাবিল, এ সৎপরামর্শ। রাণীর কাছে গহনাখানা কাপড়খানা মুরলার পাওয়া হইয়াছে, কিন্তু গঙ্গারামের কাছে কিছু হয় নাই। অতএব বুদ্ধি খাটাইয়া পাঁড়েজীকে বলিল, "আচ্ছা, এবার যে দিন আসিবে, তুমি ছাড়িও না। আমি বলিলেও ছাড়িও না। তা হলে কিছু আদায় হইবে।"

তার পর যে রাত্রিতে গঙ্গারাম পুরপ্রবেশার্থ আসিল, পাঁড়েজী ছাড়িলেন না। মুরলা অনেক বকিল ঝকিল, শেষ অনুনয় বিনয় করিল, কিছুতেই না। গঙ্গারাম পরামর্শ করিলেন, পাঁড়ের কাছে প্রকাশ হইবেন, নগররক্ষক জানিতে পারিলে, পাঁড়ে আর আপত্তি করিবে না। মুরলা বলিল, "আপত্তি করিবে না, কিন্তু লোকের কাছে গল্প করিবে। এ আমার ভাই যায় আসে, গল্প করিলে যা দোষ, আমার ঘাড়ের উপর দিয়া যাইবে।" কথা যথার্থ বলিয়া গঙ্গারাম স্বীকার করিলেন। তার পর গঙ্গারাম মনে করিলেন, "এটাকে এইখানে মারিয়া ফেলিয়া দিয়া যাই।" কিন্তু তাতে আরও গোল। হয় ত একেবারে এ পথ বন্ধ হইয়া যাইবে। সুতরাং নিরস্ত হইলেন। পাঁড়ে কিছুতেই ছাড়িল না, সুতরাং সে রাত্রিতে ঘরে ফিরিয়া যাইতে হইল।

মুরলা একা ফিরিয়া আসিলে রাণী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তিনি কি আজ আসিবেন না?"

মু। তিনি আসিয়াছিলেন—পাহারাওয়ালা ছাড়িল না।

রাণী। রোজ ছাড়ে, আজ ছাড়িল না কেন?

মু। তার মনে একটা সন্দেহ হইয়াছে।

রাণী। কি সন্দেহ?

মু। আপনার শুনিয়া কাজ কি? সে সকল আপনার সাক্ষাতে আমরা মুখে আনিতে পারি না, তাহাকে কিছু দিয়া বশীভূত করিলে ভাল হয়।

যে অপবিত্র, সে পবিত্রকেও আপনার মত বিবেচনা করিয়া কাজ করে, বুঝিতে পারে না যে, পবিত্র মানুষ আছে, সুতরাং তাহার কার্য্য ধ্বংস হয়। মুরলার কথা শুনিয়া রমার গা দিয়া ঘাম বাহির হইতে লাগিল। রমা ঘামিয়া, কাঁপিয়া, বসিয়া পড়িল। বসিয়া শুইয়া পড়িল। শুইয়া চক্ষু বুজিয়া অজ্ঞান হইল। এমন কথা, রমার মনে এক দিনও হয় নাই। আর কেহ হইলে মনে আসিত, কিন্তু রমা এমনই ভয়বিহ্বলা হইয়া গিয়াছিল যে, সে দিক্‌টা একেবারে নজর করিয়া দেখে নাই। এখন বজ্রাঘাতের মত কথাটা বুকের উপর পড়িল। দেখিল, ভিতরে যাই থাক, বাহিরে কথাটা ঠিক। মনে ভাবিয়া দেখিল, বড় অপরাধ হইয়াছে। রমার স্থূল বুদ্ধি, তবু স্ত্রীলোকের, বিশেষতঃ হিন্দুর মেয়ের একটা বুদ্ধি আছে, যাহা একবার উদয় হইলে এ সকল কথা বড় পরিষ্কার হইয়া থাকে। যত কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, রমা মনে করিয়া দেখিল—বুঝিল, বড় অপরাধ হইয়াছে। তখন রমা মনে ভাবিল, বিষ খাইব, কি গলায় ছুরি দিব। ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিল, গলায় ছুরি দেওয়াই উচিত, তাহা হইলে সব পাপ চুকিয়া যায়, মুসলমানের ভয়ও ঘুচিয়া যায়, কিন্তু ছেলের কি হইবে? রমা শেষ স্থির করিল, রাজা আসিলে গলায় ছুরি দেওয়া যাইবে,

তিনি আসিয়া ছেলের বন্দোবস্ত যা হয় করিবেন—তত দিন মুসলমানের হাতে যদি বাঁচি। মুসলমানের হাতে ত বাঁচিব না নিশ্চিত, তবু গঙ্গারামকে আর ডাকিব না, কি লোক পাঠাইব না। তা রমা আর গঙ্গারামের কাছে লোক পাঠাইল না, কি মুরলাকে যাইতে দিল না।

মুরলা আর আসে না, রমা আর ডাকে না, গঙ্গারাম অস্থির হইল। আহার নিদ্রা বন্ধ হইল। গঙ্গারাম মুরলার সন্ধানে ফিরিতে লাগিল। কিন্তু মুরলা রাজবাটীর পরিচারিকা—রাস্তা ঘাটে সচরাচর বাহির হয় না, কেবল মহিষীর হুকুমে গঙ্গারামের সন্ধানে বাহির হইয়াছিল। গঙ্গারাম মুরলার কোন সন্ধান পাইলেন না। শেষ নিজে এক দূতী খাড়া করিয়া মুরলার কাছে পাঠাইলেন—তাকে ডাকিতে। রমার কাছে পাঠাইতে সাহস হয় না।

মুরলা আসিল—জিজ্ঞাসা করিল, "ডাকিয়াছ কেন ?"

গঙ্গারাম। আর খবর নাও না কেন ?

মুরলা। জিজ্ঞাসা করিলে খবর দাও কই ? আমাদের ত তোমার বিশ্বাস হয় না ?

গঙ্গা। তা ভাল, আমি গিয়াও না হয় বলিয়া আসিতে পারি।

মুরলা। তাতে, যে ফল নৈবিদ্যিতে দেয় তার আটটি।

গঙ্গা। সে আবার কি ?

মুরলা। ছোট রাণী আরাম হইয়াছেন।

গঙ্গা। কি হইয়াছিল যে আরাম হইয়াছেন ?

মুরলা। তুমি আর জান না কি হইয়াছিল ?

গঙ্গা। না।

মুরলা। দেখ নাই, বাতিকের ব্যামো ?

গঙ্গা। সে কি ?

মুরলা। নহিলে তুমি অন্দর মহলে ঢুকিতে পাও ?

গঙ্গা। কেন, আমি কি ?

মুরলা। তুমি কি সেখানকার যোগ্য ?

গঙ্গা। আমি তবে কোথাকার যোগ্য ?

মু। এই ছেঁড়া আঁচলের। বাপের বাড়ী লইয়া যাইতে হয় ত আমাকে লইয়া চল। অনেক দিন বাপ মা দেখি নাই।

এই বলিয়া মুরলা হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল। গঙ্গারাম বুঝিলেন, এ দিকে কোন ভরসা নাই। ভরসা নাই, এ কথা কি কখন মন বুঝে ? যতক্ষণ পাপ করিবার

শক্তি থাকে, ততক্ষণ যার মন পাপে রত হইয়াছে, তার ভরসা থাকে। "পৃথিবীতে যত পাপ থাকে, সব আমি করিব, তবু আমি রমাকে ছাড়িব না।" এই সঙ্কল্প করিয়া কৃতঘ্ন গঙ্গারাম, ভীষণমূর্ত্তি হইয়া আপনার গৃহে প্রত্যাগমন করিল। সেই রাত্রিতে ভাবিয়া ভাবিয়া গঙ্গারাম, রমা ও সীতারামের সর্ব্বনাশের উপায় চিন্তা করিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

অনেক দিন পরে, শ্রী ও জয়ন্তী বিরূপাতীরে, ললিতগিরির উপত্যকায় আসিয়াছে। মহাপুরুষ আসিতে বলিয়াছিলেন, পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে। তাই, দুই জনে আসিয়া উপস্থিত।

মহাপুরুষ কেবল জয়ন্তীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন—শ্রীর সঙ্গে নহে। জয়ন্তী একা হস্তিগুম্ফামধ্যে প্রবেশ করিল,—শ্রী ততক্ষণে বিরূপাতীরে বেড়াইতে লাগিল। পরে, শিখর-দেশে আরোহণ করিয়া, চন্দনবৃক্ষতলে উপবেশন করিয়া, নিম্নে ভূতলস্থ নদীতীরের এক তালবনের অপূর্ব্ব শোভা দর্শন করিতে লাগিল। পরে জয়ন্তী ফিরিয়া আসিল।

মহাপুরুষ কি আদেশ করিলেন, জয়ন্তীকে না জিজ্ঞাসা করিয়া, শ্রী বলিল, "কি মিষ্ট পাখীর শব্দ! কাণ ভরিয়া গেল!"

জয়ন্তী। স্বামীর কণ্ঠস্বরের তুল্য কি?

শ্রী। এই নদীর তর তর গদ গদ শব্দের তুল্য।

জয়ন্তী। স্বামীর কণ্ঠস্বরের তুল্য কি?

শ্রী। অনেক দিন স্বামীর কণ্ঠ শুনি নাই—বড় আর মনে নাই।

হায়! সীতারাম!

জয়ন্তী তাহা জানিত, মনে করাইবার জন্য সে কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিল। জয়ন্তী বলিল, "এখন শুনিলে আর তেমন ভাল লাগিবে না কি?"

শ্রী চুপ করিয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরে, মুখ তুলিয়া, জয়ন্তীর পানে চাহিয়া, শ্রী জিজ্ঞাসা করিল, "কেন, ঠাকুর কি আমাকে পতিসন্দর্শনে যাইতে অনুমতি করিয়াছেন?"

জয়ন্তী। তোমাকে ত যাইতেই হইবে—আমাকেও তোমার সঙ্গে যাইতে বলিয়াছেন।

শ্রী। কেন?

জয়ন্তী। তিনি বলেন, শুভ হইবে।

শ্রী। এখন আর আমার তাহাতে শুভাশুভ, সুখ দুঃখ কি ভগিনি?

জয়ন্তী। বুঝিতে পারিলে না কি শ্রী? তোমায় আজিও কি এত বুঝাইতে হইবে?

শ্রী। না—বুঝি নাই।

জয়ন্তী। তোমার শুভাশুভ উদ্দিষ্ট হইলে, ঠাকুর তোমাকে কোন আদেশ করিতেন না—আপনার স্বার্থ খুঁজিতে তিনি কাহাকেও আদেশ করেন না। ইহাতে তোমার শুভাশুভ কিছুই নাই।

শ্রী। বুঝিয়াছি—আমি এখন গেলে আমার স্বামীর শুভ হইবার সম্ভাবনা?

জয়ন্তী। তিনি কিছুই স্পষ্ট বলেন না—অত ভাঙ্গিয়াও বলেন না, আমাদিগের সঙ্গে বেশী কথা কহিতে চাহেন না। তবে তাঁহার কথার এইমাত্র তাৎপর্য্য হইতে পারে, ইহা আমি বুঝি। আর তুমিও আমার কাছে এত দিন যাহা শুনিলে শিখিলে, তাহাতে তুমিও বোধ হয় বুঝিতে পারিতেছ।

শ্রী। তুমি যাইবে কেন?

জয়ন্তী। তাহা আমাকে কিছুই বলেন নাই। তিনি আজ্ঞা করিয়াছেন, তাই আমি যাইব। না যাইব কেন? তুমি যাইবে?

শ্রী। তাই ভাবিতেছি।

জয়ন্তী। ভাবিতেছ কেন? সেই প্রিয়প্রাণহন্ত্রী কথাটা মনে পড়িয়াছে বলিয়া কি?

শ্রী। না। এখন আর তাহাতে ভীত নই।

জয়ন্তী। কেন ভীত নও, আমাকে বুঝাও। তা বুঝিয়া তোমার সঙ্গে যাওয়া আমি স্থির করিব।

শ্রী। কে কাকে মারে বহিন্? মারিবার কর্ত্তা এক জন—যে মরিবে, তিনি তাহাকে মারিয়া রাখিয়াছেন। সকলেই মরে। আমার হাতে হউক, পরের হাতে হউক, তিনি এক দিন মৃত্যুকে পাইবেন। আমি কখন ইচ্ছাপূর্ব্বক তাঁহাকে হত্যা করিব না, ইহা বলাই বাহুল্য; তবে যিনি সর্ব্বকর্ত্তা, তিনি যদি ঠিক করিয়া থাকেন যে, আমারই হাতে তাঁহার সংসারযন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি ঘটিবে, তবে কাহার সাধ্য অন্যথা করে? আমি বনে বনেই বেড়াই, আর সমুদ্রপারেই যাই, তাঁহার আজ্ঞার বশীভূত হইতেই হইবে। আপনি সাবধান হইয়া ধর্ম্মমত আচরণ করিব—তাহাতে তাঁহার বিপদ্ ঘটে, আমার তাহাতে সুখ দুঃখ কিছুই নাই।

হো হো সীতারাম! কাহার জন্য ঘুরিয়া বেড়াইতেছ!

জয়ন্তী মনে মনে বড় খুসী হইল। জয়ন্তী জিজ্ঞাসা করিল, "তবে ভাবিতেছ কেন?"

শ্রী। ভাবিতেছি, গেলে যদি তিনি আর না ছাড়িয়া দেন?

জয়ন্তী। যদি কোষ্ঠীর ভয় আর নাই, তবে ছাড়িয়া নাই দিলেন? তুমিই আসিবে কেন?

শ্রী। আমি কি আর রাজার বামে বসিবার যোগ্য?

জয়ন্তী। এক হাজার বার। যখন তোমাকে সুবর্ণরেখার ধারে, কি বৈতরণীতীরে প্রথম দেখিয়াছিলাম, তাহার অপেক্ষা তোমার রূপ কত গুণে বাড়িয়াছে, তাহা তুমি কিছুই জান না।

শ্রী। ছি!

জয়ন্তী। গুণ কত গুণে বাড়িয়াছে, তাও কি জান না? কোন্ রাজমহিষী গুণে তোমার তুল্যা?

শ্রী। আমার কথা বুঝিলে কই? কই, তোমার আমার মনের মধ্যে বাঁধা রাস্তা বাঁধিয়াছ কই? আমি কি তাহা বলিতেছিলাম? বলিতেছিলাম যে, যে শ্রীকে ফিরাইবার জন্য তিনি ডাকাডাকি করিয়াছিলেন, সে শ্রী আর নাই—তোমার হাতে তাহার মৃত্যু হইয়াছে। এখন আছে কেবল তোমার শিষ্যা। তোমার শিষ্যাকে নিয়া মহারাজাধিরাজ সীতারাম রায় সুখী হইবেন কি? না তোমার শিষ্যাই মহারাজাধিরাজ লইয়া সুখী হইবে? রাজরাণীগিরি চাকরি তোমার শিষ্যার যোগ্য নহে।

জয়ন্তী। আমার শিষ্যার আবার সুখ দুঃখ কি? (পরে সহাস্যে) ধিক্ এমন শিষ্যায়!

শ্রী। আমার সুখ দুঃখ নাই, কিন্তু তাঁহার আছে। যখন দেখিবেন, তাঁহার শ্রী মরিয়া গিয়াছে, তাহার দেহ লইয়া এক জন সন্ন্যাসিনী প্রবঞ্চনা করিয়া বেড়াইতেছে, তখন কি তাঁর দুঃখ হইবে না?

জয়ন্তী। হইতে পারে, না হইতে পারে। সে সকল কথার বিচারে কোন প্রয়োজন নাই। যে অনন্তসুন্দর কৃষ্ণপাদপদ্মে মন স্থির করিয়াছে, তাহা ছাড়া আর কিছুই তাহার চিত্তে যেন স্থান না পায়—তাহা হইলে সকল দিকেই ঠিক কাজ হইবে; এক্ষণে চল, তোমার স্বামীর হউক, কি যাহারই হউক, যখন শুভ সাধন করিতে হইবে, তখন এখনই যাত্রা করি।

যতক্ষণ এই কথোপকথন হইতেছিল, ততক্ষণ জয়ন্তীর হাতে দুইটা ত্রিশূল ছিল। শ্রী জিজ্ঞাসা করিল, "ত্রিশূল কেন?"

"মহাপুরুষ আমাদিগকে ভৈরবীবেশে যাইতে বলিয়া দিয়াছেন। এই দুইটি ত্রিশূল দিয়াছেন। বোধ হয়, ত্রিশূল মন্ত্রপূত।"*

তখন দুই জনে ভৈরবীবেশ গ্রহণ করিল এবং উভয়ে পর্ব্বত অবরোহণ করিয়া, বিরূপাতীরবর্ত্তী পথে গঙ্গাভিমুখে চলিল। পথপার্শ্ববর্ত্তী বন হইতে বন্য পুষ্প চয়ন করিয়া উভয়ে তাহার দল কেশর রেণু প্রভৃতি তন্ন তন্ন করিয়া পরীক্ষা করিতে করিতে এবং

* আধুনিক ভাষায় "magnetized."

পুষ্পনির্ম্মাতার অনন্ত কৌশলের অনন্ত মহিমা কীর্ত্তন করিতে করিতে চলিল। সীতারামের নাম আর কেহ একবারও মুখে আনিল না। এ পোড়ারমুখীদিগকে জগদীশ্বর কেন রূপ যৌবন দিয়াছিলেন, তাহা তিনিই জানেন। আর যে গণ্ডমূর্খ সীতারাম, শ্রী। শ্রী। করিয়া পাতি পাতি করিল, সেই বলিতে পারে। পাঠক বোধ হয়, দুইটাকেই ডাকিনী-শ্রেণীমধ্যে গণ্য করিবেন। তাহাতে গ্রন্থকারের সম্পূর্ণ মত আছে।

নবম পরিচ্ছেদ

বন্দেআলি নামে ভূষণার একজন ছোট মুসলমান, একজন বড় মুসলমানের কবিলাকে বাহির করিয়া তাহাকে নেকা করিয়াছিল। খসম গিয়া বলপূর্ব্বক অপহৃতা সীতার উদ্ধারের উদ্যোগী হইল; দোস্ত বিবি লইয়া মহম্মদপুর পলায়ন করিয়া তথায় বাস করিতে লাগিল। গঙ্গারামের নিকট সে পূর্ব্ব হইতে পরিচিত ছিল। তাঁহার অনুগ্রহে সে সীতারামের নাগরিক সৈন্যমধ্যে সিপাহী হইল। গঙ্গারাম তাহাকে বড় বিশ্বাস করিতেন। তিনি এক্ষণে গোপনে তাহাকে তোরাব্ খাঁর নিকট পাঠাইলেন। বলিয়া পাঠাইলেন, "চন্দ্রচূড় ঠাকুর বঞ্চক। চন্দ্রচূড় যে বলিতেছেন যে, টাকা দিলে আমি মহম্মদপুর ফৌজদারের হস্তে দিব, সে কেবল প্রবঞ্চনাবাক্য। প্রবঞ্চনার দ্বারা কাল হরণ করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। যাহাতে সীতারাম আসিয়া পৌঁছে, তিনি তাহাই করিতেছেন। নগরও তাঁহার হাতে নয়। তিনি মনে করিলেও নগর ফৌজদারকে দিতে পারেন না। নগর আমার হাতে। আমি না দিলে নগর কেহ পাইবে না, সীতারামও না। আমি ফৌজদারকে নগর ছাড়িয়া দিতে পারি। কিন্তু তাহার কথাবার্ত্তা আমি ফৌজদার সাহেবের সহিত স্বয়ং কহিতে ইচ্ছা করি—নহিলে হইবে না। কিন্তু আমি ত ফেরারী আসামী—প্রাণভয়ে যাইতে সাহস করি না। ফৌজদার সাহেব অভয় দিলে যাইতে পারি।"

গঙ্গারামের সৌভাগ্যক্রমে বন্দেআলির ভগিনী এক্ষণে তোরাব্ খাঁর এক জন মতাহিয়া বেগম। সুতরাং ফৌজদারের সঙ্গে সাক্ষাৎলাভ বন্দেআলির পক্ষে কঠিন হইল না। কথাবার্ত্তা ঠিক হইল। গঙ্গারাম অভয় পাইলেন।

তোরাব্ স্বহস্তে গঙ্গারামকে এই পত্র লিখিলেন, "তোমার সকল কসুর মাফ করা গেল। কাল রাত্রিকালে হুজুরে হাজির হইবে।"

বন্দেআলি ভূষণা হইতে ফিরিল। যে নৌকায় সে পার হইল, সেই নৌকায় চাঁদ শাহা ফকির—সেও পার হইতেছিল। ফকির বন্দেআলির সঙ্গে কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইল। "কোথায় গিয়াছিলে?" জিজ্ঞাসা করায় বন্দেআলি বলিল, "ভূষণায় গিয়াছিলাম।" ফকির

ভূষণার খবর জিজ্ঞাসা করিল। বন্দেআলি ফৌজদারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া আসিয়াছে, সুতরাং একটু উঁচু মেজাজে ছিল। ভূষণার খবর বলিতে একেবারে কোতোয়াল, বখশী, মুনশী, কারকুন, পেস্কার, লাগায়েৎ খোদ ফৌজদারের খবর বলিয়া ফেলিল। ফকির বিস্মিত হইল। ফকির সীতারামের হিতাকাঙ্ক্ষী। সে মনে মনে স্থির করিল, "আমাকে একটু সন্ধানে থাকিতে হইবে।"

দশম পরিচ্ছেদ

গঙ্গারাম ফৌজদারের সঙ্গে নিভৃতে সাক্ষাৎ করিলেন। ফৌজদার তাঁহাকে কোন প্রকার ভয় দেখাইল না। কাজের কথা সব ঠিক হইল। ফৌজদারের সৈন্য মহম্মদপুরের দুর্গদ্বারে উপস্থিত হইলে, গঙ্গারাম দুর্গদ্বার খুলিয়া দিতে স্বীকৃত হইলেন। কিন্তু ফৌজদার বলিলেন, "দুর্গদ্বারে পৌঁছিলে ত তুমি আমাদের দুর্গদ্বার খুলিয়া দিবে। এখন মৃণ্ময়ের তাঁবে অনেক সিপাহী আছে। পথিমধ্যে, বিশেষ পারের সময়ে, তাহারা যুদ্ধ করিবে, ইহাই সম্ভব। যুদ্ধে জয় পরাজয় আছে। যদি যুদ্ধে আমাদের জয় হয়, তবে তোমার সাহায্য ব্যতীতও আমরা দুর্গ অধিকার করিতে পারি। যদি পরাজয় হয়, তবে তোমার সাহায্যে আমাদের কোন উপকার হইবে না। তার কি পরামর্শ করিয়াছ?"

গঙ্গা। ভূষণা হইতে মহম্মদপুর যাইবার দুই পথ আছে। এক উত্তর পথ, এক দক্ষিণ পথ। দক্ষিণ পথে, দূরে নদী পার হইতে হয়—উত্তর পথে কিল্লার সম্মুখেই পার হইতে হয়। আপনি মহম্মদপুর আক্রমণ করিতে দক্ষিণ পথে সেনা লইয়া যাইবেন। মৃণ্ময় তাহা বিশ্বাস করিবে; কেন না, কিল্লার সম্মুখে নদীপার কঠিন বা অসম্ভব। অতএব সেও সৈন্য লইয়া দক্ষিণ পথে আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে যাইবে। আপনি সেই সময়ে উত্তর পথে সৈন্য লইয়া কিল্লার সম্মুখে নদী পার হইবেন। তখন দুর্গে সৈন্য থাকিবে না বা অল্পই থাকিবে। অতএব আপনি অনায়াসে নদী পার হইয়া খোলা পথে দুর্গের ভিতর প্রবেশ করিতে পারিবেন।

ফৌজদার। কিন্তু যদি মৃণ্ময় দক্ষিণ পথে যাইতে যাইতে শুনিতে পায় যে, আমরা উত্তর পথে সৈন্য লইয়া যাইতেছি, তবে সে পথ হইতে ফিরিতে পারে।

গঙ্গারাম। আপনি অর্দ্ধেক সৈন্য দক্ষিণ পথে, অর্দ্ধেক সৈন্য উত্তর পথে পাঠাইবেন। উত্তর পথে যে সৈন্য পাঠাইবেন, পূর্ব্বে যেন কেহ তাহা না জানিতে পারে। ঐ সৈন্য রাত্রিতে রওয়ানা করিয়া নদীতীর হইতে কিছু দূরে বনজঙ্গল মধ্যে লুকাইয়া রাখিলে ভাল হয়।

তার পর মৃণ্ময় ফৌজ লইয়া কিছু দূর গেলে পর নদী পার হইলেই নির্ব্বিঘ্ন হইবেন। মৃণ্ময়ের সৈন্যও উত্তর দক্ষিণ দুই পথের সৈন্যের মাঝখানে পড়িয়া নষ্ট হইবে।

ফৌজদার পরামর্শ শুনিয়া সন্তুষ্ট ও সম্মত হইলেন। বলিলেন, "উত্তম। তুমি আমাদিগের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী বটে। কোন পুরস্কারের লোভেতেই এরূপ করিতেছ সন্দেহ নাই। কি পুরস্কার তোমার বাঞ্ছিত ?"

গঙ্গারাম অভীষ্ট পুরস্কার চাহিলেন—বলা বাহুল্য, সে পুরস্কার রমা।

সন্তুষ্ট হইয়া গঙ্গারাম বিদায় হইল। এবং সেই রাত্রিতেই মহম্মদপুর ফিরিয়া আসিল।

গঙ্গারাম জানিত না যে, চাঁদশাহ ফকির তাহার অনুবর্ত্তী হইয়াছিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ

সন্ধ্যার পর গুপ্তচর আসিয়া চন্দ্রচূড়কে সংবাদ দিল যে, ফৌজদারী সৈন্য দক্ষিণ পথে মহম্মদপুর আক্রমণে আসিতেছে।

চন্দ্রচূড় তখন মৃণ্ময় ও গঙ্গারামকে ডাকাইয়া, পরামর্শ করিতে লাগিলেন। পরামর্শ এই স্থির হইল যে, মৃণ্ময় সৈন্য লইয়া সেই রাত্রিতে দক্ষিণ পথে যাত্রা করিবেন—যাহাতে যবনসেনা নদী পার হইতে না পারে, এমন ব্যবস্থা করিবেন।

এ দিকে রণসজ্জার ধূম পড়িয়া গেল। মৃণ্ময় পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত ছিলেন, তিনি সৈন্য লইয়া রাত্রিতেই দক্ষিণ পথে যাত্রা করিলেন। গড় রক্ষার্থ অল্প মাত্র সিপাহী রাখিয়া গেলেন। তাহারা গঙ্গারামের আজ্ঞাধীনে রহিল।

এই সকল গোলমালের সময়ে পাঠকের কি গরিব রমাকে মনে পড়ে ? সকলের কাছে মুসলমানের সৈন্যাগমনবার্ত্তা যেমন পৌছিল, রমার কাছেও সেইরূপ পৌছিল। মুরলা বলিল, "মহারাণী, এখন বাপের বাড়ী যাওয়ার উদ্যোগ কর।"

রমা বলিল, "মরিতে হয় এইখানেই মরিব। কলঙ্কের পথে যাইব না। কিন্তু তুমি একবার গঙ্গারামের কাছে যাও। আমি মরি, এইখানেই মরিব, কিন্তু আমার ছেলেকে রক্ষা করিতে তিনি স্বীকৃত আছেন, তাহা স্মরণ করিয়া দিও। সময়ে আসিয়া যেন রক্ষা করেন। আমার সঙ্গে কিছুতেই আর সাক্ষাৎ হইবে না, তাহাও বলিও।"

রমা মনস্থির করিবার জন্য নন্দার কাছে গিয়া বসিয়া রহিল। পুরীমধ্যে কেহই সে রাত্রিতে ঘুমাইল না।

মুরলা আজ্ঞা পাইয়া গঙ্গারামের কাছে চলিল। গঙ্গারাম নিশীথকালে গৃহমধ্যে একাকী বসিয়া গভীর চিন্তায় নিমগ্ন। রত্ন আশায় সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে তিনি প্রবৃত্ত—

সাঁতার দিয়া আবার কূল পাইবেন কি? গঙ্গারাম সাহসে ভর করিয়াও এ কথার কিছু মীমাংসা করিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না। যে ভাবিয়া চিন্তিয়া কিছু স্থির করিতে না পারে, তাহার শেষ ভরসা জগদীশ্বর। সে বলে, "জগদীশ্বর যা করেন।" কিন্তু গঙ্গারাম তাহাও বলিতে পারিতেছিলেন না—যে পাপকর্ম্মে প্রবৃত্ত, সে জানে যে, জগদীশ্বর তার বিরুদ্ধ—জগতের বন্ধু তাহার শত্রু। অতএব গঙ্গারাম বড় বিষণ্ণ হইয়া চিন্তামগ্ন ছিলেন।

এমন সময়ে মুরলা আসিয়া দেখা দিল। রমার প্রেরিত সংবাদ তাঁহাকে বলিল।

গঙ্গারাম বলিল, "বলেন ত এখন গিয়া ছেলে নিয়া আসি।"

মুরলা। তাহা হইবে না। যখন মুসলমান পুরীতে প্রবেশ করিবে, আপনি তখন গিয়া রক্ষা করিবেন, ইহাই রাণীর অভিপ্রায়।

গঙ্গা। তখন কি হইবে, কে বলিতে পারে? যদি রক্ষার অভিপ্রায় থাকে, তবে এই বেলা বালকটিকে আমাকে দিন।

মুরলা। আমি তাহাকে লইয়া আসিব?

গঙ্গা। না। আমার অনেক কথা আছে।

মুরলা। আচ্ছা—পৌষ মাসে।

এই বলিয়া, মুরলা হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল। কিন্তু গঙ্গারামের গৃহ হইতে বাহির হইয়া রাজপথে উঠিতে না উঠিতে মুরলার সে হাসি হঠাৎ নিবিয়া গেল—ভয়ে মুখ কালি হইয়া উঠিল। দেখিল, সম্মুখে রাজপথে, প্রভাতশুক্রতারাবৎ সমুজ্জ্বলা ত্রিশূলধারিণী যুগল-ভৈরবীমূর্ত্তি। মুরলা তাহাদিগকে শঙ্করীর অনুচারিণী ভাবিয়া ভূমিতে পড়িয়া প্রণাম করিয়া, যোড়হাত করিয়া দাঁড়াইল।

এক জন ভৈরবী বলিল, "তুই কে?"

মুরলা কাতরস্বরে বলিল, "আমি মুরলা।"

ভৈরবী। মুরলা কে?

মুরলা। আমি ছোট রাণীর দাসী।

ভৈরবী। নগরপালের ঘরে এত রাত্রিতে কি করিতে আসিয়াছিলি?

মুরলা। মহারাণী পাঠাইয়াছিলেন।

ভৈরবী। সম্মুখে এই দেবমন্দির দেখিতেছিস্?

মুরলা। আজ্ঞা হাঁ।

ভৈরবী। আমাদের সঙ্গে উহার উপরে আয়।

মুরলা। যে আজ্ঞা।

তখন দুই জনে, মুরলাকে দুই ত্রিশূলাগ্রমধ্যবর্ত্তিনী করিয়া মন্দিরমধ্যে লইয়া গেলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

চন্দ্রচূড় তর্কালঙ্কারের সে রাত্রিতে নিদ্রা নাই। কিন্তু সমস্ত রাত্রি নগর পরিভ্রমণ করিয়া দেখিয়াছেন যে, নগর রক্ষার কোন উদ্যোগই নাই। গঙ্গারামকে সে কথা বলায়, গঙ্গারাম তাঁহাকে কড়া কড়া বলিয়া হাঁকাইয়া দিয়াছিল। তখন তিনি অতিশয় অনুতপ্তচিত্তে কুশাসনে বসিয়া সর্ব্বরক্ষাকর্ত্তা বিপত্তিভঞ্জন মধুসূদনকে চিন্তা করিতেছিলেন। এমন সময়ে চাঁদশাহ ফকির আসিয়া গঙ্গারামের ভূষণাগমন বৃত্তান্ত তাঁহাকে জানাইল। শুনিয়া চন্দ্রচূড় শিহরিয়া উঠিলেন। একবার মনে করিতেছিলেন যে, জনকত সিপাহী লইয়া গঙ্গারামকে ধরিয়া আবদ্ধ করিয়া, নগর রক্ষার ভার অন্য লোককে দিবেন, কিন্তু ইহাও ভাবিলেন যে, সিপাহীরা তাঁহার বাধ্য নহে, গঙ্গারামের বাধ্য। অতএব সে সকল উদ্যম সফল হইবে না। মৃণ্ময় থাকিলে কোন গোল উপস্থিত হইত না, সিপাহীরা মৃণ্ময়ের আজ্ঞাকারী। মৃণ্ময়কে বাহিরে পাঠাইয়া তিনি এই সর্ব্বনাশ উপস্থিত করিয়াছেন। ইহা বুঝিতে পারিয়াই তিনি এত অনুতাপপীড়িত হইয়া নিশ্চেষ্টবৎ কেবল অসুরনিসূদন হরির চিন্তা করিতেছিলেন। তখন সহসা সম্মুখে প্রফুল্লকান্তি ত্রিশূলধারিণী ভৈরবীকে দেখিলেন।

সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা, তুমি কে?"

ভৈরবী বলিল, "বাবা! শত্রু নিকটে, এ পুরীর রক্ষার কোন উদ্যোগ নাই কেন? তাই তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছি।"

মুরলার সঙ্গে কথা কহিয়াছিল ও চন্দ্রচূড়ের সঙ্গে কথা কহিতেছে, জয়ন্তী।

প্রশ্ন শুনিয়া চন্দ্রচূড় আরও বিস্মিত হইয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা, তুমি কি এই নগরের রাজলক্ষ্মী?"

জয়ন্তী। আমি যে হই, আমার কথার উত্তর দাও। নহিলে মঙ্গল হইবে না।

চন্দ্র। মা! আমার সাধ্য আর কিছু নাই। রাজা নগররক্ষকের উপর নগর রক্ষার ভার দিয়াছিলেন, নগররক্ষক নগর রক্ষা করিতেছে না। সৈন্য আমার বশ নহে। আমি কি করিব, আজ্ঞা করুন।

জয়ন্তী। নগররক্ষকের সংবাদ আপনি কিছু জানেন? কোন প্রকার অবিশ্বাসিতা শুনেন নাই?

চন্দ্র। শুনিয়াছি। তিনি তোরাব্ খাঁর নিকট গিয়াছিলেন। বোধ হয় তাঁহাকে নগর সমর্পণ করিবেন। আমার দুর্ব্বুদ্ধিবশতঃ আমি তাহার কোন উপায় করি নাই। মা! বোধ করিতেছি, আপনি এই নগরীর রাজলক্ষ্মী। দয়া করিয়া এ দাসকে ভৈরবীবেশে দর্শন দিয়াছেন। মা! আপনি অপরিম্লানতেজস্বিনী হইয়া আপনার এই পুরী রক্ষা করুন।

এই বলিয়া চন্দ্রচূড় কৃতাঞ্জলিপুটে ভক্তিভাবে জয়ন্তীকে প্রণাম করিলেন।

"তবে, আমিই এই পুরী রক্ষা করিব।" এই বলিয়া জয়ন্তী প্রস্থান করিল। চন্দ্রচূড়ের মনে ভরসা হইল।

জয়ন্তীরও আশার অতিরিক্ত ফললাভ হইয়াছিল। শ্রী বাহিরে ছিল। তাহাকে সঙ্গে লইয়া জয়ন্তী গঙ্গারামের গৃহাভিমুখে চলিল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

মুরলা চলিয়া গেলে, গঙ্গারাম চারি দিকে আরও অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। যাহার জন্য তিনি এই বিপদ্‌সাগরে ঝাঁপ দিতেছেন, সে ত তাঁহার অনুরাগিণী নয়। তিনি চক্ষু বুজিয়া সমুদ্রমধ্যে ঝাঁপ দিতেছেন, সমুদ্রতলে রত্ন মিলিবে কি? না, ডুবিয়া মরাই সার হইবে? আঁধার! চারি দিকে আঁধার! এখন কে তাঁকে উদ্ধার করিবে?

সহসা গঙ্গারামের শরীর রোমাঞ্চিত হইল। দেখিলেন, দ্বারদেশে প্রভাতনক্ষত্রোজ্জ্বল-রূপিণী ত্রিশূলধারিণী ভৈরবীমূর্ত্তি। অঙ্গপ্রভায় গৃহস্থিত প্রদীপের জ্যোতি ম্লান হইয়া গেল। সাক্ষাৎ ভবানী ভূতলে অবতীর্ণা মনে করিয়া, গঙ্গারামও মুরলার ন্যায় প্রণত হইয়া যোড় হাত করিয়া দাঁড়াইল। বলিল, "মা, দাসের প্রতি কি আজ্ঞা?"

জয়ন্তী বলিল, "বাছা! তোমার কাছে কিছু ভিক্ষার জন্য আসিয়াছি।"

ভৈরবীর কথা শুনিয়া, গঙ্গারাম বলিল, "মা! আপনি যাহা চাহিবেন, তাহাই দিব। আজ্ঞা করুন।"

জয়ন্তী। আমাকে এক গাড়ী গোলা বারুদ দাও। আর এক জন ভাল গোলন্দাজ দাও।

গঙ্গারাম ইতস্ততঃ করিতে লাগিল—কে এ? জিজ্ঞাসা করিল, "মা! আপনি গোলা বারুদ লইয়া কি করিবেন?"

জয়ন্তী। দেবতার কাজ।

গঙ্গারামের মনে বড় সন্দেহ হইল। এ যদি কোন দেবী হইবে, তবে গোলা গুলি ইহার প্রয়োজন হইবে কেন? যদি মানুষী হয়, তবে ইহাকে গোলা গুলি দিব কেন? কাহার চর তা কি জানি? এই ভাবিয়া গঙ্গারাম জিজ্ঞাসা করিল, "মা! তুমি কে?"

জয়ন্তী। আমি যে হই, রমা ও মুরলা ঘটিত সংবাদ আমি সব জানি। তা ছাড়া তোমার ভূষণাগমন-সংবাদ ও সেখানকার কথাবার্ত্তার সংবাদ আমি জানি। আমি যাহা চাহিতেছি, তাহা এই মুহূর্ত্তে আমাকে দাও, নচেৎ এই ত্রিশূলাঘাতে তোমাকে বধ করিব।

এই বলিয়া সেই তেজস্বিনী ভৈরবী উজ্জ্বল ত্রিশূল উত্থিত করিয়া আন্দোলিত করিল।

গঙ্গারাম একেবারে নিবিয়া গেল। "আসুন দিতেছি।" বলিয়া ভৈরবীকে সঙ্গে করিয়া অস্ত্রাগারে গেল। জয়ন্তী যাহা যাহা চাহিল, সকলই দিল, এবং পিয়ারীলাল নামে এক জন গোলন্দাজকে সঙ্গে দিল। জয়ন্তীকে বিদায় দিয়া গঙ্গারাম দুর্গদ্বার বন্ধ রাখিতে আজ্ঞা দিলেন। যেন তাঁহার বিনানুমতিতে কেহ যাইতে আসিতে না পারে।

জয়ন্তী ও শ্রী গোলা বারুদ লইয়া, গড়ের বাহির হইয়া, যেখানে রাজবাড়ীর ঘাট, সেইখানে উপস্থিত হইল। দেখিল, এক উন্নতবপু সুন্দরকান্তি পুরুষ তথা বসিয়া আছেন।

দুই জন ভৈরবীর মধ্যে এক জন ভৈরবী বারুদ, গোলার গাড়ী ও গোলন্দাজকে সঙ্গে লইয়া কিছু দূরে গিয়া দাঁড়াইল, আর এক জন সেই কান্তিমান্ পুরুষের নিকট গিয়া, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কে?"

সে বলিল, "আমি যে হই না। তুমি কে?"

জয়ন্তী বলিল, "যদি তুমি বীরপুরুষ হও, এই গোলা গুলি আনিয়া দিতেছি—এই পুরী রক্ষা কর।"

সে পুরুষ বিস্মিত হইল, দেবতাভ্রমে জয়ন্তীকে প্রণাম করিল। কিছুক্ষণ ভাবিয়া, দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিল। বলিল, "তাতেই বা কি?"

জয়ন্তী। তুমি কি চাও?

পুরুষ। যা চাই, পুরী রক্ষা করিলে তা পাইব?

জয়ন্তী। পাইবে।

এই বলিয়া জয়ন্তী সহসা অদৃশ্য হইল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

বলিয়াছি, চন্দ্রচূড় ঠাকুরের সে রাত্রিতে ঘুম হইল না। অতি প্রত্যূষে তিনি রাজপ্রাসাদের উচ্চ চূড়ে উঠিয়া চারি দিক্ নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। দেখিলেন, নদীর অপর পারে, ঠিক তাঁহার সম্মুখে, বহুসংখ্যক নৌকা একত্র হইয়াছে। তীরে অনেক লোকও আছে বোধ হইতেছে, কিন্তু তখনও তেমন ফর্সা হয় নাই, বোঝা গেল না যে, তাহারা কি প্রকারের লোক। তখন তিনি গঙ্গারামকে ডাকিতে পাঠাইলেন।

গঙ্গারাম আসিয়া সেই অট্টালিকাশিখরদেশে উপস্থিত হইল। চন্দ্রচূড় জিজ্ঞাসা করিলেন, "ও পারে অত নৌকা কেন?"

গঙ্গারাম নিরীক্ষণ করিয়া বলিল, "কি জানি?"

চন্দ্র। দেখ, তীরে বিস্তর লোক। এত নৌকা, এত লোক কেন?

গঙ্গারাম। বলিতে ত পারি না।

কথা কহিতে কহিতে বেশ আলো হইল। তখন বোধ হইল, ঐ সকল লোক সৈনিক। চন্দ্রচূড় তখন বলিলেন, "গঙ্গারাম! সর্ব্বনাশ হইয়াছে। আমাদের চর আমাদের প্রতারণা করিয়াছে। অথবা সেই প্রতারিত হইয়াছে। আমরা দক্ষিণ পথে সৈন্য পাঠাইলাম, কিন্তু ফৌজদারের সেনা এই পথে আসিয়াছে। সর্ব্বনাশ হইল। এখন রক্ষা করে কে?"

গঙ্গারাম। কেন, আমি আছি কি করিতে?

চন্দ্র। তুমি এই কয় জন মাত্র দুর্গরক্ষক লইয়া এই অসংখ্য সেনার কি করিবে? আর তুমিও দুর্গরক্ষার কোন উদ্যোগ করিতেছ না। কাল বলিয়াছিলাম বলিয়া আমাকে কড়া কড়া শুনাইয়াছিলে। এখন কে দায় ভার ঘাড়ে করে?

গঙ্গা। অত ভয় পাইবেন না। ও পারে যে ফৌজ দেখিতেছেন, তাহা অসংখ্য নয়। এই কয়খানা নৌকায় কয় জন সিপাহী পার হইতে পারে? আমি তীরে গিয়া ফৌজ লইয়া দাঁড়াইতেছি। উহারা যেমন তীরে আসিবে, অমনি উহাদিগকে টিপিয়া মারিব।

গঙ্গারামের অভিপ্রায়, সেনা লইয়া বাহির হইবেন, কিন্তু এখন নয়, আগে ফৌজদারের সেনা নির্ব্বিঘ্নে পার হউক। তার পর তিনি সেনা লইয়া দুর্গদ্বার খুলিয়া বাহির হইবেন, মুক্ত দ্বার পাইয়া মুসলমানেরা নির্ব্বিঘ্নে গড়ের ভিতর প্রবেশ করিবে। তিনি কোন আপত্তি করিবেন না। কাল যে মূর্ত্তিটা দেখিয়াছিলেন, সেটা কি বিভীষিকা! কৈ, তার আর কিছু প্রকাশ নাই।

চন্দ্রচূড় সব বুঝিলেন। তথাপি বলিলেন, "তবে শীঘ্র যাও। সেনা লইয়া বাহির হও। বিলম্ব করিও না। নৌকা সকল সিপাহী বোঝাই লইয়া ছাড়িতেছে।"

গঙ্গারাম তখন তাড়াতাড়ি ছাদের উপর হইতে নামিল। চন্দ্রচূড় সভয়ে দেখিতে লাগিলেন যে, প্রায় পঞ্চাশখানা নৌকায় পাঁচ ছয় শত মুসলমান সিপাহী এক শ্রেণীবদ্ধ হইয়া যাত্রা করিল। তিনি অতিশয় অস্থির হইয়া দেখিতে লাগিলেন, কতক্ষণে গঙ্গারাম সিপাহী লইয়া বাহির হয়। সিপাহী সকল সাজিতেছে, ফিরিতেছে, ঘুরিতেছে, সারি দিতেছে—কিন্তু বাহির হইতেছে না। চন্দ্রচূড় তখন ভাবিলেন, "হায়! হায়! কি দুষ্কর্ম্ম করিয়াছি—কেন গঙ্গারামকে বিশ্বাস করিয়াছিলাম! এখন সর্ব্বনাশ হইল। কৈ, সেই জ্যোতির্ম্ময়ী রাজলক্ষ্মীই বা কৈ? তিনিও কি ছলনা করিলেন?" চন্দ্রচূড় গঙ্গারামের সন্ধানে আসিবার অভিপ্রায়ে সৌধ হইতে অবতরণ করিবার উপক্রম করিতেছিলেন, এমন সময়ে গুড়ুম্ করিয়া এক কামানের আওয়াজ হইল। মুসলমানের নৌকাশ্রেণী হইতে আওয়াজ হইল, এমন বোধ হইল না। তাহাদের সঙ্গে কামান আছে, এমন বোধ

হইতেছিল না। চন্দ্রচূড় নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন, মুসলমানের কোন নৌকায় কামানের ধুঁয়া দেখা যায় না। চন্দ্রচূড় সবিস্ময়ে দেখিলেন, যেমন কামানের শব্দ হইল, অমনি মুসলমানদিগের একখানি নৌকা জলমগ্ন হইল; আরোহী সিপাহীরা সন্তরণ করিয়া অন্য নৌকায় উঠিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

"তবে কি এ আমাদের তোপ!"

এই ভাবিয়া চন্দ্রচূড় নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন। দেখিলেন, একটি সিপাহীও গড় হইতে বাহির হয় নাই। দুর্গপ্রাকারে, যেখানে তোপ সকল সাজান আছে, সেখানে একটি মনুষ্যও নাই। তবে এ তোপ ছাড়িল কে?

কোনও দিকে ধূম দেখা যায় কি না, ইহা লক্ষ্য করিবার জন্য চন্দ্রচূড় চারি দিকে চাহিতে লাগিলেন,—দেখিলেন, গড়ের সম্মুখে যেখানে রাজবাটীর ঘাট, সেইখান হইতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া, ধূমরাশি আকাশমার্গে উঠিয়া পবন-পথে চলিয়া যাইতেছে।

তখন চন্দ্রচূড়ের স্মরণ হইল যে, ঘাটের উপরে, গাছের তলায় একটা তোপ আছে। কোন শত্রুর নৌকা আসিয়া ঘাটে না লাগিতে পারে, এ জন্য সীতারাম সেখানে একটা কামান রাখিয়াছিলেন—কেহ এখন সেই কামান ব্যবহার করিতেছে, ইহা নিশ্চিত। কিন্তু সে কে? গঙ্গারামের একটি সিপাহীও বাহির হয় নাই—এখনও ফটক বন্ধ। মৃণ্ময়ের সিপাহীরা অনেক দূর চলিয়া গিয়াছে। মৃণ্ময় যে কোন সিপাহী ঐ কামানের জন্য রাখিয়া যাইবেন, ইহা অসম্ভব; কেন না, দুর্গরক্ষার ভার গঙ্গারামের উপর আছে। কোন বাজে লোক আসিয়া কামান ছাড়িল—ইহাও অসম্ভব; কেন না, বাজে লোকে গোলা বারুদ কোথা পাইবে? আর এরূপ অব্যর্থ সন্ধান—বাজে লোকের হইতে পারে না—শিক্ষিত গোলন্দাজের। কার এ কাজ? চন্দ্রচূড় এইরূপ ভাবিতেছিলেন, এমন সময়ে আবার সেই কামান বজ্রনাদে চতুর্দ্দিক্ শব্দিত করিল—আবার ধূমরাশি আকাশে উঠিয়া নদীর উপরিস্থ বায়ুস্তরে গগন বিচরণ করিতে লাগিল—আবার মুসলমান সিপাহীপরিপূর্ণ আর একখানি নৌকা জলমগ্ন হইল।

"ধন্য! ধন্য!" বলিয়া চন্দ্রচূড় করতালি দিতে লাগিলেন। নিশ্চিত এই সেই মহাদেবী। বুঝি কালিকা সদয় হইয়া অবতীর্ণ হইয়াছেন। জয় লক্ষ্মীনারায়ণজী! জয় কালী! জয় পুররাজলক্ষ্মী! তখন চন্দ্রচূড় সভয়ে দেখিলেন যে, যে সকল নৌকা অগ্রবর্ত্তী হইয়াছিল—অর্থাৎ যে সকল নৌকার সিপাহীদের গুলি তীর পর্য্যন্ত পৌঁছিবার সম্ভাবনা, তাহারা তীর লক্ষ্য করিয়া বন্দুক চালাইতে লাগিল। ধূমে সহসা নদীবক্ষ অন্ধকার হইয়া উঠিল—শব্দে কাণ পাতা যায় না। চন্দ্রচূড় ভাবিলেন, "যদি আমাদের রক্ষক দেবতা

হয়েন—তবে এ গুলিবৃষ্টি তাঁহার কি করিবে? আর যদি মনুষ্য হয়েন, তবে আমাদের জীবন এই পর্য্যন্ত—এ লোহাবৃষ্টিতে কোন মনুষ্যই টিকিবে না।"

কিন্তু আবার সেই কামান ডাকিল—আবার দশ দিক্ কাঁপিয়া উঠিল—ধূমের চক্রে চক্রে ধূমাকার বাড়িয়া গেল। আবার সসৈন্য নৌকা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া ডুবিয়া গেল।

তখন এক দিকে—এক কামান—আর এক দিকে শত শত মুসলমান সেনায় তুমুল সংগ্রাম বাধিয়া গেল। শব্দে আর কাণ পাতা যায় না। উপর্য্যুপরি গম্ভীর, তীব্র, ভীষণ, মুহুর্মুহুঃ ইন্দ্রহস্তপরিত্যক্ত বজ্রের মত, সেই কামান ডাকিতে লাগিল,—প্রশস্ত নদীবক্ষ, এমন ধূমাচ্ছন্ন হইল যে, চন্দ্রচূড় সেই উচ্চ সৌধ হইতে উত্তালতরঙ্গসংক্ষুব্ধ ধূমসমুদ্র ভিন্ন আর কিছু দেখিতে পাইলেন না। কেবল সেই তীব্রনাদী বজ্রনাদে বুঝিতে পারিলেন যে, এখনও হিন্দুধর্ম্মরক্ষিণী দেবী জীবিতা আছেন। চন্দ্রচূড় তীব্র দৃষ্টিতে ধূমসমুদ্রের বিচ্ছেদ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন—এই আশ্চর্য্য সমরের ফল কি হইল—দেখিবেন।

ক্রমে শব্দ কম পড়িয়া আসিল—একটু বাতাস উঠিয়া ধুঁয়া উড়াইয়া লইয়া গেল—তখন চন্দ্রচূড় সেই জলময় রণক্ষেত্র পরিষ্কার দেখিতে পাইলেন। দেখিলেন যে, ছিন্ন, নিমগ্ন, নৌকা সকল স্রোতে উলটি পালটি করিয়া ভাসিয়া চলিয়াছে। মৃত ও জীবিত সিপাহীর দেহে নদীস্রোত ঝটিকাশান্তির পর পল্লবকুসুমসমাকীর্ণ উদ্যানবৎ দৃষ্ট হইতেছে। কাহারও অস্ত্র, কাহারও বস্ত্র, কাহারও বাদ্য, কাহারও উষ্ণীষ, কাহারও দেহ ভাসিয়া যাইতেছে—কেহ সাঁতার দিয়া পলাইতেছে—কাহাকেও কুম্ভীরে গ্রাস করিতেছে। যে কয়খানা নৌকা ডোবে নাই—সে কয়খানা, নাবিকেরা প্রাণপাত করিয়া বাহিয়া সিপাহী লইয়া অপর পারে পলায়ন করিয়াছে। একমাত্র বজ্রের প্রহারে আহতা আসুরী সেনার ন্যায় মুসলমান সেনা রণে ভঙ্গ দিয়া পলাইল।

দেখিয়া চন্দ্রচূড় হাত জোড় করিয়া ঊর্দ্ধমুখে, গদ্গদকণ্ঠে, সজলনয়নে বলিলেন, "জয় জগদীশ্বর! জয় দৈত্যদমন, ভক্তভারণ, ধর্ম্মরক্ষণ হরি! আজ বড় দয়া করিলে! আজ তুমি স্বয়ং সশরীরে যুদ্ধ করিয়াছ, নহিলে এই পুররাজলক্ষ্মী স্বয়ং যুদ্ধ করিয়াছেন, নহিলে তোমার দাসানুদাস সীতারাম আসিয়াছে। তোমার সেই ভক্ত ভিন্ন এ যুদ্ধ মনুষ্যের সাধ্য নহে।"

তখন চন্দ্রচূড়, প্রাসাদশিখর হইতে অবতরণ করিলেন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

কামানের বন্দুকের হুড়্মুড়্ হুড়্মুড়্ শুনিয়া গঙ্গারাম মনে ভাবিল—এ আবার কি? লড়াই কে করে? সেই ডাকিনী নয় ত? তিনি কি দেবতা? গঙ্গারাম এক জন জমাদ্দারকে দেখিতে পাঠাইলেন। জমাদ্দার নিষ্ক্রান্ত হইল। সে দিন, সেই প্রথম ফটক খোলা হইল।

জমাদ্দার ফিরিয়া গিয়া নিবেদন করিল, "মুসলমান লড়াই করিতেছে।"

গঙ্গারাম বিরক্ত হইয়া বলিল, "তা ত জানি। কার সঙ্গে মুসলমান লড়াই করিতেছে?"

জমাদ্দার বলিল, "কারও সঙ্গে নহে।"

গঙ্গারাম হাসিল, "তাও কি হয় মূর্খ! তোপ কার?"

জমাদ্দার। হুজুর, তোপ কারও না।

গঙ্গারাম বড় রাগিল। বলিল, "তোপের আওয়াজ শুনিতেছিস্ না?"

জমাদ্দার। তা শুনিতেছি।

গঙ্গারাম। তবে? সে তোপ কে দাগিতেছে?

জমা। তাহা দেখিতে পাই নাই।

গঙ্গা। চোখ কোথা ছিল?

জমা। সঙ্গে।

গঙ্গা। তবে তোপ দেখিতে পাও নাই কেন?

জমা। তোপ দেখিয়াছি—ঘাটের তোপ।

গঙ্গা। বটে! কে আওয়াজ করিতেছে?

জমা। গাছের ডাল।

গঙ্গা। তুই কি ক্ষেপিয়াছিস্? গাছের ডালে তোপ দাগে?

জমা। সেখানে আর কাহাকে দেখিতে পাইলাম না—কেবল কতকগুলা গাছের ডাল তোপ ঢাকিয়া নুড়িয়া পড়িয়া আছে দেখিলাম।

গঙ্গা। তবে কেহ ডাল নোঙাইয়া বাঁধিয়া তাহার আশ্রয়ে তোপ দাগিতেছে। সে বুদ্ধিমান্ সন্দেহ নাই। সিপাহীরা তাহাকে লক্ষ্য করিতে পারিবে না, কিন্তু সে পাতার আড়াল হইতে তাহাদের লক্ষ্য করিবে। ডালের ভিতর কে আছে, তা দেখে এলি না কেন?

জমা। সেখানে কি যাওয়া যায়?

গঙ্গা। কেন?

জমা। সেখানে বৃষ্টির ধারার মত গুলি পড়িতেছে।

গঙ্গা। গুলিতে এত ভয় ত এ কাজে এসেছিলি কেন?

তখন গঙ্গারাম অনুচরকে হুকুম দিল যে, জমাদ্দারের পাগড়ি পোষাক কাপড় সব কাড়িয়া লয়। যুদ্ধের সম্ভাবনা দেখিয়া মৃণ্ময় বাছা বাছা জনকত হিন্দুস্থানীকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, এবং দুর্গরক্ষার জন্য তাহাদের রাখিয়া গিয়াছিলেন। গঙ্গারাম তাহাদিগের মধ্যে চারি জনকে আদেশ করিল, "যেখানে ঘাটের উপর তোপ আছে, সেইখানে যাও। যে কামান ছাড়িতেছে, তাহাকে ধরিয়া আন।"

সেই চারি জন সিপাহী যখন তোপের কাছে আসিল, তখন যুদ্ধ শেষ হইয়াছে, হতাবশিষ্ট মুসলমানেরা বাহিয়া পলাইয়া যাইতেছে। সিপাহীরা গাছের ডালের ভিতর গিয়া দেখিল—তোপের কাছে এক জন মানুষ মরিয়া পড়িয়া আছে—আর এক জন জীবিত, পলিতা হাতে করিয়া বসিয়া আছে। সে খুব জোওয়ান, ধুতি মালকোঁচা মারা, মাথায় মুখে গালচাল্লা বাঁধা, সর্ব্বাঙ্গে বারুদে আর ছাইয়ে কালো হইয়া আছে। চারি জন আসিয়া তাহাকে ধরিল। বলিল, "তোম্ কোন্ হো রে?"

সে বলিল, "কেন বাপু!"

"তোম্ কাহে হিঁয়া বৈঠ্ বৈঠ্‌কে তোপ ছোড়্‌তে হো?"

"কেন বাপু, তাতে কি দোষ হয়েছে? মুসলমানের সঙ্গে তোমরা মিলেছ?"

"আরে মুসলমান আনেসে হম্‌লোক আভি হাঁকায় দেতে—তোম্ কাহেকো দিক্ কিয়ে হো? চল্ হুজুরমে যানে হোগা।"

"কার কাছে যাব?"

"কোতোয়াল সাহেবকি হুকুমসে তোম্‌কো উন্‌কা পাশ লে যাঙ্গে।"

"আচ্ছা যাই। আগে নেড়েরা বিদায় হোক। যতক্ষণ ওদের মধ্যে এক জনকে ও পারে দেখা যাইবে, ততক্ষণ তোরা কি, তোদের কোতোয়াল এলে উঠিব না। ততক্ষণ দেখ দেখি, যে মানুষটা মরিয়া আছে, ও কে চিনিতে পারিস কি না?"

সিপাহীরা দেখিয়া বলিল, "হাঁ, হামলোক ত ইস্কো পহচান্‌তে হেঁ। য়ে ত হমারা গোলন্দাজ পিয়ারীলাল হৈঁ—য়ে কাঁহাসে আয়া?"

"তবে আগে ওকে গড়ের ভিতর নিয়ে যা—আমি যাচ্ছি।"

সিপাহীরা পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল, "য়ে আদ্‌মি ত আচ্ছা বোল্‌তা হৈ। যো তোপ্‌কা পাশ রহেগা, ওসিকো লে যানেকো হুকুম হৈ। এই মুরদার তোপ্‌কা পাশ হৈ—উস্‌কো আলবৎ লে যানে হোগা।"

কিন্তু মড়া—হিন্দু সিপাহীরা ছুঁইবে না। তখন পরামর্শ করিয়া একজন সিপাহী, ডোম ডাকিতে গেল—আর তিন জন তাহার প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

এ দিকে কালি বারুদ মাখা পুরুষ, ক্রমে ক্রমে দেখিলেন যে, মুসলমান সিপাহীরা সব তীরে গিয়া উঠিল। তখন তিনি সিপাহীদিগকে বলিলেন, "চল বাবা, তোমাদের কোতোয়াল সাহেবকে সেলাম করি গিয়া চল।" সিপাহীরা সে ব্যক্তিকে ধরিয়া লইয়া চলিল।

সেই সমবেত সজ্জিত দুর্গরক্ষক সৈন্যমণ্ডলীমধ্যে যেখানে ভীত নাগরিকগণ পিপীলিকা-শ্রেণীবৎ সারি দিয়া দাঁড়াইয়া আছে—সেইখানে সিপাহীরা সেই কালিমাখা বারুদমাখা পুরুষকে আনিয়া খাড়া করিল।

তখন সহসা জয়ধ্বনিতে আকাশ পুরিয়া উঠিল। সেই সমবেত সৈনিক ও নাগরিক-মণ্ডলী, একেবারে সহস্র কণ্ঠে গর্জ্জন করিল, "জয় মহারাজের জয়।"

"জয় মহারাজাধিরাজকি জয়।"

"জয় শ্রীসীতারামরায় রাজা বাহাদুরকি জয়।"

"জয় লক্ষ্মীনারায়ণজীকি জয়।"

চন্দ্রচূড় দ্রুত আসিয়া সেই বারুদমাখা মহাপুরুষকে আলিঙ্গন করিলেন; বারুদমাখা পুরুষও তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিলেন। চন্দ্রচূড় বলিলেন, "সমর দেখিয়া আমি জানিয়াছি, তুমি আসিয়াছ। মনুষ্যলোকে তুমি ভিন্ন এ অব্যর্থ সন্ধান আর কাহারও নাই। এখন অন্য কথার আগে গঙ্গারামকে বাঁধিয়া আনিতে আজ্ঞা দাও।"

সীতারাম সেই আজ্ঞা দিলেন। গঙ্গারাম সীতারামকে দেখিয়া সরিয়া পড়িতেছিল, কিন্তু শীঘ্র ধৃত হইয়া সীতারামের আজ্ঞাক্রমে কারাবদ্ধ হইল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

সীতারাম, তখন সিপাহীদিগকে দুর্গপ্রাকারস্থিত তোপ সকলের নিকট, এবং অন্যান্য উপযুক্ত স্থানে অবস্থিত করিয়া, এবং মৃণ্ময়ের সম্বন্ধে সংবাদ আনিবার জন্য লোক পাঠাইয়া, স্বয়ং স্নানাহ্নিকে গমন করিলেন। স্নানাহ্নিকের পর, চন্দ্রচূড় ঠাকুরের সঙ্গে নিভৃতে কথোপকথন করিতে লাগিলেন। চন্দ্রচূড় বলিলেন, "মহারাজ! আপনি কখন আসিয়াছেন, আমরা কিছুই জানিতে পারি নাই। একাই বা কেন আসিলেন? আপনার অনুচরবর্গই বা কোথায়? পথে কোন বিপদ্ ঘটে নাই ত?"

সীতা। সঙ্গীদিগকে পথে রাখিয়া আমি একা আগে আসিয়াছি। আমার অবর্ত্তমানে নগরের কিরূপ অবস্থা, তাহা জানিবার জন্য ছদ্মবেশে একা রাত্রিকালে

আসিয়াছিলাম। দেখিলাম, নগর সম্পূর্ণরূপে অরক্ষিত। কেন, তাহা এখন কতক কতক বুঝিয়াছি। পরে দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিতে গিয়া দেখিলাম, ফটক বন্ধ। দুর্গে প্রবেশ না করিয়া, প্রভাত নিকট দেখিয়া নদীতীরে গিয়া দেখিলাম, মুসলমান সেনা নৌকায় পার হইতেছে। দুর্গরক্ষকেরা রক্ষার কোন উদ্যোগই করিতেছে না দেখিয়া, আপনার যাহা সাধ্য, তাহা করিলাম।

চন্দ্র। যাহা করিয়াছেন, তাহা আপনারই সাধ্য, অপরের নহে। এত গোলা বারুদ পাইলেন কোথা?

সীতা। এক দেবী সহায় হইয়া আমাকে গোলা বারুদ, এবং গোলন্দাজ আনিয়া দিয়াছিলেন।

চন্দ্র। দেবী? আমিও তাঁহার দর্শন পাইয়াছিলাম। তিনি এই পুরীর রাজলক্ষ্মী। তিনি কোথায় গেলেন?

সীতা। তিনি আমাকে গোলা বারুদ এবং গোলন্দাজ দিয়া অন্তর্দ্ধান হইয়াছেন। এক্ষণে এ কয় মাসের সংবাদ আমাকে বলুন।

তখন চন্দ্রচূড় সকল বৃত্তান্ত, যত দূর তিনি জানিতেন, আনুপূর্ব্বিক বিবৃত করিলেন। শেষে বলিলেন, "এক্ষণে যে জন্য দিল্লী গিয়াছিলেন, তাহার সুসিদ্ধির সংবাদ বলুন।"

সীতা। কার্য্যসিদ্ধি হইয়াছে। বাদশাহের আমি কোন উপকার করিতে পারিয়াছিলাম। তাহাতে তিনি আমার উপর সন্তুষ্ট হইয়া দ্বাদশ ভৌমিকের উপর আধিপত্য প্রদান করিয়া মহারাজাধিরাজ নাম দিয়া সনন্দ দিয়াছেন। এক্ষণে বড় দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, ফৌজদারের সঙ্গে বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে। কেন না, ফৌজদার সুবাদারের অধীন, এবং সুবাদার বাদশাহের অধীন। অতএব ফৌজদারের সঙ্গে বিরোধ করিলে, বাদশাহের সঙ্গেই বিরোধ করা হইল। যিনি আমাকে এত দূর অনুগৃহীত করিয়াছেন, তাঁহার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করা নিতান্ত কৃতঘ্নের কাজ। আত্মরক্ষা সকলেরই কর্ত্তব্য। কিন্তু আত্মরক্ষার জন্য ভিন্ন ফৌজদারের সঙ্গে যুদ্ধ করা আমার অকর্ত্তব্য। অতএব এ বিরোধ আমার বড় দুরদৃষ্ট বিবেচনা করি।

চন্দ্র। ইহা আমাদিগের শুভাদৃষ্ট—হিন্দু মাত্রেরই শুভাদৃষ্ট; কেন না, আপনি মুসলমানের প্রতি সম্প্রীত হইলে, মুসলমান হইতে হিন্দুকে রক্ষা করিবে কে? হিন্দুধর্ম্ম আর দাঁড়াইবে কোথায়? ইহা আপনারও শুভাদৃষ্ট; কেন না, যে হিন্দুধর্ম্মের পুনরুদ্ধার করিবে, সেই মনুষ্য মধ্যে কৃতী ও সৌভাগ্যশালী।

সীতা। মৃণ্ময়ের সংবাদ না পাইলে, কি কর্ত্তব্য, কিছুই বলা যায় না।

সন্ধ্যার পর মৃণ্ময়ের সংবাদ আসিল। পীর বক্‌স্ খাঁ নামে ফৌজদারী সেনাপতি অর্দ্ধেক ফৌজদারী সৈন্য লইয়া আসিতেছিলেন, অর্দ্ধেক পথে মৃণ্ময়ের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ ও যুদ্ধ হয়। মৃণ্ময়ের অসাধারণ সাহস ও কৌশলে তিনি সসৈন্যে পরাজিত ও নিহত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে শয়ন করেন। বিজয়ী মৃণ্ময় সসৈন্যে ফিরিয়া আসিতেছেন।

শুনিয়া চন্দ্রচূড় সীতারামকে বলিলেন, "মহারাজ! আর দেখেন কি? এই সময়ে বিজয়ী সেনা লইয়া নদী পার হইয়া গিয়া ভূষণা দখল করুন।"

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

জয়ন্তী বলিল, "শ্রী! আর দেখ কি? এক্ষণে স্বামীর সঙ্গে সাক্ষাৎ কর।"

শ্রী। সেই জন্যই কি আসিয়াছি?

জয়ন্তী। যত প্রকার মনুষ্য আছে, রাজর্ষিই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। রাজাকে রাজর্ষি কর না কেন?

শ্রী। আমার কি সাধ্য?

জয়ন্তী। আমি বুঝি যে, তোমা হইতেই এই মহৎ কার্য্য সিদ্ধ হইতে পারে। অতএব যাও, শীঘ্র গিয়া রাজা সীতারামকে প্রণাম কর।

শ্রী। জয়ন্তি! সোলা জলে ভাসে বটে, কিন্তু খাটো দড়িতে পাথরে বাঁধিয়া দিলে সোলাও ডুবিয়া যায়। আবার কি ডুবিয়া মরিব?

জয়ন্তী। কৌশল জানিলে মরিতে হয় না। ডুবুরিরা সমুদ্রে ডুব দেয়—কিন্তু মরে না, রত্ন তুলিয়া আনে।

শ্রী। আমার সে সাধ্য আছে, আমার এমন ভরসা হইতেছে না। অতএব এক্ষণে আমি রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিব না। কিছু দিন না হয় এইখানে থাকিয়া আপনার মন বুঝিয়া দেখি, যদি দেখি, আমার চিত্ত এখন অবশ, তবে সাক্ষাৎ না করিয়াই এ দেশ ত্যাগ করিয়া যাইব স্থির করিয়াছি।

অতএব, শ্রী, রাজাকে সহসা দর্শন দিল না।

তৃতীয় খণ্ড

রাত্রি—ডাকিনী

প্রথম পরিচ্ছেদ

ভূষণা দখল হইল। যুদ্ধে সীতারামের জয় হইল। তোরাব্ খাঁ মৃণ্ময়ের হাতে মারা পড়িলেন। সে সকল ঐতিহাসিক কথা। কাজেই আমাদের কাছে ছোট কথা। আমরা তাহার বিস্তারিত বর্ণনায় কালক্ষেপ করিতে পারি না। উপন্যাসলেখক অন্তর্ব্বিষয়ের প্রকটনে যত্নবান্ হইবেন—ইতিবৃত্তের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখা নিষ্প্রয়োজন।

ভূষণা অধিকৃত হইল। বাদশাহী সনদের বলে এবং নিজ বাহুবলে সীতারাম বাঙ্গালার দ্বাদশ ভৌমিকের উপর আধিপত্য স্থাপন করিয়া মহারাজা উপাধি গ্রহণপূর্ব্বক প্রচণ্ড প্রতাপে শাসন আরম্ভ করিলেন।

শাসন সম্বন্ধে আগেই গঙ্গারামের দণ্ডের কথাটা উঠিল। তাহার বিরুদ্ধে প্রমাণের অভাব ছিল না। পতিপ্রাণা অপরাধিনী রমাই সমস্ত বৃত্তান্ত অকপটে সীতারামের নিকট প্রকাশ করিল। বাকি যেটুকু, সেটুকু মুরলা ও চাঁদশাহ ফকির সকলই প্রকাশ করিল। কেবল গঙ্গারামকে জিজ্ঞাসা করা বাকি—এমন সময়ে এ কথা লইয়া গোলযোগ উপস্থিত হইল।

কথাগুলা রমা, অন্তঃপুরে বসিয়া সীতারামের কাছে, চক্ষুর জলে ভাসিতে ভাসিতে বলিল। সীতারাম তাহার একবর্ণ অবিশ্বাস করিলেন না। বুঝিলেন, সরলা রমা নিরপরাধিনী, অপরাধের মধ্যে কেবল পুত্রস্নেহ। কিন্তু সাধারণ পুরবাসী লোক তাহা ভাবিল না। গঙ্গারাম কয়েদ হইল কেন? এই কথাটা লইয়া সহরে বড় আন্দোলন পড়িয়া গেল। কতক মুরলার দোষে, কতক সেই পাহারাওয়ালা পাঁড়ে ঠাকুরের গল্পের ঝাঁকে; রমার নামটা সেই সঙ্গে লোকে মিলাইতে লাগিল। কেহ বলিল যে, গঙ্গারাম মোগলকে রাজ্য বেচিতে বসিয়াছিল; কেহ বলিল যে, সে ছোট রাণীর মহলে গিরেপ্তার হইয়াছিল; কেহ বলিল, দুই কথাই সত্য, আর রাজ্য বেচার পরামর্শে ছোট রাণীও ছিলেন। রাজার কাণে এত কথা উঠে না, কিন্তু রাণীর কাণে উঠে—মেয়ে মহলে এ রকম কথাগুলা সহজে প্রচার পায়—শাখা প্রশাখা সমেত। দুই রাণীর কাণেই কথা উঠিল। রমা শুনিয়া শয্যা লইল, কাঁদিয়া বালিশ ভাসাইল, শেষ গলায় দড়ি দিয়া, কি জলে ডুবিয়া মরা ঠিক করিল। নন্দা শুনিয়া বুদ্ধিমতীর মত কাজ করিল।

নন্দা খুঁজিয়া খুঁজিয়া রমা যেখানে বালিশে মুখ ঝাঁপিয়া কাঁদিতেছে, আর পুকুরে ডুবিয়া মরা সোজা, কি গলায় দড়ি দিয়া মরা সোজা, ইহার যতদূর সাধ্য মীমাংসা করিতেছে,

সেইখানে গিয়া তাহাকে ধরিল। বলিল, "দেখিতেছি, তুমিও ছাই কথা শুনিয়াছ।" রমা কেবল ঘাড় নাড়িল—অর্থাৎ "শুনিয়াছি।" চক্ষুর জল বড় বেশী ছুটিল।

নন্দা তাহার চক্ষুর জল মুছাইয়া, সস্নেহবচনে বলিল, "কাঁদিলে কলঙ্ক যাবে না, দিদি! না কাঁদিয়া, যাতে এ কলঙ্ক মুছিয়া তুলিতে পারি, তাই করিতে হইবে। পারিস্ ত উঠিয়া বসিয়া, ধীরে সুস্থে আমাকে সকল কথা ভাঙ্গিয়া চুরিয়া বল্ দেখি। এখন আমাকে সতীন ভাবিস্ না—কালি চূণ তোর গালে পড়ুক না পড়ুক, রাজারই বড় মাথা হেঁট হয়েছে। তিনি তোরও প্রভু—আমারও প্রভু, এ লজ্জা আমার চেয়ে তোর যে বেশী, তা মনে করিস্ না। আর মহারাজা আমাকে অন্তঃপুরের ভার দিয়া গিয়াছিলেন,—তাঁর কাণে এ কথা উঠিলে আমি কি জবাব দিব?"

রমা বলিল, "যাহা যাহা হইয়াছিল, আমি তাঁহাকে বলিয়াছি; তিনি আমার কথায় বিশ্বাস করিয়া আমাকে ক্ষমা করিয়াছেন। আমার ত কোন দোষ নাই।"

নন্দা। তা বলিতে হইবে না—তোর যে কোন দোষ নাই, সে কথা আমায় বলিয়া কেন দুঃখ পাস্? তবে কি হইয়াছিল, তা আমাকে বলিস্ না বলিস্—

রমা। বলিব না কেন? আমি এ কথা সকলকেই বলিতে পারি।

এই বলিয়া রমা, চক্ষুর জল সামলাইয়া, উঠিয়া বসিয়া, সকল কথা যথার্থরূপে নন্দাকে বলিল। নন্দার সে কথায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস জন্মিল। নন্দা বলিল, "যদি ঘুণাক্ষরে আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়া এ কাজ করিতে দিদি, তবে কি এত কাণ্ড হইতে পায়? তা যাক্—যা হয়ে গিয়েছে, তার জন্য তিরস্কার করিয়া এখন আর কি হইবে? এখন যাহাতে আবার মানসম্ভ্রম বজায় হয়, তাই করিতে হইবে।"

রমা। যদি তা না কর দিদি, তবে তোমায় নিশ্চিত বলিতেছি, আমি জলে ডুবিয়া মরিব, কি গলায় দড়ি দিয়া মরিব। আমি ত রাজার মহিষী—এমন কাঙ্গাল গরিব ভিখারীর মেয়ে কে আছে যে, অপবাদ হইলে আর প্রাণ রাখিতে চায়?

নন্দা। মরিতে হইবে না, দিদি! কিন্তু একটা খুব সাহসের কাজ করিতে পারিস্? বোধ হয়, তা হলে কাহারও মনে আর কোন সন্দেহ থাকিবে না।

রমা। এমন কাজ নাই যে, এর জন্য আমি করিতে পারি না। কি করিতে হইবে?

নন্দা। তুমি যে রকম করিয়া আমার কাছে সকল কথা ভাঙ্গিয়া চুরিয়া বলিলে, এই রকম করিয়া তুমি যার সাক্ষাতে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া বলিবে, সেই তোমার কথায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিবে, ইহা আমার নিশ্চিত বিবেচনা হয়। যদি রাজধানীর লোক সকলে তোমার মুখে এ কথা শুনে, তবে আর এ কলঙ্ক থাকে না।

রমা। তা কি প্রকারে হইবে?

নন্দা। আমি মহারাজকে বলিয়া দরবার করাইব। তিনি ঘোষণা দিয়া সমস্ত নগরবাসীকে সেই দরবারে উপস্থিত করিবেন; সেখানে গঙ্গারামের সাক্ষাৎকারে, সমস্ত নগরবাসীর সাক্ষাৎকারে, তুমি এই কথাগুলি বলিবে। আমরা রাজমহিষী, সূর্য্যও আমাদিগকে দেখিতে পান না। এই সমস্ত নগরবাসীর সম্মুখে বাহির হইয়া, মুক্তকণ্ঠে তুমি এই সকল কথা কি বলিতে পারিবে? পার ত সব কলঙ্ক হইতে আমরা মুক্ত হই।

রমা তখন সিংহীর মত গর্জ্জিয়া উঠিয়া বলিল, "তুমি সমস্ত নগরবাসী কি বলিতেছ দিদি! সমস্ত জগতের লোক জমা কর, আমি জগতের লোকের সম্মুখে মুক্তকণ্ঠে এ কথা বলিব।"

নন্দা। পারিবি?

রমা। পারিব—নহিলে মরিব।

নন্দা। আচ্ছা, তবে আমি গিয়া মহারাজকে বলিয়া দরবারের বন্দোবস্ত করাই। তুই আর কাঁদিস্ না।

নন্দা উঠিয়া গেল। রমাও শয্যা ত্যাগ করিয়া চোখের জল মুছিয়া, পুত্রকে কোলে লইয়া মুখচুম্বন করিল। এতক্ষণ তাহাও করে নাই।

নন্দা রাজাকে সংবাদ দিয়া অন্তঃপুরে আনাইল। যে কুরব উঠিয়াছে, সকলেই যাহা বলিতেছে, তাহা রাজাকে শুনাইল তার পর রমার সঙ্গে নন্দার যে কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, তাহা সকলই অবিকল তাঁহাকে বলিল। তার পর বলিল, "আমরা দুই জনে গলায় কাপড় দিয়া তোমার পায়ে লুটাইয়া (বলিবার সময়ে নন্দা গলায় কাপড় দিয়া জানু পাতিয়া বসিয়া, দুই হাতে দুই পা চাপিয়া ধরিল) বলিতেছি যে, এখন তুমি আমাদের মান রাখ, এ কলঙ্ক হইতে উদ্ধার কর, নহিলে আমরা দুই জনেই আত্মহত্যা করিয়া মরিব।"

সীতারাম বড় বিষণ্ণভাবে—কলঙ্কের জন্যও বটে, নন্দার প্রস্তাবের জন্যও বটে,—বলিলেন, "রাজার মহিষী—আমি কি প্রকারে দরবারে বাহির করিব? কি প্রকারে আপনার মহিষীকে সামান্যা কুলটার ন্যায় বিচারালয়ে খাড়া করিয়া দিব?"

নন্দা। তুমি যেমন বুঝিবে, আমরা কিন্তু তেমন বুঝিব না; কিন্তু সে বেশী লজ্জা, না রাজমহিষীর কুলটা অপবাদ বেশী লজ্জা?

সীতা। এরূপ মিথ্যা অপবাদ রাজার ঘরে, সীতা হইতে চলিয়া আসিতেছে। প্রথামত কাজ করিতে হইলে এত কাণ্ড না করিয়া, সীতার ন্যায় রমাকে আমার ত্যাগ করাই শ্রেয়। তাহা হইলে আর কোন কথা থাকে না।

নন্দা। মহারাজ! নিরপরাধিনীকে ত্যাগ করিবে, তবু তার বিচার করিবে না? এই কি তোমার রাজধর্ম্ম? রামচন্দ্র করিয়াছিলেন বলিয়া কি তুমিও করিবে? যিনি পূর্ণ ব্রহ্ম, তাঁর আর ত্যাগই কি, গ্রহণই বা কি? তোমার কি তা সাজে মহারাজ?

সীতা। এই সমস্ত প্রজা, শত্রু মিত্র ইতর ভদ্র লোকের সাক্ষাতে আপনার মহিষীকে কুলটার ন্যায় খাড়া করিয়া দিতে আমার বুক কি ভাঙ্গিয়া যাইবে না? আমি ত পাষাণ নহি।

নন্দা। মহারাজ! যখন পঞ্চাশ হাজার লোক সামনে, শ্রী গাছের ডালে চড়িয়া নাচিয়াছিল, তখন কি তোমার বুক দশ হাত হইয়াছিল?

সীতারাম নন্দার প্রতি ক্রূর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। বলিলেন, "তা হয়েছিল, নন্দা! আবার তেমন হইল না, সেই দুঃখই আমার বেশী।"

ইট্‌টি মারিয়া পাটখেল খাইয়া, নন্দা যোড় হাতে ক্ষমা প্রার্থনা করিল। যোড় হাত করিয়া, নন্দা জিতিয়া গেল। সীতারাম শেষে দরবারে সম্মত হইলেন। বুঝিলেন, ইহা না করিলে রমাকে ত্যাগ করিতে হয়। অথচ রমা নিরপরাধিনী। কাজেই দরবার ভিন্ন আর কর্ত্তব্য নাই।

বিষণ্ণভাবে রাজা, চন্দ্রচূড়ের নিকটে আসিয়া দরবারের কর্ত্তব্যতা নিবেদিত হইলেন। ব্রাহ্মণ ঠাকুরের আব্রু পরদার উপর ততটা শ্রদ্ধা হইল না। তিনি সাধুবাদ করিয়া সম্মত হইলেন। তাঁর কেবল ভয়, রমা কথা কহিতে পারিবে না। সীতারামেরও সে ভয় ছিল। সে যদি না পারে, তবে সকল দিক্ যাইবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

তখন সীতারাম ঘোষণা করিলেন যে, আমদরবারে গঙ্গারামের বিচার হইবে। রাজার আজ্ঞানুসারে সমস্ত নগরবাসী উপস্থিত হইয়া বিচার দর্শন করিবে। আজ্ঞা পাইয়া অবধারিত দিবসে, সহস্র সহস্র প্রজাবৃন্দ আসিয়া দরবার পরিপূর্ণ করিল। দিল্লীর অনুকরণে সীতারামও এক "দরবারে আম" প্রস্তুত করিয়াছিলেন। আজিকার দিন তাহা রাজকর্ম্মচারী-দিগের যত্নে সুসজ্জিত হইয়াছিল। দিল্লীর মত তাহার রূপার চাঁদোবা, মতির ঝালর ছিল না; কিন্তু তথাপি চন্দ্রাতপ পট্টবস্ত্রনির্ম্মিত, তাহাতে জরির কাজ। স্তম্ভ সকল সেইরূপ কারুকার্য্যখচিত পট্টবস্ত্রে আবৃত। নানাচিত্রবর্ণরঞ্জিত কোমল গালিচায় সভামণ্ডপ শোভিত, তাহার চারি পার্শ্বে বিচিত্রপরিচ্ছদধারী সৈনিকগণ সশস্ত্র শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান। বাহিরে অশ্বারূঢ় রক্ষিবর্গ শান্তি রক্ষা করিতেছে। সভামণ্ডপমধ্যে শ্বেতমর্ম্মরনির্ম্মিত উচ্চ বেদীর উপর সীতারামের জন্য স্বর্ণখচিত, রৌপ্যনির্ম্মিত, মুক্তাঝালরশোভিত সিংহাসন রক্ষিত হইয়াছে।

ক্রমে ক্রমে দুর্গ লোকারণ্য হইয়া উঠিল। সভামণ্ডপমধ্যে কেবল উচ্চ শ্রেণীর লোকেরাই স্থান পাইল। নিম্ন শ্রেণীর লোকে সহস্রে সহস্রে সভামণ্ডপ পরিবেষ্টিত করিয়া বাহিরে দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল।

বাতায়ন হইতে এই মহাসমারোহ দেখিতে পাইয়া মহারাজ্ঞী নন্দা দেবী রমাকে ডাকিয়া আনিয়া এই ব্যাপার দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন, এই সমারোহের মধ্যস্থানে দাঁড়াইয়া বলিতে পারিবে? সাহস হইতেছে ত?"

রমা। যদি আমার স্বামিপদে ভক্তি থাকে, তবে নিশ্চয় পারিব।

নন্দা। আমরা কেহ সঙ্গে যাইব? বল ত আমি যাই।

রমা। তুমিও কেন আমার সঙ্গে এ অসম্ভ্রমের সমুদ্রে ঝাঁপ দিবে? কাহাকে যাইতে হইবে না। কেবল একটা কাজ করিও। যখন আমার কথা কহিবার সময় হইবে, তখন যেন আমার ছেলেকে কেহ লইয়া গিয়া আমার নিকট দাঁড়ায়। তাহার মুখ দেখিলে আমার সাহস হইবে।

নন্দা স্বীকৃত হইয়া বলিল, "এখন সভামধ্যে যাইতে হইবে, একটু কাপড় চোপড় দুরস্ত করিয়া নাও। এই বেলা প্রস্তুত হও।"

রমা স্বীকৃত হইয়া আপনার মহলে গেল। সেখানে ঘর রুদ্ধ করিয়া মাটিতে পড়িয়া যুক্তকরে ডাকিতে লাগিল, "জয় লক্ষ্মীনারায়ণ! জয় জগদীশ্বর! আজিকার দিনে আমার যাহা বলিবার, তাহা বলিয়া, আমি যদি তার পর জন্মের মত বোবা হই, তাহাও আমি তোমার কাছে ভিক্ষা করি। আজিকার দিন সভামধ্যে আপনার কথা বলিয়া, আর কখনও ইহ জন্মে কথা না কই, তাও তোমার কাছে ভিক্ষা করি। আজিকার দিন মুখ রাখিও। তার পর মরণে আমার কোন দুঃখ থাকিবে না।"

তার পর বেশ পরিবর্ত্তনের কথাটা মনে পড়িল। রমা ধাত্রীদিগের একখানা সামান্য বস্ত্র চাহিয়া লইয়া, তাই পরিয়া সভামণ্ডপে যাইতে প্রস্তুত হইল। নন্দা দেখিয়া বলিল, "এ কি এ?"

রমা বলিল, "আজ আমার সাজিবার দিন নয়। বিধাতা যদি আবার কখন সাজিবার দিন দেন, তবে আবার সাজিব। নহিলে এই সাজাই শেষ। এই বেশেই সভায় যাইব।"

নন্দা বুঝিল, ইহা উপযুক্ত। আর কোন আপত্তি করিল না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

যথাকালে, মহারাজ সীতারাম রায় সভাস্থলে সিংহাসনে গিয়া বসিলেন। নকিব স্তুতিবাদ করিল, কিন্তু গীত বাদ্য সে দিন নিষেধ ছিল।

তখন শৃঙ্খলাবদ্ধ গঙ্গারাম সম্মুখে আনীত হইল। তাহাকে দেখিবার জন্য বাহিরে দণ্ডায়মান জনসমূহ বিচলিত ও উন্মুখ হইয়া উঠিল। শান্তিরক্ষকেরা তাহাদিগকে শান্ত করিল।

রাজা তখন গঙ্গারামকে গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "গঙ্গারাম! তুমি আমার কুটুম্ব, আত্মীয়, প্রজা এবং বেতনভোগী। আমি তোমাকে বিশেষ স্নেহ ও অনুগ্রহ করিতাম, তুমি বড় বিশ্বাসের পাত্র ছিলে, ইহা সকলেই জানে। একবার আমি তোমার প্রাণও রক্ষা করিয়াছি। তার পর, তুমি বিশ্বাসঘাতকতার কাজ করিলে কেন? তুমি রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইবে।"

গঙ্গারাম বিনীতভাবে বলিল, "কোন শত্রুতে আপনার কাছে আমার মিথ্যাপবাদ দিয়াছে। আমি কোন বিশ্বাসঘাতকতার কাজ করি নাই। মহারাজ স্বয়ং আমার বিচার করিতেছেন—ভরসা করি, ধর্ম্মশাস্ত্রসম্মত প্রমাণ না পাইলে আমার কোন দণ্ড করিবেন না।"

রাজা। তাহাই হইবে। ধর্ম্মশাস্ত্রসম্মত যে প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, তাহা শুন, আর যথাসাধ্য উত্তর দাও।

এই বলিয়া রাজা চন্দ্রচূড়কে অনুমতি করিলেন যে, "আপনি যাহা জানেন, তাহা ব্যক্ত করুন।"

তখন চন্দ্রচূড় যাহা জানিতেন, তাহা সবিস্তারে সভামধ্যে বিবৃত করিলেন। তাহাতে সভাস্থ সকলেরই হৃদয়ঙ্গম হইল যে, যে দিন মুসলমান, দুর্গ আক্রমণ করিবার জন্য নদী পার হইতেছিল, সে দিন চন্দ্রচূড়ের পীড়াপীড়ি সত্ত্বেও গঙ্গারাম দুর্গরক্ষার কোন চেষ্টা করেন নাই। চন্দ্রচূড়ের কথা সমাপ্ত হইলে, রাজা গঙ্গারামকে আজ্ঞা করিলেন, "নরাধম! ইহার কি উত্তর দাও?"

গঙ্গারাম যুক্তকরে বলিল, "ইনি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, ইনি যুদ্ধের কি জানেন? মুসলমান এ পারে আসেও নাই, দুর্গ আক্রমণও করে নাই। যদি তাহা করিত, আর আমি তাহাদের না হঠাইতাম, তবে ঠাকুর মহাশয় যাহা বলিয়াছেন, তাহা শিরোধার্য্য হইত। মহারাজ! দুর্গমধ্যে আমিও বাস করি। দুর্গের বিনাশে আমার কি লাভ?"

রাজা। কি লাভ, তাহা আর এক জনের নিকট শুন।

এই বলিয়া রাজা চাঁদশাহ ফকিরকে আজ্ঞা করিলেন, "আপনি যাহা জানেন, তাহা বলুন।"

চাঁদশাহ তখন দুর্গ আক্রমণের পূর্ব্ব রাত্রিতে তোরাব্ খাঁর নিকট গঙ্গারামের গমন-বৃত্তান্ত যাহা জানিতেন, তাহা বলিলেন। রাজা তখন গঙ্গারামকে আজ্ঞা করিলেন, "ইহার কি উত্তর দাও?"

গঙ্গারাম বলিল, "আমি সে রাত্রে তোরাব্ খাঁর নিকট গিয়াছিলাম বটে। বিশ্বাসঘাতক সাজিয়া, কুপথে আনিয়া, তাহাকে গড়ের নীচে আনিয়া টিপিয়া মারিব—আমার এই অভিপ্রায় ছিল।"

রাজা। সে জন্য তোরাব্ খাঁর কাছে কিছু পুরস্কার প্রার্থনা করিয়াছিলে?

গঙ্গারাম। নহিলে তাঁহার বিশ্বাস জন্মিবে কেন?

রাজা। কি পুরস্কার চাহিয়াছিলে?

গঙ্গারাম। অর্দ্ধেক রাজ্য।

রাজা। আর কিছু?

গঙ্গা। আর কিছু না।

তখন রাজা চাঁদশাহ ফকিরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি সে কথা কিছু জানেন?"

চাঁদশাহ। জানি।

রাজা। কি প্রকারে জানিলেন?

চাঁদ। আমি মুসলমান ফকির, তোরাব্ খাঁর কাছে যাতায়াত করিতাম। তিনিও আমাকে বিশেষ আদর করিতেন। আমি কখন তাঁহার কথা মহারাজের কাছে বলিতাম না, অথবা মহারাজের কথা তাঁহার কাছে বলিতাম না। এজন্য কোন পক্ষ বলিয়া গণ্য নহি। এখন তিনি গত হইয়াছেন, এখন ভিন্ন কথা। যে দিন তিনি মহারাজের হাতে হত হইয়া মধুমতীর তীর হইতে প্রস্থান করেন, সেই দিন তাঁহার সঙ্গে পথিমধ্যে আমার দেখা হইয়াছিল। তখন গঙ্গারামের বিশ্বাসঘাতকতা সম্বন্ধে তাঁহার সঙ্গে আমার কথাবার্ত্তা হইয়াছিল। গঙ্গারাম তাঁহাকে প্রতারণা করিয়াছে, এই বিবেচনায় তিনি আপনা হইতেই যে সকল কথা আমাকে বলিয়াছিলেন। গঙ্গারাম অর্দ্ধেক রাজ্য পুরস্কারস্বরূপ চাহিয়াছিল বটে, কিন্তু আরও কিছু চাহিয়াছিল। তবে সে কথা হুজুরে নিবেদন করিতে বড় ভয় পাই—অভয় ভিন্ন বলিতে পারি না।

রাজা। নির্ভয়ে বলুন।

চাঁদ। দ্বিতীয় পুরস্কার মহারাজের কনিষ্ঠা মহিষী।

দর্শকমণ্ডলী সমুদ্রবৎ গর্জ্জিয়া উঠিল—গঙ্গারামকে নানাবিধ গালি পাড়িতে লাগিল। শান্তিরক্ষকেরা শান্তি রক্ষা করিল। গঙ্গারাম বলিল, "মহারাজ! এ অতি অসম্ভব কথা। আমার নিজের পরিবার আছে—মহারাজের অবিদিত নাই। আর আমি নগররক্ষক—স্ত্রীলোকে আমার রুচি থাকিলে, আমার দুষ্প্রাপ্য বড় অল্প। আমি মহারাজের কনিষ্ঠা মহিষীকে কখনও দেখি নাই—কি জন্য তাঁহাকে কামনা করিব?"

রাজা। তবে তুমি কুকুরের মত রাত্রে লুকাইয়া আমার অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে কেন?

গঙ্গারাম। কখনও না।

তখন সেই পাঁড়েঠাকুর পাহারাওয়ালাকে তলব হইল। পাঁড়েঠাকুর, দাড়ি নাড়িয়া বলিলেন যে, গঙ্গারাম প্রত্যহ গভীর রাত্রিতে মুরলার সঙ্গে, তাহার ভাই পরিচয়ে অন্তঃপুরে যাতায়াত করিত।

শুনিয়া গঙ্গারাম বলিল, "মহারাজ! ইহা সম্ভব নহে। মুরলার ভাইকেই বা ঐ ব্যক্তি পথ ছাড়িয়া দিবে কেন?"

তখন পাঁড়েঠাকুর উত্তর করিলেন যে, তিনি গঙ্গারামকে বিলক্ষণ চিনিতেন; তবে কোতোয়ালকে তিনি রোখেন কি প্রকারে? এজন্য চিনিয়াও চিনিতেন না।

গঙ্গারাম দেখিল, ক্রমে গতিক মন্দ হইয়া আসিল। এক ভরসা মনে এই উদয় হইল, মুরলা নিজে কখনও এ সকল কথা প্রকাশ করিবে না—কেন না, তাহা হইলে সেও দণ্ডনীয়—তার কি আপনার প্রাণের ভয় নাই? তখন গঙ্গারাম বলিল, "মুরলাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করা হউক—কথা সকলই মিথ্যা প্রকাশ পাইবে।"

বেচারা জানিত না যে, মুরলাকে, মহারাজ্ঞী শ্রীমতী নন্দা ঠাকুরাণী পূর্ব্বেই হাত করিয়া রাখিয়াছিলেন। নন্দা, মুরলাকে বুঝাইয়াছিল যে, "মহারাজা স্ত্রীহত্যা করেন না—তোর মরিবার ভয় নাই। স্ত্রীলোককে শারীরিক কোন রকম সাজা দেন না। অতএব বড় সাজার তোর ভয় নাই। কিছু সাজা তোর হইবেই হইবে। তবে, তুই যদি সত্য কথা বলিস্—তোর সাজা বড় কম হবে।" মুরলাও তাহা বুঝিয়াছিল, সুতরাং সব কথা ঠিক বলিল—কিছুই ছাড়িল না।

মুরলার কথা গঙ্গারামের মাথায় বজ্রাঘাতের মত পড়িল। তথাপি সে আশা ছাড়িল না। বলিল, "মহারাজ! এ স্ত্রীলোক অতি কুচরিত্রা। আমি নগরমধ্যে ইহাকে অনেক বার ধরিয়াছি, এবং কিছু শাসনও করিতে হইয়াছিল। বোধ হয়, সেই রাগে এ সকল কথা বলিতেছে।"

রাজা। তবে কার কথায় বিশ্বাস করিব, গঙ্গারাম? খোদ মহারাণীর কথা বিশ্বাসযোগ্য কি?

গঙ্গারাম যেন হাঁত বাড়াইয়া স্বর্গ পাইল। তাহার নিশ্চিত বিশ্বাস যে, রমা কখনও এ সভামধ্যে আসিবে না বা এ সভায় এ সকল কথা বলিতে পারিবে না। গঙ্গারাম বলিল, "অবশ্য বিশ্বাসযোগ্য। তাঁর কথায় যদি আমি দোষী হই, আমাকে সমুচিত দণ্ড দিবেন।"

রাজা অন্তঃপুর অভিমুখে দৃষ্টি করিলেন। তখন গঙ্গারাম সবিস্ময়ে দেখিল, অতি ধীরে ধীরে সশঙ্কিত শিশুর মত, এক মলিনবেশধারিণী অবগুণ্ঠনবতী রমণী সভামধ্যে আসিতেছে। যে রূপ, গঙ্গারামের হাড়ে হাড়ে আঁকা, তাহা দেখিয়াই চিনিল। গঙ্গারাম বড় শঙ্কিত হইল। দর্শকমণ্ডলীমধ্যে মহা কোলাহল পড়িয়া গেল। শান্তিরক্ষকেরা তাহাদের থামাইল।

রমা আসিয়া আগে রাজাকে, পরে গুরু চন্দ্রচূড়কে দূর হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া, অবগুণ্ঠন মোচন করিয়া সর্ব্বসমক্ষে দাঁড়াইল—মলিন বেশেও রূপরাশি উছলিয়া পড়িতে লাগিল। চন্দ্রচূড় দেখিল, রাজা কথা কহিতে পারিতেছেন না—অধোবদনে আছেন। তখন চন্দ্রচূড় রমাকে বলিলেন, "মহারাণী! এই গঙ্গারামের বিচার হইতেছে। এ ব্যক্তি কখন আপনার অন্তঃপুরে গিয়াছিল কি না, গিয়া থাকে, তবে কেন গিয়াছিল, আপনার সঙ্গে কি কি কথা হইয়াছিল, সব স্বরূপ বলুন। রাজার আজ্ঞা, আর আমি তোমার গুরু, আমারও আজ্ঞা, সকল কথা সত্য বলিবে।"

রমা গ্রীবা উন্নত করিয়া গুরুকে বলিল, "রাজার রাণীতে কখনও মিথ্যা বলে না। আমরা যদি মিথ্যাবাদিনী হইতাম, তবে এই সিংহাসন এত দিন ভাঙ্গিয়া গুঁড়া হইয়া যাইত।"

দর্শকমণ্ডলী বাহির হইতে জয়ধ্বনি দিল—"জয় মহারাণীজিকী!"

রমা সাহস পাইয়া বলিতে লাগিল, "বলিব কি গুরুদেব! আমি রাজার মহিষী—রাজার ভৃত্য, আমার ভৃত্য—আমি যে আজ্ঞা করিব—রাজার ভৃত্য তা কেন পালন করিবে না? আমি রাজকার্য্যের জন্য কোতোয়ালকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছিল্যাম—কোতোয়াল আসিয়া আজ্ঞা শুনিয়া গিয়াছিল—তার আর বিচারই বা কেন, আমি বলিবই বা কি?"

কথা শুনিয়া দর্শকমণ্ডলী এবার আর জয়ধ্বনি করিল না—অনেকে বিষণ্ণ হইল—অনেকে বলিল, "কবুল।" চন্দ্রচূড় বলিলেন, "এমন কি রাজকার্য্য মা! যে, রাত্রিতে কোতোয়ালকে ডাকিতে হয়?"

রমা তখন বলিল, "তবে সকল কথা শুনুন।" এই বলিয়া রমা দেখিল, পুত্র কোথা? পুত্র সুসজ্জিত হইয়া ধাত্রীক্রোড়ে। মুখ দেখিয়া সাহস পাইল। তখন রমা সবিশেষ বলিতে আরম্ভ করিল।

প্রথমে অতি ধীরে ধীরে, অতি দূরাগত সঙ্গীতের মত, রমা বলিতে লাগিল—সকলে শুনিতে পাইল না। বাহিরের দর্শকমণ্ডলী বলিতে লাগিল, "মা! আমরা শুনিতে পাইতেছি

না—আমরা শুনিব।” রমা আরও একটু স্পষ্ট বলিতে লাগিল। ক্রমে আরও স্পষ্ট—আরও স্পষ্ট। তার পর যখন রমা পুত্রের বিপদ্ শঙ্কায় এই সাহসের কাজ করিয়াছিল, এই কথা বুঝাইতে লাগিল—যখন একবার একবার সেই চাঁদমুখ দেখিতে লাগিল, আর অশ্রুপরিপ্লুত হইয়া, মাতৃস্নেহের উচ্ছ্বাসের উপর উচ্ছ্বাস, তরঙ্গের উপর তরঙ্গ তুলিতে লাগিল—তখন পরিষ্কার স্বর্গীয়, অপ্সরোনিন্দিত তিন গ্রাম সংমিলিত মনোমুগ্ধকর সঙ্গীতের মত শ্রোতৃগণের কর্ণে সেই মুগ্ধকর বাক্য বাজিতে লাগিল। সকলে মুগ্ধ হইয়া শুনিতে লাগিল। তার পর সহসা রমা, ধাত্রীক্রোড় হইতে শিশুকে কাড়িয়া লইয়া, সীতারামের পদতলে তাহাকে ফেলিয়া দিয়া, যুক্তকরে বলিতে লাগিল, “মহারাজ! আপনার আরও সন্তান আছে—আমার আর নাই। মহারাজ! আপনার রাজ্য আছে—আমার রাজ্য এই শিশু। মহারাজ! তোমার ধর্ম্ম আছে, কর্ম্ম আছে, যশ আছে, স্বর্গ আছে—আমি মুক্ত কণ্ঠে বলিতেছি, আমার ধর্ম্ম এই, কর্ম্ম এই, যশ এই, স্বর্গ এই—মহারাজ! অপরাধিনী হইয়া থাকি, তবে দণ্ড করুন—” শুনিয়া দর্শকমণ্ডলী অশ্রুপূর্ণ হইয়া পুনঃ পুনঃ জয়ধ্বনি করিতে লাগিল। কিন্তু লোক ভাল মন্দ দুই রকমই আছে—অনেকেই জয়ধ্বনি করিতে লাগিল—কিন্তু আবার অনেকেই তাহাতে যোগ দিল না। জয়ধ্বনি ফুরাইলে তাহারা কেহ অর্দ্ধস্ফুট স্বরে বলিল, “আমার ত এ কথায় বিশ্বাস হয় না।” কোন বর্ষীয়সী বলিল, “পোড়া কপাল! রাত্রে মানুষ ডাকিয়া নিয়া গিয়াছেন—উনি আবার সতী!” কেহ বলিল, “রাজা এ কথায় ভুলেন ভুলুন—আমরা এ কথায় ভুলিব না।” কেহ বলিল, “রাণী হইয়া যদি উনি এই কাজ করিবেন, তবে আমরা গরিব দুঃখী কি না করিব?”

এ সকল কথা সীতারামের কাণে গেল। তখন রাজা রমাকে বলিলেন, “প্রজাবর্গ সকলে ত তোমার কথা বিশ্বাস করিতেছে না।”

রমা কিছুক্ষণ মুখ অবনত করিয়া রহিল। চক্ষুতে প্রবল বারিধারা বহিল—তার পর রমা সামলাইল। তখন মুখ তুলিয়া রাজাকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিল, “যখন লোকের বিশ্বাস হইল না, তখন আমার একমাত্র গতি—আপনার রাজপুরীর কলঙ্কস্বরূপ এ জীবন আর রাখিতে পারিব না। আপনি চিতা প্রস্তুত করিতে আজ্ঞা দিন—আমি সকলের সম্মুখেই পুড়িয়া মরি। দুঃখ তাহাতে কিছু নাই। লোকে আমাকে কলঙ্কিনী বলিল—মরিলেই সে দুঃখ গেল। কিন্তু এক নিবেদন মহারাজ! আপনিও কি আমাকে অবিশ্বাসিনী ভাবিতেছেন? তাহা হইলে বুঝি—(আবার রমার চক্ষুতে জলের ধারা ছুটিল,)—বুঝি আমার পুড়িয়া মরাও বৃথা হইবে। তুমি যদি এই লোকসমারোহের সম্মুখে বল যে, আমার প্রতি তোমার অবিশ্বাস নাই—তাহা হইলে আমি সেই চিতাই স্বর্গ মনে করিব। মহারাজ! পরলোকের উদ্ধারকর্ত্তা, ভূদেব তুল্য আমার গুরুদেব এই সম্মুখে।

আমি তাঁহার সম্মুখে, ইষ্টদেবকে সাক্ষী করিয়া বলিতেছি, আমি অবিশ্বাসিনী নহি। যিনি গুরুর অপেক্ষাও আমার পূজ্য, যিনি মনুষ্য হইয়াও দেবতার অপেক্ষা আমার পূজ্য, সেই পতিদেবতা, আপনি স্বয়ং আমার সম্মুখে—আমি পতিদেবতাকে সাক্ষী করিয়া বলিতেছি, আমি অবিশ্বাসিনী নহি। মহারাজ! এই নারীদেহ ধারণ করিয়া যে কিছু দেবসেবা, ব্রাহ্মণসেবা, দান ব্রত নিয়ম করিয়াছি, যদি আমি বিশ্বাসঘাতিনী হইয়া থাকি, তবে সে সকলেরই ফলে যেন বঞ্চিত হই। পতিসেবার অপেক্ষা স্ত্রীলোকের আর পুণ্য নাই, কায়মনোবাক্যে আমি যে আপনার চরণসেবা করিয়াছি, তাহা আপনিই জানেন,—আমি যদি অবিশ্বাসিনী হইয়া থাকি, তবে আমি যেন সে পুণ্যফলে বঞ্চিত হই। আমি ইহজীবনে যে কিছু আশা, যে কিছু ভরসা, যে কিছু কামনা, যে কিছু মানস করিয়াছি,—আমি যদি অবিশ্বাসিনী হইয়া থাকি, সকলই যেন নিষ্ফল হয়। মহারাজ! নারীজন্মে স্বামিসন্দর্শনের তুল্য পুণ্যও নাই, সুখও নাই—যদি আমি অবিশ্বাসিনী হইয়া থাকি, যেন ইহজন্মে আমি সে সুখে চিরবঞ্চিত হই। যে পুত্রের জন্য আমি এই কলঙ্ক রটাইয়াছি—যাহার তুলনায় জগতে আমার আর কিছুই নাই—যদি আমি অবিশ্বাসিনী হই, আমি যেন সেই পুত্রমুখদর্শনে চিরবঞ্চিত হই। মহারাজ! আর কি বলিব—যদি আমি অবিশ্বাসিনী হইয়া থাকি, তবে জন্মে জন্মে যেন নারীজন্ম গ্রহণ করিয়া, জন্মে জন্মে স্বামিপুত্রের মুখদর্শনে চিরবঞ্চিত হই।”

রমা আর বলিতে পারিল না—ছিন্ন লতার মত সভাতলে পড়িয়া গিয়া মূর্চ্ছিতা হইল—ধাত্রীগণে ধরাধরি করিয়া অন্তঃপুরে বহিয়া লইয়া গেল। ধাত্রীক্রোড়স্থ শিশু মার সঙ্গে সঙ্গে কাঁদিতে কাঁদিতে গেল; সভাতলস্থ সকলে অশ্রুমোচন করিল। গঙ্গারামের করচরণস্থিত শৃঙ্খলে ঝঞ্জনা বাজিয়া উঠিল। দর্শকমণ্ডলী বাত্যাপীড়িত সমুদ্রের ন্যায় চঞ্চল হইয়া মহান্ কোলাহল সমুত্থিত করিল—রক্ষিবর্গ কিছুই নিবারণ করিতে পারিল না।

তখন “গঙ্গারাম কি বলে?” “গঙ্গারাম কি এ কথা মিছা বলে?” “গঙ্গারাম যদি মিছা বলে, তবে আইস, আমরা সকলে মিলিয়া গঙ্গারামকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলি।” এইরূপ রব চারি দিক্ হইতে উঠিতে লাগিল। গঙ্গারাম দেখিল, এই সময়ে লোকের মন ফিরাইতে না পারিলে, তাহার আর রক্ষা নাই। গঙ্গারাম বুদ্ধিমান্, বুঝিয়াছিল যে, প্রজাবর্গ যেমন নিষ্পত্তি করিবে, রাজাও সেই মত করিবেন। তখন সে রাজাকে সম্বোধন করিয়া লোকের মনভুলান কথা বলিতে আরম্ভ করিল, “মহারাজ! কথাটা এই যে, স্ত্রীলোকের কথায় বিশ্বাস করিবেন—না আমার কথায় বিশ্বাস করিবেন? প্রভু! আপনার এই রাজ্য কি স্ত্রীলোকে সংস্থাপিত করিয়াছে—না আমার ন্যায় রাজভৃত্যদিগের বাহুবলে স্থাপিত হইয়াছে? মহারাজ! সকল স্ত্রীলোকেই বিপথগামিনী হইতে পারে, রাজরাণীরাও বিপথগামিনী হইয়া

থাকেন; রাজরাণী বিপথগামিনী হইলে রাজার কর্ত্তব্য যে, তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন। বিশ্বাসী ভৃত্য কখনও বিপথগামী হয় না; তবে স্ত্রীলোকে আপনার দোষ ক্ষালন জন্য ভৃত্যের ঘাড়ে চাপ দিতে পারে। এই মহারাণী রাত্রিতে কাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া আমাকে দোষী করিতেছেন, তাহার স্থিরতা—মহারাজ, রক্ষা কর! রক্ষা কর!"

কথা কহিতে কহিতে গঙ্গারাম কথা সমাপ্ত না করিয়া,—অতিশয় ভীত হইয়া, "মহারাজ, রক্ষা কর! রক্ষা কর!" এই শব্দ করিয়া স্তম্ভিত বিহ্বলের মত হইয়া নীরব হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সকলে দেখিল, গঙ্গারাম থর থর কাঁপিতেছে। তখন সমস্ত জনমণ্ডলী সবিস্ময়ে সভয়ে চাহিয়া দেখিল—অপূর্ব্বমূর্ত্তি! জটাজূটবিলম্বিনী, গৈরিকধারিণী, জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি, সাক্ষাৎ সিংহবাহিনী দুর্গা তুল্য, ত্রিশূল হস্তে, গঙ্গারামকে ত্রিশূলাগ্রভাগে লক্ষ্য করিয়া, প্রখরগমনে তাহার অভিমুখে সভামণ্ডপ পার হইয়া আসিতেছে। দেখিবামাত্র সেই সাগরবৎ সংক্ষুব্ধ জনমণ্ডলী একেবারে নিস্তব্ধ হইল। গঙ্গারাম একদিন রাত্রিতে সে মূর্ত্তি দেখিয়াছিল—আবার এই বিপৎকালে, যখন মিথ্যা প্রবঞ্চনার দ্বারা নিরপরাধিনী রমার সর্ব্বনাশ করিতে সে উদ্যত, সেই সময়ে সেই মূর্ত্তি দেখিয়া, চণ্ডী তাহাকে বধ করিতে আসিতেছেন বিবেচনা করিয়া, ভয়ে কাতর হইয়া "রক্ষা কর! রক্ষা কর!" শব্দ করিয়া উঠিল। এ দিকে রাজা, ও দিকে চন্দ্রচূড়, সেই রাত্রিদৃষ্ট দেবীতুল্য মূর্ত্তি দেখিয়া চিনিলেন, এবং নগরের রাজলক্ষ্মী মনে করিয়া সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করিলেন। তখন সভাস্থ সকলেই গাত্রোত্থান করিল।

জয়ন্তী কোন দিকে দৃষ্টি না করিয়া, খরপদে গঙ্গারামের নিকট আসিয়া, গঙ্গারামের বক্ষে সেই মন্ত্রপূত ত্রিশূলাগ্রভাগ স্থাপন করিল। কথার মধ্যে কেবল বলিল, "এখন বল।"

ত্রিশূল গঙ্গারামের গাত্র স্পর্শ করিল মাত্র, তথাপি গঙ্গারামের শরীর হঠাৎ অবসন্ন হইয়া আসিল, গঙ্গারাম মনে করিল, আর একটি মিথ্যা কথা বলিলেই এই ত্রিশূল আমার হৃদয়ে বিদ্ধ হইবে। গঙ্গারাম তখন সভয়ে, বিনীতভাবে, সত্য বৃত্তান্ত সভাসমক্ষে বলিতে আরম্ভ করিল। যতক্ষণ না তাহার কথা সমাপ্ত হইল, ততক্ষণ জয়ন্তী তাহার হৃদয় ত্রিশূলাগ্রভাগের দ্বারা স্পর্শ করিয়া রহিল। গঙ্গারাম তখন রমার নির্দ্দোষিতা, আপনার মোহ, লোভ, ফৌজদারের সহিত সাক্ষাৎ, কথোপকথন এবং বিশ্বাসঘাতকতার চেষ্টা সমুদায় সবিস্তারে কহিল।

জয়ন্তী তখন ত্রিশূল লইয়া খরপদে চলিয়া গেল। গমনকালে সভাস্থ সকলেই নতশিরে সেই দেবীতুল্য মূর্ত্তিকে প্রণাম করিল। সকলেই ব্যস্ত হইয়া পথ ছাড়িয়া দিল। কেহ কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে বা তাহার অনুসরণ করিতে সাহস পাইল না। সে কোন্ দিকে কোথায় চলিয়া গেল, কেহ সন্ধান করিল না।

জয়ন্তী চলিয়া গেলে রাজা, গঙ্গারামকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "এখন তুমি আপন মুখে সকল অপরাধ স্বীকৃত হইলে। এরূপ কৃতঘ্নের মৃত্যু ভিন্ন অন্য দণ্ড উপযুক্ত নহে। অতএব তুমি রাজদণ্ডে প্রাণত্যাগ করিতে প্রস্তুত হও।"

গঙ্গারাম দ্বিরুক্তি করিল না। প্রহরীরা তাহাকে লইয়া গেল। বধদণ্ডের আজ্ঞা শুনিয়া সকল লোক স্তম্ভিত হইয়াছিল। কেহ কিছু বলিল না। নীরবে সকলে আপনার ঘরে ফিরিয়া গেল। গৃহে গিয়া সকলেই রমাকে "সাক্ষাৎ লক্ষ্মী" বলিয়া প্রশংসা করিল। রমার আর কোন কলঙ্ক রহিল না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

রাজা মুরলাকে মাথা মুড়াইয়া, ঘোল ঢালিয়া, নগরের বাহির করিয়া দিবার আদেশ কবিলেন। সে হুকুম তখনই তামিল হইল। মুবলার নির্গমনকালে এক পাল ছেলে, এবং অন্যান্য রসিক লোক দল বাঁধিয়া করতালি দিতে দিতে এবং গীত গায়িতে গায়িতে চলিল।

গঙ্গারামের ন্যায় কৃতঘ্নের পক্ষে, শূলদণ্ড ভিন্ন অন্য দণ্ড তখনকার রাজনীতিতে ব্যবস্থিত ছিল না। অতএব তাহার প্রতি সেই আজ্ঞাই হইল। কিন্তু গঙ্গারামের মৃত্যু আপাততঃ দিনকতক স্থগিত রাখিতে হইল। কেন না, সম্মুখে রাজার অভিষেক উপস্থিত। সীতারাম নিজ বাহুবলে হিন্দুরাজ্য স্থাপন করিয়া রাজা হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহার অভিষেক হয় নাই। হিন্দুশাস্ত্রানুসারে তাহা হওয়া উচিত। চন্দ্রচূড় ঠাকুর এই প্রসঙ্গ উত্থাপিত করিলে, সীতারাম তাহাতে সম্মত হইয়াছিলেন। তিনি বিবেচনা করিলেন, এরূপ একটা মহোৎসবের দ্বারা প্রজাবর্গ পরিতুষ্ট হইলে তাহাদের রাজভক্তি বৃদ্ধি পাইতে পারে। অতএব বিশেষ সমারোহের সহিত অভিষেক কার্য্য সম্পন্ন করিবার কল্পনা হইতেছিল। নন্দা এবং চন্দ্রচূড়, উভয়েই এক্ষণে সীতারামকে অনুরোধ করিলেন যে, এখন একটা মাঙ্গলিক ক্রিয়া উপস্থিত, এখন গঙ্গারামের বধরূপ অশুভ কর্ম্মটা করা বিধেয় নহে; তাহাতে অমঙ্গলও যদি না হয়, লোকের আনন্দেরও লাঘব হইতে পারে। এ কথায় রাজা সম্মত হইলেন। ভিতরের আসল কথা এই যে, গঙ্গারামকে শূলে দিতে সীতারামেব আন্তরিক ইচ্ছা নহে, তবে রাজধর্ম্ম পালন এবং রাজ্য শাসন জন্যই অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া তাহা স্থির করিয়াছিলেন। ইচ্ছা ছিল না, তাহার কারণ—গঙ্গারাম শ্রীর ভাই। শ্রীকে সীতারাম ভুলেন নাই, তবে এত দিন ধরিয়া তাহাকে খুঁজিয়া না পাইয়া, নিরাশ হইয়া বিষয়কর্ম্মে চিত্তনিবেশ করিয়া শ্রীকে ভুলিবেন, ইহা স্থির করিয়াছিলেন। অতএব আবার রাজ্যের উপর তিনি মন স্থির

করিতেছিলেন। সেই জন্যই দিল্লীতে গিয়া, বাদশাহের দরবারে হাজির হইয়াছিলেন। এবং বাদশাহকে সন্তুষ্ট করিয়া সনদ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। সেই জন্য উৎসাহ সহকারে সংগ্রাম করিয়া ভূষণা অধিকার করিয়াছিলেন, এবং দক্ষিণ বাঙ্গালায় এক্ষণে একাধিপত্য প্রচার কবিতেছিলেন। কিন্তু শ্রী এখনও হৃদয়ের সম্পূর্ণ অধিকারিণী। অতএব গঙ্গারামের শূলে যাওয়া এখন স্থগিত রহিল।

এ দিকে অভিষেকের বড় ধুম পড়িয়া গেল। অত্যন্ত সমারোহ—অত্যন্ত গোলযোগ, দেশ বিদেশ হইতে লোক আসিয়া নগর পরিপূর্ণ করিল—রাজা, বাজপুরুষ, ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত, অধ্যাপক, দৈবজ্ঞ, ইতর, ভদ্র, আহূত, অনাহূত, রবাহুত, ভিক্ষুক, সন্ন্যাসী, সাধু, অসাধুতে নগরে আর স্থান হয় না। এই অসংখ্য জনমণ্ডলের কর্ম্মের মধ্যে প্রতিনিয়ত আহার। ভক্ষ্য ভোজ্য লুচি সন্দেশ দধির ছড়াছড়িতে সহরে এক হাঁটু কাদা হইয়া উঠিল, পাতা কাটার জ্বালায় সীতাবামের রাজ্যের সব কলাগাছ নিষ্পত্র হইল, ভাঙ্গা ভাঁড় ও ছেঁড়া কলাপাতে গড়খাই ও মধুমতী বুজিয়া উঠিবার গোছ হইয়া উঠিল। অহরহ বাদ্য ও নৃত্য গীতের দৌরাত্ম্যে ছেলেদের পর্য্যন্ত মাথা গরম হইয়া উঠিল।

. এই অভিষেকের মধ্যে একটা ব্যাপার দান। সীতারাম অভিষেকের দিনে সমস্ত দিবস, কখনও স্বহস্তে, কখনও আপন কর্ত্তৃত্বাধীনে ভৃত্যহস্তে, সুবর্ণ, রজত, তৈজস, এবং বস্ত্রদান করিতে লাগিলেন। এত লোক আসিয়াছিল যে, সমস্ত দিনে দান ফুরাইল না। অর্দ্ধবাত্র পর্য্যন্ত এইরূপ দান করিয়া সীতারাম আর পারিয়া উঠিলেন না। অবশিষ্ট লোকের বিদায় জন্য রাজপুরুষদিগের উপর ভার দিয়া অন্তঃপুরে বিশ্রামার্থ চলিলেন। যাইতে সভয়ে, সবিস্ময়ে, অন্তঃপুরদ্বারে দেখিলেন যে, সেই ত্রিশূলধারিণী সুবর্ণময়ী রাজলক্ষ্মীমূর্ত্তি।

রাজা ভক্তিভাবে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "মা। আপনি কে, আমাকে দয়া করিয়া বলুন।"

জয়ন্তী বলিল, "মহারাজ! আমি ভিখারিণী। আপনার নিকট ভিক্ষার্থ আসিয়াছি।"

রাজা। মা! কেন আমায় ছলনা করেন? আপনি দেবী, আমি চিনিয়াছি। আপনি সাক্ষাৎ কমলা—আমার প্রতি প্রসন্ন হউন।

জয়ন্তী। মহারাজ! আমি সামান্য মানুষী। নহিলে আপনার নিকট ভিক্ষার্থ আসিতাম না। শুনিলাম, আজ যে যাহা চাহিতেছে, আপনি তাহাকে তাই দিতেছেন। আমার আশা বড়, কিন্তু যার এমন দান, তার কাছে আশা নিষ্ফলা হইবে না মনে করিয়া আসিয়াছি।

রাজা বলিলেন, "মা, আপনাকে অদেয় আমার কিছুই নাই। আপনি একবার আমার রাজ্য রক্ষা করিয়াছেন, দ্বিতীয় বারে আমার কুলমর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছেন, আপনি

দেবীই হউন, আর মানবীই হউন—আপনাকে সকলই আমার দেয়। কি বস্তু কামনা করেন, আজ্ঞা করুন, আমি এখনই আনিয়া উপস্থিত করিতেছি।”

জয়ন্তী। মহারাজ! গঙ্গারামের বধদণ্ডের বিধান হইয়াছে। কিন্তু এখনও সে মরে নাই। আমি তার জীবন ভিক্ষা করিতে আসিয়াছি।

রাজা। আপনি!

জয়ন্তী। কেন মহারাজ? অসম্ভাবনা কি?

রাজা। গঙ্গারাম কীটাণুকীট—আপনার তার প্রতি দয়া কিসে হইল?

জয়ন্তী। আমরা ভিখারী—আমাদের কাছে সবাই সমান।

রাজা। কিন্তু আপনিই ত তাহাকে ত্রিশূল বিঁধিয়া মারিতে চাহিয়াছিলেন—আপনা হইতেই তুই বার তাহার অসদভিসন্ধি ধরা পড়িয়াছে। বলিতে কি, আপনি মহারাণীর প্রতি দয়াবতী না হইলে সে সত্য স্বীকার করিত না, তাহার বধদণ্ড হইত না। এখন তাহার অন্যথা করিতে চান কেন?

জয়ন্তী। মহারাজ! আমা হইতে ইহা ঘটিয়াছে বলিয়াই তাহার প্রাণভিক্ষা চাহিতেছি। ধর্ম্মের উদ্ধার জন্য ত্রিশূলাঘাতে অধর্ম্মাচারীর প্রাণবিনাশেও দোষ বিবেচনা করি না, কিন্তু ধর্ম্মের এখন রক্ষা হইয়াছে, এখন প্রাণিহত্যা-পাপ হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছি। গঙ্গারামের জীবন আমাকে ভিক্ষা দিন।

রাজা। আপনাকে অদেয় কিছুই নাই। আপনি যাহা চাহিলেন, তাহা দিলাম। গঙ্গারাম এখনই মুক্ত হইবে। কিন্তু মা! তোমাকে ভিক্ষা দিই, আমি তাহার যোগ্য নহি। আমি তোমায় ভিক্ষা দিব না। গঙ্গারামের জীবন তোমাকে বেচিব—মূল্য দিয়া কিনিতে হইবে।

জয়ন্তী। (ঈষৎ হাস্যের সহিত) কি মূল্য মহারাজ! রাজভাণ্ডারে এমন কোন্ ধনের অভাব যে, ভিখারিণী তাহা দিতে পারিবে?

রাজা। রাজভাণ্ডারে নাই—রাজার জীবন। আপনি সেই মধুমতীতীরে ঘাটের উপর কামানের নিকট দাঁড়াইয়া স্বীকার করিয়াছিলেন যে, আমি যাহা খুঁজি, তাহা পাইব। সে অমূল্য সামগ্রী আমাকে দিন—সেই মূল্যে আজ গঙ্গারামের জীবন আপনার নিকট বেচিব।

জয়ন্তী। কি সে অমূল্য সামগ্রী মহারাজ? আপনি রাজ্য পাইয়াছেন।

রাজা। যাহার জন্য রাজ্য ত্যাগ করিতে পারি, তাই চাহিতেছি।

জয়ন্তী। সে কি মহারাজ?

রাজা। শ্রী নামে আমার প্রথমা মহিষী আমার জীবনস্বরূপ। আপনি দেবী, সব দিতে পারেন। আমার জীবন আমায় দিয়া, সেই মূল্যে গঙ্গারামের জীবন কিনিয়া লউন।

জয়ন্তী। সে কি মহারাজ! আপনার ন্যায় ধর্ম্মাত্মা রাজাধিরাজের জীবনের সঙ্গে সেই নরাধম পাপাত্মার জীবনের কি বিনিময় হয়? মহারাজ! কাণা কড়ির বিনিময়ে রত্নাকর?

রাজা। মা! জননী যত দেন, ছেলে কি মাকে কখনও তত দিতে পারে!

জয়ন্তী। মহারাজ! আপনি আজ অন্তঃপুরদ্বার সকল মুক্ত রাখিবেন; আর অন্তঃপুরের প্রহরীদিগকে আজ্ঞা দিবেন, ত্রিশূল দেখিলে যেন পথ ছাড়িয়া দেয়। আপনার শয্যাগৃহে আজ রাত্রিতেই মূল্য পৌঁছিবে। গঙ্গারামের মুক্তির হুকুম হৌক।

রাজা হর্ষে অভিভূত হইয়া বলিলেন, "গঙ্গারামের এখনই মুক্তি দিতেছি।" এই বলিয়া অনুচরবর্গকে সেইরূপ আজ্ঞা দিলেন।

জয়ন্তী বলিলেন, "আমি এই অনুচরদিগের সঙ্গে গঙ্গারামের কারাগারে যাইতে পারি কি?"

রাজা। আপনি যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন, কিছুতেই আপনার নিষেধ নাই।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

অন্ধকারে কূপের ন্যায় নিম্ন, আর্দ্র, বায়ুশূন্য কারাগৃহমধ্যে, গঙ্গারাম শৃঙ্খলবদ্ধ হইয়া একা পড়িয়া আছে। সেই নিশীথকালেও তাহার নিদ্রা নাই—যে পর্য্যন্ত সে শুনিয়াছে যে, তাহাকে শূলে যাইতে হইবে, সেই পর্য্যন্ত আর সে ঘুমায় নাই—আহার নিদ্রা সকলই বন্ধ। এক দণ্ডে মবা যায়, মৃত্যু তত বড় কঠিন দণ্ড নহে; কিন্তু কারাগৃহে একাকী পড়িয়া দিবারাত্র সম্মুখেই মৃত্যুদণ্ড, ইতি ভাবনা করার অপেক্ষা গুরুতর দণ্ড আর কিছুই নাই। গঙ্গারাম পলকে পলকে শূলে যাইতেছিল। দণ্ডের আর তাহার কিছু অধিক বাকি নাই। ভাবিয়া ভাবিয়া, চিত্তবৃত্তি সকল প্রায় নির্ব্বাপিত হইয়াছিল। মন অন্ধকারে ডুবিয়া রহিয়াছিল—ক্লেশ অনুভব করিবার শক্তি পর্য্যন্ত যেন তিরোহিত হইয়াছিল। মনের মধ্যে কেবল দুটি ভাব এখনও জাগরিত ছিল—ভৈরবীকে ভয়, আর রমার উপর রাগ। ভয়ের অপেক্ষা, এই রাগই প্রবল। গঙ্গারাম, আর রমার প্রতি আসক্ত নহে, এখন রমার তেমন আন্তরিক শত্রু আর কেহ নহে।

গঙ্গারাম এখন রমাকে সম্মুখে পাইলে নখে বিদীর্ণ করিতে প্রস্তুত। গঙ্গারামের যখন কিছু চিন্তাশক্তি হইল, তখন কি উপায়ে মরিবার সময়ে রমার সর্ব্বনাশ করিয়া মরিতে পারিবে, গঙ্গারাম তাহাই ভাবিতেছিল। শূলতলে দাঁড়াইয়া রমার সম্বন্ধে কি অশ্লীল অপবাদ দিয়া যাইবে, গঙ্গারাম তাহাই কখন কখন ভাবিত। অন্য সময়ে জড়পিণ্ডের মত স্তম্ভিত হইয়া পড়িয়া থাকিত। কেবল মধ্যে মধ্যে বাহিরে অভিষেকের উৎসবের মহৎ

কোলাহল শুনিত। যে পাচক ব্রাহ্মণ প্রত্যহ তাহার নুন ভাত লইয়া আসিত, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া গঙ্গারাম উৎসবের বৃত্তান্ত শুনিয়াছিল। শুনিল যে, রাজ্যের সমস্ত লোক অতি বৃহৎ উৎসবে নিমগ্ন—কেবল সেই একা অন্ধকারে আর্দ্র ভূমিতে মূষিকদষ্ট হইয়া, কীটপতঙ্গপীড়িত হইয়া, শৃঙ্খলভার বহন করিতেছে। মনে মনে বলিতে লাগিল, রমার কবে এই রকম স্থান মিলিবে!

যেমন অন্ধকারে বিদ্যুৎ জ্বলে, তেমনি গঙ্গারামের একটা কথা মনে পড়িত, যদি শ্রী বাঁচিয়া থাকিত। শ্রী একবার প্রাণভিক্ষা করিয়া লইয়াছিল, আবার ভিক্ষা চাহিলে কি ভিক্ষা পাইত না। আমি যত পাপী হই না কেন, শ্রী কখনও আমাকে পরিত্যাগ করিত না। এমন ভগিনীও মরিল।

দুই প্রহর রাত্রিতে ঝঞ্জনা বাজাইয়া কারাগৃহের বাহিরের শিকল খুলিল। গঙ্গারামের প্রাণ শুকাইল—এত রাত্রিতে কেন শিকল খুলিতেছে। আরও কিছু নূতন বিপদ্ আছে না কি?

অগ্রে রাজপুরুষেরা প্রদীপ লইয়া প্রবেশ করিল। গঙ্গারাম স্তম্ভিত হইয়া তাহাদের প্রতি চাহিয়া রহিল। কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না। তাহার পর জয়ন্তীকে দেখিল—উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া বলিল, "রক্ষা কর! রক্ষা কর! আমি কি করিয়াছি?"

জয়ন্তী বলিল, "বাছা! কি করিয়াছ তাহা জান। কিন্তু তুমি রক্ষা পাইবে। শ্রীকে মনে আছে কি?"

গঙ্গা। শ্রী! যদি শ্রী বাঁচিয়া থাকিত!

জয়ন্তী। শ্রী বাঁচিয়া আছে। তার অনুরোধে আমি মহারাজের কাছে তোমার জীবন ভিক্ষা চাহিয়াছিলাম। ভিক্ষা পাইয়াছি। তোমাকে মুক্ত কবিতে আসিয়াছি। পলাও গঙ্গারাম! কাল প্রভাতে এ রাজ্যে আর মুখ দেখাইও না। দেখাইলে আর তোমাকে বাঁচাইতে পারিব না।

গঙ্গারাম বুঝিতে পারিল কি না, সন্দেহ। বিশ্বাস করিল না, ইহা নিশ্চিত। কিন্তু দেখিল যে, রাজপুরুষেরা বেড়ী খুলিতে লাগিল। গঙ্গারাম নীরবে দেখিতে লাগিল। জিজ্ঞাসা করিল, "মা! রক্ষা করিলে কি?"

জয়ন্তী বলিলেন, "বেড়ী খুলিয়াছে। চলিয়া যাও।"

গঙ্গারাম ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল। সেই রাত্রিতেই নগর ত্যাগ করিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

গঙ্গারামের মুক্তির আজ্ঞা প্রচার করিয়া, জয়ন্তীর আজ্ঞা মত দ্বার মুক্ত রাখিবার অনুমতি প্রচার করিয়া, রাজা শয্যাগৃহে আসিয়া পর্য্যঙ্কে শয়ন করিলেন। নন্দা তখনই আসিয়া পদসেবায় নিযুক্ত হইল। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "রমা কেমন আছে?"

রমার পীড়া। সে কথা পরে বলিব। নন্দা উত্তর করিল, "কই—কিছু বিশেষ হইতে ত দেখিলাম না।"

রাজা। আমি এত রাত্রিতে তাহাকে দেখিতে যাইতে পারিতেছি না, বড় ক্লান্ত আছি, তুমি আমার স্থলাভিষিক্ত হইয়া যাও—তাহাকে আমি যেমন যত্ন করিতাম, তেমনি যত্ন করিও; আর আমি যে জন্য যাইতে পারিলাম না, তাহাও বলিও।

কথাটা শুনিয়া পাঠক সীতারামকে ধিক্কার দিবেন। কিন্তু সে সীতারাম আর নাই। যে সীতারাম হিন্দুসাম্রাজ্য সংস্থাপন জন্য সর্ব্বস্ব পণ করিয়াছিলেন, সে সীতারাম রাজ্যপালন ত্যাগ করিয়া কেবল শ্রীকে খুঁজিয়া বেড়াইল। যে সীতারাম আপনার প্রাণ দিয়া শরণাগত বলিয়া গঙ্গারামের প্রাণরক্ষা করিতে গিয়াছিলেন—সেই সীতারাম রাজা হইয়া, রাজদণ্ড-প্রণেতা হইয়া, শ্রীর লোভে গঙ্গারামকে ছাড়িয়া দিল। যে লোকবৎসল ছিল, সে এখন আত্মবৎসল হইতেছে।

নন্দা বুঝিল, প্রভু আজ একা থাকিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন। নন্দা আর কথা না কহিয়া চলিয়া গেল। সীতারাম তখন পর্য্যঙ্কে শয়ন করিয়া শ্রীর প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

সীতারাম সমস্ত দিন রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর পর্য্যন্ত পরিশ্রম করিয়া ক্লান্ত ছিলেন। অন্য দিন হইলে পড়িতেন আর নিদ্রায় অভিভূত হইতেন। কিন্তু আজ স্বতন্ত্র কথা—যাহার জন্য রাজ্যসুখ বা রাজ্যভার ত্যাগ করিয়া এত কাল ধরিয়া দেশে দেশে নগরে নগরে ভ্রমণ করিয়াছেন, যাহার চিন্তা অগ্নিস্বরূপ দিবারাত্র হৃদয় দাহ করিতেছিল, তাহার সাক্ষাৎলাভ হইবে। সীতারাম জাগিয়া রহিলেন।

কিন্তু নিদ্রাদেবীও ভুবন-বিজয়িনী। যে যতই বিপদাপন্ন হউক না কেন, এক সময়ে না এক সময়ে তাহারও নিদ্রা আসে। সীতারাম বিপদাপন্ন নহেন, সুখের আশায় নিমগ্ন, সীতারামের একবার তন্দ্রা আসিল। কিন্তু মনের ততটা চাঞ্চল্য থাকিলে তন্দ্রাও বেশী ক্ষণ থাকে না। ক্ষণকাল মধ্যেই সীতারামের নিদ্রা ভঙ্গ হইল—চাহিয়া দেখিলেন, সম্মুখে গৈরিকবস্ত্র রুদ্রাক্ষভূষিতা মুক্ত-কুন্তলা কমনীয়া মূর্ত্তি।

সীতারাম প্রথমে জয়ন্তী মনে করিয়া অতি ব্যস্তভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কই ? শ্রী কই ?" কিন্তু তখনই দেখিলেন, জয়ন্তী নহে, শ্রী।

তখন চিনিয়া, "শ্রী! শ্রী! ও শ্রী! আমার শ্রী!" বলিয়া উচ্চকণ্ঠে ডাকিতে ডাকিতে রাজা গাত্রোত্থান করিয়া বাহু প্রসারণ করিলেন। কিন্তু কেমন মাথা ঘুরিয়া গেল—চক্ষু বুজিয়া রাজা আবার শুইয়া পড়িলেন। মুহূর্ত্ত মধ্যে আপনিই মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইল।

তখন সীতারাম, ঊর্দ্ধমুখে, স্পন্দিততারলোচনে, অতৃপ্তদৃষ্টিতে শ্রীর পানে চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন। কোন কথা নাই—যেন বা নয়নের তৃপ্তি না হইলে কথার স্ফূর্ত্তি সম্ভাবিত হইতেছে না। দেখিতে দেখিতে, দেখিতে দেখিতে—যেন তাঁহার আনন্দ-প্রফুল্ল মুখমণ্ডল আর তত প্রফুল্ল রহিল না—একটা নিশ্বাস পড়িল। রাজা, আমার শ্রী বলিয়া ডাকিয়াছিলেন, বুঝি দেখিলেন, আমার শ্রী নহে। বুঝি দেখিলেন যে, স্থিরমূর্ত্তি, অবিচলিতধৈর্য্যসম্পন্না, অশ্রুবিন্দুমাত্রশূন্যা, উদ্ভাসিতরূপরশ্মিমণ্ডলমধ্যবর্ত্তিনী, মহামহিমাময়ী, এ যে দেবীপ্রতিমা! বুঝি এ শ্রী নহে!

হায়! মূঢ় সীতারাম মহিষী খুঁজিতেছিল—দেবী লইয়া কি করিবে!

সপ্তম পরিচ্ছেদ

রাজার কথা শ্রী সব শুনিল, শ্রীর কথা রাজা সব শুনিলেন। যেমন করিয়া, সর্ব্বত্যাগী হইয়া সীতারাম শ্রীর জন্য পৃথিবী ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন, সীতারাম তাহা বলিলেন। শ্রী আপনার কথাও কতক কতক বলিল, সকল বলিল না।

তার পর, শ্রী জিজ্ঞাসা করিল, "এখন আমাকে কি করিতে হইবে ?"

প্রশ্ন শুনিয়া সীতারামের নয়নে জল আসিল। চিরজীবনের পর স্বামীকে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল কি না, "এখন আমাকে কি করিতে হইবে ?" সীতারামের মনে হইল, উত্তর করেন, "কড়িকাঠে দড়ি ঝুলাইয়া দিবে, আমি গলায় দিব।"

তাহা না বলিয়া সীতারাম বলিলেন, "আমি আজ পাঁচ বৎসর ধরিয়া আমার মহিষী খুঁজিয়া বেড়াইতেছি। এখন তুমি আমার মহিষী হইয়া রাজপুরী আলো করিবে।"

শ্রী। মহারাজ! নন্দার প্রশংসা বিস্তর শুনিয়াছি। তোমার সৌভাগ্য যে, তুমি তেমন মহিষী পাইয়াছ। অন্য মহিষীর কামনা করিও না।

সীতা। তুমি জ্যেষ্ঠা। নন্দা যেমন হোক, তোমার পদ তুমি গ্রহণ করিবে না কেন ?

শ্রী। যে দিন তোমার মহিষী হইতে পারিলে আমি বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীও হইতে চাহিতাম না, আমার সে দিন গিয়াছে।

সীতারাম। সে কি? কেন গিয়াছে? কিসে গিয়াছে?

শ্রী। আমি সন্ন্যাসিনী; সর্ব্ব কর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছি।

সীতারাম। পতিযুক্তার সন্ন্যাসে অধিকার নাই। পতিসেবাই তোমার ধর্ম্ম।

শ্রী। যে সব কর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছে, তাহার পতিসেবাও ধর্ম্ম নহে; দেবসেবাও তাহার ধর্ম্ম নহে।

সীতা। সর্ব্ব কর্ম্ম কেহ ত্যাগ করিতে পারে না; তুমিও পার নাই। গঙ্গারামের জীবন রক্ষা করিয়া কি তুমি কর্ম্ম করিলে না? আমাকে দেখা দিয়া তুমি কি কর্ম্ম করিলে না?

শ্রী। করিয়াছি, কিন্তু তাহাতে আমার সন্ন্যাসধর্ম্ম ভ্রষ্ট হইয়াছে, একবার ধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়াছি বলিয়া এখন চিরকাল ধর্ম্মভ্রষ্ট হইতে বল?

সীতা। স্বামিসহবাস স্ত্রীজাতির পক্ষে ধর্ম্মভ্রংশ, এমন কুশিক্ষা তোমায় কে দিল? যেই দিক, ইহার উপায় আমার হাতে আছে। আমি তোমার স্বামী, তোমার উপর আমার অধিকার আছে। সেই অধিকারবলে, আমি তোমাকে আর যাইতে দিব না।

শ্রী। তুমি স্বামী, আর তুমি রাজা। তা ছাড়া তুমি উপকারী, আমি উপকৃত। অতএব তুমি যাইতে না দিলে আমি যাইতে পারিব না।

সীতা। আমি স্বামী, আমি রাজা, আর আমি উপকারী, তাই আমি যাইতে না দিলে তুমি যাইতে পারিবে না। বলিতেছ না কেন, আমি তোমায় ভালবাসি, তাই আমি ছাড়িয়া না দিলে তুমি যাইতে পারিবে না? স্নেহের সোণার শিকল কাটিবে কি প্রকারে?

শ্রী। মহারাজ! সে ভ্রমটা এখন গিয়াছে। এখন বুঝিয়াছি, যে ভালবাসে, ভালবাসায় তাহার ধর্ম্ম এবং সুখ আছে। কিন্তু যে ভালবাসা পায়, তাহার তাতে কি? তুমি মাটির ঠাকুর গড়িয়া, তাহাতে পুষ্পচন্দন দাও, তাহাতে তোমার ধর্ম্ম আছে, সুখও আছে, কিন্তু তাহাতে মাটির পুতুলের কি?

সীতা। কি ভয়ানক কথা!

শ্রী। ভয়ানক নহে—অমৃতময় কথা। ঈশ্বর সর্ব্বভূতে আছেন। ঈশ্বরে প্রীতিই জীবের সুখ বা ধর্ম্ম। তাই সর্ব্বভূতকে ভাল বাসিবে। কিন্তু ঈশ্বর নির্ব্বিকার, তাঁর সুখ দুঃখ নাই। ঈশ্বরের অংশস্বরূপ যে আত্মা জীবে আছেন, তাঁহারও তাই। ঈশ্বরে অর্পিত যে প্রীতি, তাহাতে তাঁহার সুখ দুঃখ নাই। তবে যে, কেহ ভালবাসিলে আমরা সুখী হই, সে কেবল মায়ার বিক্ষেপ।

সীতা। শ্রী! দেখিতেছি কোন ভণ্ড সন্ন্যাসীর হাতে পড়িয়া তুমি স্ত্রীবুদ্ধিবশতঃ কতকগুলা বাজে কথা কণ্ঠস্থ করিয়াছ। ও সকল স্ত্রীলোকের পক্ষে ভাল নহে। ভাল যা, তা

বলিতেছি, শুন। আমি তোমার স্বামী, আমার সহবাসই তোমার ধর্ম্ম ; তোমার ধর্ম্মান্তর নাই। আমি রাজা, সকলেরই ধর্ম্মরক্ষা আমার কর্ম্ম ; এবং স্বামীরও কর্ত্তব্য কর্ম্ম যে, স্ত্রীকে ধর্ম্মানুবর্ত্তিনী করে। অতএব তোমার ধর্ম্মে আমি তোমাকে প্রবৃত্ত করিব। তোমাকে যাইতে দিব না।

শ্রী। তা বলিয়াছি, তুমি স্বামী, তুমি রাজা, তুমি উপকারী। তোমার আজ্ঞা শিরোধার্য্য, কেবল আমার এইটুকু বলিয়া রাখা যে, আমা হইতে তুমি সুখী হইবে না।

সীতা। তোমাকে দেখিলেই আমি সুখী হইব।

শ্রী। আর এক ভিক্ষা এই, যদি আমাকে গৃহে থাকিতে হইল, তবে আমাকে এই রাজপুরীমধ্যে স্থান না দিয়া, আমাকে একটু পৃথক্ কুটীর তৈয়ার করিয়া দিবেন। আমি সন্ন্যাসিনী, রাজপুরীর ভিতর আমিও সুখী হইব না, লোকেও আপনাকে উপহাস করিবে।

সীতা। আর কুটীরে রাজমহিষীকে রাখিলে লোকে উপহাস করিবে না কি ?

শ্রী। রাজমহিষী বলিয়া কেহ নাই জানিল।

সীতা। আমার সঙ্গে তোমার সাক্ষাৎ হইবে না কি ?

শ্রী। সে আপনার অভিরুচি।

সীতা। তোমার সঙ্গে আমি দেখা শুনা করিব, অথচ তুমি রাজমহিষী নও ; লোকে তোমাকে কি বলিবে জান ?

শ্রী। জানি বৈ কি ! লোকে আমাকে রাজার উপপত্নী বিবেচনা করিবে। মহারাজ ! আমি সন্ন্যাসিনী—আমার মান অপমান কিছুই নাই। বলে বলুক না। আমার মান অপমান আপনারই হাতে।

সী। সে কি রকম ?

শ্রী। আমি তোমার সহধর্ম্মিণী—আমার সঙ্গে ধর্ম্মাচরণ ভিন্ন অধর্ম্মাচরণ করিও না। ধর্ম্মার্থে ভিন্ন যে ইন্দ্রিয়পরিতৃপ্তি, তাহা অধর্ম্ম। ইন্দ্রিয়তৃপ্তি পশুবৃত্তি। পশুবৃত্তির জন্য বিবাহের ব্যবস্থা দেবতা করেন নাই। পশুদিগের বিবাহ নাই। কেবল ধর্ম্মার্থেই বিবাহ। রাজর্ষিগণ কখনও বিশুদ্ধচিত্ত না হইয়া সহধর্ম্মিণীসহবাস করিতেন না। ইন্দ্রিয়বশ্যতা মাত্রই পাপ। আপনি যখন নিষ্পাপ হইয়া, শুদ্ধচিত্তে আমার সঙ্গে আলাপ করিতে পারিবেন, তখন আমি এই গৈরিক বস্ত্র ছাড়িব। যত দিন আমি এ গেরুয়া না ছাড়িব, তত দিন মহারাজ ! তোমাকে পৃথক্ আসনে বসিতে হইবে।

সী। আমি তোমার প্রভু, আমার কথাই চলিবে।

শ্রী। একবার চলিতে পারে ; কেন না, তুমি বলবান্। কিন্তু আমারও এক বল আছে। আমি বনবাসিনী, বনে আমরা অনেক প্রকার বিপদে পড়ি। এমন বিপদ্ ঘটিতে

১৬

পারে যে, তাহা হইতে উদ্ধার নাই। সে সময়ে আপনার রক্ষার জন্য আমরা সঙ্গে একটু বিষ রাখি। আমার নিকট বিষ আছে—আবশ্যক হইলে খাইব।

হায়! এ শ্রী ত সীতারামের শ্রী নয়।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

সীতারাম তাহা বুঝিয়াও বুঝিলেন না। মন কিছুতেই বুঝিল না। যাহার ভালবাসার জিনিষ মরিয়া যায়, সেও মৃত দেহের কাছে বসিয়া থাকে, কিছু ক্ষণ বিশ্বাস করে না যে, আর নিশ্বাস নাই। পাগল লিয়রের মত দর্পণ খুঁজিয়া বেড়ায়, দর্পণে নিশ্বাসের দাগ ধরে কি না। সীতারাম এত বৎসর ধরিয়া, মনোমধ্যে একটা শ্রীমূর্ত্তি গড়িয়া, তাহার আরাধনা করিয়াছিল। বাহিরে শ্রী যাই হৌক, ভিতরের শ্রী তেমনিই আছে। বাহিরের শ্রীকেই ত সীতারাম হৃদয়ে বসাইয়া রাখিয়াছিলেন, সেই বাহিরের শ্রী ত বাহিরেই আছে, তবে সে হৃদয়ের শ্রী হইতে ভিন্ন কিসে? ভিন্ন বলিয়া সীতারাম বারেক মাত্রও ভাবিতে পারিলেন না। লোকের বিশ্বাস আর সব যাই হৌক, লোকে মনে করে, মানুষ যা, তাই থাকে। মানুষ যে কত বার মরে, তাহা আমরা বুঝি না। এক দেহেই কত বার যে পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করে, তাহা মনেও করি না। সীতারাম বুঝিল না যে, সে শ্রী মরিয়াছে, আর একটা শ্রী সেই দেহে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। মনে করিল যে, আমার শ্রী আমার শ্রীই আছে। তাই শ্রীর চড়া চড়া কথাগুলা কাণে তুলিল না। তুলিবারও বড় শক্তি ছিল না। শ্রীকে ছাড়িলে সব ছাড়িতে হয়।

তা, শ্রী কিছুতেই রাজপুরীমধ্যে থাকিতে রাজি হইল না। তখন সীতারাম "চিত্তবিশ্রাম" নামে ক্ষুদ্র অথচ মনোরম প্রমোদভবন শ্রীর নিবাসার্থ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। শ্রী তাহাতে বাঘছাল পাতিয়া বসিল। রাজা প্রত্যহ তাহার সাক্ষাৎ জন্য যাইতেন। পৃথক্ আসনে বসিয়া তাহার সঙ্গে আলাপ করিয়া ফিরিয়া আসিতেন। ইহাতে রাজার পক্ষে বড় বিষময় ফল ফলিল।

আলাপটা কি রকম হইল মনে কর? রাজা বলিতেন ভালবাসার কথা, শ্রীর জন্য তিনি এত দিন যে দুঃখ পাইয়াছেন তাহার কথা, শ্রী ভিন্ন জীবনে তাঁহার আর কিছুই নাই, সেই কথা। কত দেশে কত লোক পাঠাইয়াছেন, কত দেশে নিজে কত খুঁজিয়াছেন, সেই কথা। শ্রী বলিত, কত পর্ব্বতের কথা, কত অরণ্যের কথা, কত বন্য পশু পক্ষী, ফল মূলের কথা, কত যতি পরমহংস ব্রহ্মচারীর কথা, কত ধর্ম্ম অধর্ম্ম, কর্ম্ম অকর্ম্মের কথা, কত পৌরাণিক উপন্যাসের কথা, কত দেশবিদেশী রাজার কথা, কত দেশাচার লোকাচারের কথা।

শুনিতে শুনিতে, সেই পৃথক্ আসনে বসিয়াও রাজার বড় বিপদ্ হইল। কথাগুলি বড় মনোমোহিনী। যে বলে, সে আরও মনোমোহিনী। আগুন ত জ্বলিয়াই ছিল, এবার ঘর পুড়িল। শ্রী ত চিরকালই মনোমোহিনী। যে শ্রী বৃক্ষবিটপে দাঁড়াইয়া আঁচল হেলাইয়া রণজয় করিয়াছিল, রূপে এ শ্রী তাহার অপেক্ষা অনেক গুণে রূপসী। শরীরের স্বাস্থ্য এবং মনের বিশুদ্ধি হইতেই রূপের বৃদ্ধি জন্মে;—শ্রীর শরীরের স্বাস্থ্য, এবং মনের বিশুদ্ধি শতগুণে বাড়িয়াছিল; তাই রূপও শতগুণে বাড়িয়াছিল। সদ্যঃপ্রস্ফুটিত প্রাতঃপুষ্পের যেমন পূর্ণ স্বাস্থ্য—কোথাও অপুষ্ট নয়, কোথাও অঙ্গহীন নয়, কোথাও বিবর্ণ নয়, কোথাও বিশুষ্ক নয়—সর্ব্বত্র মসৃণ, সম্পূর্ণ, শীতল, সুবর্ণ,—শ্রীর তেমনই স্বাস্থ্য;—শরীর সম্পূর্ণ, সেই জন্য শ্রী প্রকৃতির মূর্ত্তিমতী শোভা। তার পর চিত্ত প্রশান্ত, ইন্দ্রিয় ক্ষোভশূন্য, চিন্তাশূন্য, বাসনাশূন্য, ভক্তিময়, প্রীতিময়, দয়াময়,—কাজেই সেই সৌন্দর্য্যের বিকার নাই, কোথাও একটা দুঃখের রেখা নাই, একটু মাত্র ইন্দ্রিয়ভোগের ছায়া নাই, কোথাও চিন্তার চিহ্ন নাই, সর্ব্বত্র সুমধুর, সহাস্য, সুখময়—এ ভুবনেশ্বরী মূর্ত্তির কাছে সে সিংহবাহিনী মূর্ত্তি কোথায় দাঁড়ায়। তাহার পর সেই মনোমোহিনী কথা—নানা দেশের, নানা বিষয়ের, নানাবিধ অশ্রুতপূর্ব্ব কথা, কখনও কৌতূহলের উদ্দীপক, কখনও মনোরঞ্জন, কখনও জ্ঞানগর্ভ—এই দুই মোহ একত্রে মিশিলে কোন্ অসিদ্ধ ব্যক্তির রক্ষা আছে? সীতারামের অনেক দিন ত আগুন জ্বলিয়াছিল, এখন ঘর পুড়িতে লাগিল। শ্রী হইতে সীতারামের সর্ব্বনাশ হইল।

প্রথমে সীতারাম প্রত্যহ সায়াহ্নকালে চিত্তবিশ্রামে আসিতেন, প্রহরেক কথাবার্ত্তা কহিয়া চলিয়া যাইতেন। তার পর ক্রমশঃ রাত্রি বেশী হইতে লাগিল। পৃথক্ আসন হউক, রাজা ক্ষুধা ও নিদ্রায় পীড়িত না হইলে সেখান হইতে ফিরিতেন না। ইহাতে কিছু কষ্ট বোধ হইতে লাগিল। সুতরাং সীতারাম, চিত্তবিশ্রামেই নিজের সায়াহ্ন আহার, এবং রাত্রিতে শয়নের ব্যবস্থা করিলেন। সে আহার বা শয়ন পৃথক্ গৃহে; শ্রীর বাঘছালের নিকটে ঘেঁষিতে পারিতেন না। ইহাতেও সাধ মিটিল না। প্রাতে রাজবাড়ী ফিরিয়া যাইতে দিন দিন বেলা হইতে লাগিল। শ্রীর সঙ্গে ক্ষণেক প্রাতেও কথাবার্ত্তা না কহিয়া যাইতে পারিতেন না। যখন বড় বেলা হইতে লাগিল, তখন আবার মাধ্যাহ্নিক আহারটাও চিত্তবিশ্রামেই হইতে লাগিল। রাজা আহারান্তে একটু নিদ্রা দিয়া, বৈকালে একবার রাজকার্য্যের জন্য রাজবাড়ী যাইতেন। তার পর কোন দিন যাইতেন, কোন দিন বা কথায় কথায় যাওয়া ঘটিয়া উঠিত না। শেষ এমন হইয়া উঠিল যে, যখন যাইতেন, তখনই একটু ঘুরিয়া ফিরিয়া চলিয়া আসিতেন, চিত্তবিশ্রাম ছাড়িয়া তিষ্ঠিতেন না। চিত্তবিশ্রামেই রাজা বাস করিতে লাগিলেন, কখন কখন রাজভবনে বেড়াইতে যাইতেন।

এ দিকে চিত্তবিশ্রামে কাহারও কোন কার্য্যের জন্য আসিবার হুকুম ছিল না। চিত্তবিশ্রামের অন্তঃপুরে কীটপতঙ্গও প্রবেশ করিতে পারিত না। কাজেই রাজকার্য্যের সঙ্গে রাজার সম্বন্ধ প্রায় ঘুচিয়া উঠিল।

নবম পরিচ্ছেদ

রামচাঁদ ও শ্যামচাঁদ, দুই জন নিরীহ গৃহস্থ লোক, মহম্মদপুরে বাস করে। রামচাঁদের চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া, প্রদোষকালে, নিভৃতে তামাকুর সাহায্যে দুই জন কথোপকথন করিতেছিল। কিয়দংশ পাঠককে শুনিতে হইবে।

রামচাঁদ। ভাল, ভায়া, বলিতে পার, চিত্তবিশ্রামের আসল ব্যাপারটা কি ?

শ্যামচাঁদ। কি জান, দাদা, ও সব রাজা রাজড়ার হয়েই থাকে। আমাদের গৃহস্থ ঘরে কারই বা ছাড়া—তার আর রাজা রাজড়ার কথায় কাজ কি ? তবে আমাদের মহারাজাকে ভাল বল্‌তে হবে—মাত্রায় বড় কম। মোটে এই এ একটি।

রাম। হাঁ, তা ত বটেই। তবে কি জান, আমাদের মহারাজা না কি সে রকম নয়, পরম ধার্ম্মিক, তাই কথাটা জিজ্ঞাসা করি। বলি, এত কাল ত এ সব ছিল না।

শ্যাম। রাজাও আর সে রকম নাই, লোকে ত বলে। কি জান, মানুষ চিরকাল একরকম থাকে না। ঐশ্বর্য্য সম্পদ্ বাড়িলে, মনটাও কিছু এ দিক্ ও দিক্ হয়। আগে আমরা রামরাজ্যে বাস করিতাম—ভূষণা দখল হ'য়ে অবধি কি আর তাই আছে ?

রাম। তা বটে। তা আমার যেন বোধ হয় যে চিত্তবিশ্রামের কাণ্ডটা হ'য়ে অবধিই যেন বাড়াবাড়ি ঘটেছে। তা মহারাজকে এমন বশ করাও সহজ ব্যাপার নয়। মাগীও ত সামান্যা নয়—কোথা থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসিল ?

শ্যাম। শুনেছি, সেটা না কি একটা ভৈরবী। কেউ কেউ বলে, সেটা ডাকিনী। ডাকিনীরা নানা মায়া জানে, মায়াতে ভৈরবী বেশ ধ'রে বেড়ায়। আবার কেউ বলে, তার একটা জোড়া আছে, সেটা উড়ে উড়ে বেড়ায়, তাকে বড় কেউ দেখিতে পায় না।

রাম। তবে ত বড় সর্ব্বনাশ। রাজ্য পড়িল ডাকিনীর হাতে। এ রাজ্যের কি আর মঙ্গল আছে ?

শ্যাম। গতিকে ত বোধ হয় না। রাজা ত আর কাজ কর্ম্ম দেখেন না। যা করেন তর্কালঙ্কার ঠাকুর। তা তিনি লড়াই ঝকড়ার কি জানেন! এ দিকে না কি নবাবি ফৌজ শীঘ্র আসিবে।

রাম। আসে, মৃণ্ময় আছে।

শ্যাম। তুমিও যেমন দাদা! পরের কি কাজ! যার কর্ম্ম তার সাজে, অন্য লোকের লাঠি বাজে। এই ত দেখ্‌লে, গঙ্গারাম দাস কি কর্‌লে? আবার কে জানে, মৃণ্ময় বা কি কর্‌বে? সে যদি মুসলমানের সঙ্গে মিশে যায়, তবে আমরা দাঁড়াই কোথা? গোষ্ঠী শুদ্ধ জবাই হব দেখতে পাচ্চি।

রাম। তা বটে। তাই একে একে সব সরিতে আরম্ভ করেছে বটে। সে দিন তিলক ঘোষেরা উঠে যশোর গেল, তখন বুঝিতে পারিলাম না। জিজ্ঞাসা করিলাম যে, কেন যাও? বলে, এখানে জিনিসপত্র মাগ্যি। এখনই ত আরও কয় ঘর আমাদের পাড়া হইতে উঠিয়া গিয়াছে।

শ্যাম। তা দাদা, তোমার কাছে বল্‌চি, প্রকাশ করিও না, আমিও শিগ্‌গির সরবো।

রামচাঁদ। বটে! তা আমিই পড়ে জবাই হই কেন? তবে কি জান, এই সব বাড়ী ঘর দ্বার খরচ পত্র করে করা গেছে, এখন ফেলে ঝেলে যাওয়া গরিব মানুষের বড় দায়।

শ্যামচাঁদ। তা কি করবে, প্রাণটা আগে, না বাড়ী ঘর আগে? ভাল, রাজ্য বজায় থাকে, আবার আসা যাবে। ঘর দ্বার ত পালাবে না।

দশম পরিচ্ছেদ

শ্রী। মহারাজ! তুমি ত সর্ব্বদাই চিত্তবিশ্রামে। রাজ্য করে কে?

সীতা। তুমিই আমার রাজ্য। তোমাতে যত সুখ, রাজ্যে কি তত সুখ!

শ্রী। ছি! ছি! মহারাজ! এই জন্য কি হিন্দুসাম্রাজ্য স্থাপিত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলে! আমার কাছে হিন্দুসাম্রাজ্য খাটো হইয়া গেল, ধর্ম্ম গেল, আমিই সব হইলাম! এই কি রাজা সীতারাম রায়?

সীতা। রাজ্য ত সংস্থাপিত হইয়াছে।

শ্রী। টিকিবে কি?

সীতা। ভাঙ্গে কার সাধ্য?

শ্রী। তুমিই ভাঙ্গিতেছ। রাজার রাজ্য, আর বিধবার ব্রহ্মচর্য্য সমান। যত্নে রক্ষা না করিলে থাকে না।

সীতা। কৈ, অরক্ষাও ত হইতেছে না।

শ্রী। তুমি কি রাজ্য রক্ষা কর? তোমাকে ত আমার কাছেই দেখি।

সীতা। আমি রাজকর্ম্ম না দেখি, তা নয়। প্রায় প্রত্যহই রাজপুরীতে গিয়া থাকি। আমি এক দণ্ড দেখিলে যা হইবে, অন্যের সমস্ত দিনে তত হইবে না। তা ছাড়া, তর্কালঙ্কার ঠাকুর আছেন, মৃণ্ময় আছে, তাঁহারা সকল কর্ম্মে পটু। তাঁহারা থাকিতে কিছু না দেখিলেও চলে।

শ্রী। একবার ত তাঁহারা থাকিতে রাজ্য যাইতেছিল। দৈবাৎ তুমি সে রাত্রে না পৌঁছিলে, রাজ্য থাকিত না। আবার কেন কেবল তাঁহাদের উপর নির্ভর করিতেছ?

সীতা। আমি ত আছি। কোথাও যাই নাই। আবার বিপদ্ পড়ে, রক্ষা করিব।

শ্রী। যতক্ষণ এই বিশ্বাস থাকিবে, ততক্ষণ তুমি কোন যত্নই করিবে না। যত্ন ভিন্ন কোন কাজই সফল হয় না।

সী। যত্নের ত্রুটি কি দেখিলে?

শ্রী। আমি স্ত্রীজাতি, সন্ন্যাসী, আমি রাজকার্য্য কি বুঝি যে, সে কথার উত্তর দিতে পারি! তবে একটা বিষয়ে মনে বড় শঙ্কা হয়। মুরশিদাবাদের সংবাদ পাইতেছেন কি? তোরাব্ খাঁ গেল, ভূষণা গেল, বারো ভুঁইয়া গেল, নবাব কি চুপ করিয়া আছে?

সী। সে ভাবনা করিও না। মুরশিদ কুলি যতক্ষণ মাল খাজনা ঠিক কিস্তী কিস্তী পাইবে, ততক্ষণ কিছু বলিবে না।

শ্রী। পাইতেছে কি?

সীতা। হাঁ, পাঠাইবার বন্দোবস্ত আছে বটে—তবে এবার দেওয়া যায় নাই, অনেক খরচ পত্র হইয়াছে।

শ্রী। তবে সে চুপ করিয়া আছে কি?

সীতারাম মাথা হেঁট করিয়া কিছু ক্ষণ নীরব হইয়া রহিলেন। পরে বলিলেন, "সে কি করিবে, কি করিতেছে, তাহার কিছু সংবাদ পাই নাই।"

শ্রী। মহারাজ! চিত্তবিশ্রামে থাক বলিয়া কি সংবাদ লইতে ভুলিয়া গিয়াছ?

সীতারাম চিন্তামগ্ন হইয়া বলিলেন, "বোধ হয় তাই। শ্রী! তোমার মুখ দেখিলে আমি সব ভুলিয়া যাই।"

শ্রী। তবে, আমার এক ভিক্ষা আছে। এ পোড়ার মুখ, আবার লুকাইতে হইবে। নহিলে সীতারাম রায়ের নামে কলঙ্ক হইবে; ধর্ম্মরাজ্য ছারে খারে যাইবে। আমায় হুকুম দাও, আমি বনে যাই।

সীতা। যা হয় হোক, আমি ভাবিয়া দেখিয়াছি। হয় তোমায় ছাড়িতে হইবে, নয় রাজ্য ছাড়িতে হইবে। আমি রাজ্য ছাড়িব, তোমায় ছাড়িব না।

শ্রী। তবে তাহাই করুন। রাজ্য কোন উপযুক্ত লোকের হাতে দিন। তার পর সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া আমার সঙ্গে বনে চলুন।

সীতারাম চিন্তামগ্ন হইয়া রহিলেন। রাজার তখন ভোগলালসা অত্যন্ত প্রবলা। আগে হইলে সীতারাম রাজ্য ত্যাগ করিতে পারিতেন। এখন সে সীতারাম নাই; রাজ্যভোগে সীতারামের চিত্ত সমল হইয়াছে। সীতারাম রাজ্য ত্যাগ করিতে পারিলেন না।

একাদশ পরিচ্ছেদ

সেই যে সভাতলে রমা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গিয়াছিল, সখীরা ধরাধরি করিয়া আনিয়া শুয়াইল, সেই অবধি রমা আর উঠে নাই। প্রাণপণ করিয়া আপনার সতী নাম রক্ষা করিয়াছিল। মান রক্ষা হইল, কিন্তু প্রাণ বুঝি গেল।

এখন রোগ পুরাতন হইয়াছে। কিন্তু গোড়া থেকে বলি। রাজার রাণীর চিকিৎসার অভাব হয় নাই। প্রথম হইতেই কবিরাজ যাতায়াত করিতে লাগিল। অনেকগুলা কবিরাজ রাজবাড়ীতে চাকরী করে, তত কর্ম্ম নাই, সচরাচর ভৃত্যবর্গকে মসলা খাওয়াইয়া, এবং পরিচারিকাকে পোষ্টাই দিয়া কালাতিপাত করে; এক্ষণে ছোট রাণীকে রোগী পাইয়া কবিরাজ মহাশয়েরা হঠাৎ বড় লোক হইয়া বসিলেন, তখন রোগনির্ণয় লইয়া মহা হুলস্থুল পড়িয়া গেল। মূর্চ্ছা, বায়ু, অম্লপিত্ত, হৃদ্রোগ ইত্যাদি নানাবিধ রোগের লক্ষণ শুনিতে শুনিতে রাজপুরুষেরা জ্বালাতন হইয়া উঠিল। কেহ নিদানের দোহাই দেন, কেহ বাগ্‌ভটের, কেহ চরকসংহিতার বচন আওড়ান, কেহ সুশ্রুতের টীকা ঝাড়েন। রোগ অনির্ণীত রহিল।

কবিরাজ মহাশয়েরা, কেবল বচন ঝাড়িয়া নিশ্চিন্ত রহিলেন, এমন নিন্দা আমরা করি না। তাঁহারা নানাপ্রকার ঔষধের ব্যবস্থা করিলেন। কেহ বটিকা, কেহ গুঁড়া, কেহ ঘৃত, কেহ তৈল; কেহ বলিলেন, ঔষধ প্রস্তুত করিতে হইবে; কেহ বলিলেন, আমার কাছে যাহা প্রস্তুত আছে, তেমন আর হইবে না। যাই হউক, রাজার বাড়ী, রাণীর রোগ, ঔষধের প্রয়োজন থাক, না থাক, নূতন প্রস্তুত হইবে না, এমন হইতে পারে না। হইলে দশ জনে দুটাকা দুসিকা উপার্জ্জন করিতে পারে, অতএব ঔষধ প্রস্তুতের ধুম পড়িয়া গেল। কোথাও হামানদিস্তায় মূল পিষ্ট হইতেছে, কোথাও ঢেঁকিতে ছাল কুটিতেছে, কোথাও হাঁড়িতে কিছু সিদ্ধ হইতেছে, কোথাও খুলিতে তৈলে মূর্চ্ছনা পড়িতেছে। রাজবাড়ীর এক জন পরিচারিকা এক দিন দেখিয়া বলিল, "রাণী হইয়া রোগ হয়, সেও ভাল।"

যার জন্য ঔষধের এত ধুম, তার সঙ্গে ঔষধের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ বড় অল্প। কবিরাজ মহাশয়েরা ঔষধ যোগাইতেন না, তা নয়। সে গুণে তাঁহাদের কিছু মাত্র ত্রুটি ছিল না।

তবে রমার দোষে সে যত্ন বৃথা হইল—রমা ঔষধ খাইত না। মুরলার বদলে, যমুনানাম্নী এক জন পরিচারিকা, রাণীর প্রধানা দাসী হইয়াছিল। যমুনাকে একটু প্রাচীন দেখিয়া নন্দা তাহাকে এই পদে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। আমরা এমন বলিতে পারি না যে, যমুনা আপনাকে প্রাচীনা বলিয়া স্বীকার করিত; শুনিয়াছি, কোন ভৃত্যবিশেষের এ বিষয়ে সম্পূর্ণ মতান্তর ছিল; তথাপি স্থূল কথা এই যে, যমুনা একটু প্রাচীন চালে চলিত, রমাকে বিলক্ষণ যত্ন করিত; রোগিণীর সেবার কোন প্রকার ত্রুটি না হয়, তদ্বিষয়ে বিশেষ মনোযোগিনী ছিল। রমার জন্য কবিরাজেরা যে ঔষধ দিয়া যাইত, তাহা তাহারই হাতে পড়িত; সেবন করাইবার ভার তাহার উপর। কিন্তু সেবন করান তাহার সাধ্যাতীত; রমা কিছুতেই ঔষধ খাইত না।

এ দিকে রোগের কোন উপশম নাই, ক্রমেই বৃদ্ধি, রমা আর মাথা তুলিতে পারে না। দেখিয়া শুনিয়া যমুনা স্থির করিল যে, সে সকল কথা বড় রাণীকে গিয়া জানাইবে। অতএব রমাকে বলিল, "আমি বড় মহারাণীর কাছে চলিলাম; ঔষধ তিনি নিজে আসিয়া খাওয়াইবেন।"

রমা বলিল, "বাছা! মৃত্যুকালে আর কেন জ্বালাতন করিস্! বরং তোর সঙ্গে একটা বন্দোবস্ত করি।"

যমুনা জিজ্ঞাসা করিল, "কি বন্দোবস্ত মা?"

রমা। তোমার এই ঔষধগুলি আমারে বেচিবে? আমি এক এক টাকা দিয়া এক্ একটা বড়ি কিনিতে রাজি আছি।

যমুনা। সে আবার কি মা! তোমার ঔষধ তোমায় আবার বেচিব কি?

রমা। টাকা নিয়া তুমি যদি আমায় বড়ি বেচ, তা হ'লে তোমার আর তাতে কোন অধিকার থাকিবে না। চাই আমি খাই, চাই না খাই, তুমি আর কথা কহিতে পাবে না।

যমুনা কিছুক্ষণ ভাবিল। সে বুদ্ধিমতী; মনে মনে বিচার করিল যে, এ ত মরিবেই, তবে আমি টাকাগুলা ছাড়ি কেন? প্রকাশ্যে বলিল, "তা মা, তুমি যদি খাও, ত টাকা দিয়াই নাও, আর অমনিই নাও, নাও না কেন! আর যদি না খাও, ত আমার কাছে ওষুধ প'ড়ে থেকেই কি ফল?"

অতএব চুক্তি ঠিক হইল। যমুনা টাকা লইয়া ঔষধ রমাকে বেচিল। রমা ঔষধের কতকগুলা পিকদানিতে ফেলিয়া দিল, কতক বালিশের নীচে গুঁজিল। উঠিতে পারে না যে, অন্যত্র রাখিবে।

এ দিকে, ক্রমশঃ শরীরধ্বংসের লক্ষণ সকল দেখা দিতে লাগিল। নন্দা প্রত্যহ রমাকে দেখিতে আসে, দুই এক দণ্ড বসিয়া কথাবার্তা কহিয়া যায়। নন্দা দেখিল যে, মৃত্যুর ছায়া

পড়িয়াছে; যাহার ছায়া, সে নিকটেই। নন্দা ভাবিল, "হায়! রাজবাড়ীর কবিরাজ-গুলোকেও কি ডাকিনীতে পেয়েছে?" নন্দা একেবারে কবিরাজের দলকে ডাকিয়া পাঠাইল। সকলে আসিলে নন্দা অন্তরালে থাকিয়া তাহাদিগকে উত্তম মধ্যম রকম ভর্ৎসনা করিল। বলিল, "যদি রোগ ভাল করিতে পার না, তবে মাসিক লও কেন?"

একজন প্রাচীন কবিরাজ বলিল, "মা! কবিরাজে ঔষধ দিতে পারে, পরমায়ু দিতে পারে না।"

নন্দা বলিল, "তবে আমাদের ঔষধেও কাজ নাই, কবিরাজেও কাজ নাই। তোমরা আপনার আপনার দেশে যাও।"

কবিরাজমণ্ডলী বড় ক্ষুণ্ণ হইল। প্রাচীন কবিরাজটি বড় বিজ্ঞ। তিনি বলিলেন, "মা! আমাদের অদৃষ্ট নিতান্ত মন্দ, তাই এমন ঘটিয়াছে। নহিলে, আমি যে ঔষধ দিয়াছি, তাহা সাক্ষাৎ ধন্বন্তরি। আমি এখনও আপনার নিকট স্বীকার করিতেছি যে, তিন দিনের মধ্যে আরাম করিব, যদি একটা বিষয়ে আপনি অভয় দেন।"

নন্দা জিজ্ঞাসা করিল, "কি চাই?"

কবিরাজ বলিল, "আমি নিজে বসিয়া থাকিয়া ঔষধ খাওয়াইয়া আসিব।" বুড়ার বিশ্বাস, "বেটি ঔষধ খায় না; আমার ঔষধ খাইলে কি রোগী মরে।"

নন্দা স্বীকৃত হইয়া কবিরাজদিগকে বিদায় দিল। পরে রমার কাছে আসিয়া সব বলিল। রমা অল্প হাসিল, বেশী হাসিবার শক্তিও নাই, মুখে স্থানও নাই; মুখ বড় ছোট হইয়া গিয়াছে।

নন্দা জিজ্ঞাসা করিল, "হাসিলি যে?"

রমা আবার তেমনি হাসি হাসিয়া বলিল, "ঔষধ খাব না।"

নন্দা। ছি দিদি! যদি এত ওষুধ খেলে, ত আর তিনটা দিন খেতে কি?

রমা। আমি ওষুধ খাই নাই।

নন্দা চমকিয়া উঠিল,—বলিল, "সে কি? মোটে না?"

রমা। সব বালিশের নীচে আছে।

নন্দা বালিশ উল্টাইয়া দেখিল, সব আছে বটে। তখন নন্দা বলিল, "কেন বহিন্—এখন আর আত্মঘাতিনী হইবে কেন? পাপ ত মিটিয়াছে।"

রমা। তা নয়—ঔষধ খাব।

নন্দা। আর কবে খাবি?

রমা। যবে রাজা আমাকে দেখিতে আসিবেন।

ঝর ঝর করিয়া রমার চোক দিয়া জল পড়িতে লাগিল। নন্দারও চক্ষে জল আসিল। আর এখন সীতারাম রমাকে দেখিতে আসেন না। সীতারাম চিত্তবিশ্রামে থাকেন। নন্দা চোখের জল মুছিয়া বলিল, "এবার এলেই তোমাকে দেখিতে আসিবেন।"

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

"এবার এলেই তোমাকে দেখিতে আসিবেন," এই কথা বলিয়া নন্দা রমাকে আশ্বাস দিয়া আসিয়াছিল। সেই আশ্বাসে রমা কোন রকমে বাঁচিয়াছিল—কিন্তু আর বুঝি বাঁচে না। নন্দা তাহাকে যে আশ্বাসবাক্য দিয়া আসিয়াছে, নন্দাও তাহা জপমালা করিয়াছিল, কিন্তু রাজাকে ধরিতে পারিতেছিল না। যদি কখনও ধরে, তবে "আজ না—কাল" করিয়া রাজা প্রস্থান করেন। নন্দা মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল যে, কিছুতেই সে সীতারামের উপর রাগ করিবে না। ভাবিল, রাজাকে ত ডাকিনীতে পেয়েছে সত্য, কিন্তু তাই ব'লে আমায় যেন ভূতে না পায়। আমার ঘাড়ে রাগ ভূত চাপিলে—এ সংসার এখন আর রাখিবে কে? তাই নন্দা সীতারামের উপর রাগ করিল না—আপনার অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম প্রাণপাত করিয়া করিতে লাগিল। কিন্তু ডাকিনীটার উপর রাগ বড় বেশী। ডাকিনী যে শ্রী, তাহা নন্দা জানিত না; সীতারাম ভিন্ন কেহই জানিত না। নন্দা অনেক বার সন্ধান জানিবার জন্য লোক পাঠাইয়াছিল, কিন্তু সীতারামের আজ্ঞা ভিন্ন চিত্তবিশ্রামে মক্ষিকা প্রবেশ করিতে পারিত না, সুতরাং কিছু হইল না। তবে জনপ্রবাদ এই যে, ডাকিনীটা দিবসে পরমসুন্দরী মানবী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া গৃহধর্ম্ম করে, রাত্রিতে শৃগালীরূপ ধারণ করিয়া শ্মশানে শ্মশানে বিচরণপূর্ব্বক নরমাংস ভক্ষণ করে। অতিশয় ভীতা হইয়া নন্দা, চন্দ্রচূড় ঠাকুরকে সবিশেষ নিবেদন করিল। চন্দ্রচূড় উত্তম তন্ত্রবিৎ ব্রাহ্মণ সংগ্রহ করিয়া রাজার উদ্ধারার্থ তান্ত্রিক যজ্ঞ সকল সম্পাদন করাইলেন, কিন্তু কিছুতেই ডাকিনীর ধ্বংস হইল না। পরিশেষে এক জন সুদক্ষ তান্ত্রিক বলিলেন, "মনুষ্য হইতে ইহার কিছু উপায় হইবে না। ইনি সামান্যা নহেন। ইনি কৈলাসনিবাসিনী, সাক্ষাৎ ভবানীর সহচরী, ইঁহার নাম বিশালাক্ষী। ইনি রুদ্রের শাপে কিছু কালের জন্য মর্ত্যলোকে মনুষ্যসহবাসার্থ আসিয়াছেন। শাপান্ত হইলে আপনিই যাইবেন।" শুনিয়া চন্দ্রচূড় ও নন্দা নিরস্ত ও চিন্তামগ্ন হইয়া রহিলেন। তবু নন্দা মনে মনে ভাবিত, "ভবানীর সহচরী হউক, আর যেই হউক, আমি একবার তাকে পাইলে নখে মাথা চিরি।"

তাই, নন্দার সীতারামের উপর কোন রাগ নাই। সীতারামও রাজধানীতে আসিলে নন্দার সঙ্গে কখন কখন সাক্ষাৎ করিতেন; এই সকল সময়ে, নন্দা রমার কথা সীতারামকে

জানাইত—বলিত, "সে বড় 'কাতর'—তুমি গিয়া একবার দেখিয়া এসো।" সীতারাম যাচ্চি যাব করিয়া, যান নাই। আজ নন্দা জোর করিয়া ধরিয়া বসিল—বলিল, "আজ দেখিতে যাও—নহিলে এ জন্মে আর দেখা হবে না।"

কাজেই সীতারাম রমাকে দেখিতে গেলেন। সীতারামকে দেখিয়া রমা বড় কাঁদিল। সীতারামকে কোন তিরস্কার করিল না। কিছুই বলিতে পারিল না। সীতারামের মনে কিছু অনুতাপ জন্মিল কি না, জানি না। সীতারাম স্নেহসূচক সম্বোধন করিয়া রোগমুক্তির ভরসা দিতে লাগিলেন। ক্রমে রমা প্রফুল্ল হইল, মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল। কিন্তু কি হাসি। হাসি দেখিয়া সীতারামের শঙ্কা হইল যে, আর অধিক বিলম্ব নাই।

সীতারাম পালঙ্কের উপর উঠিয়া বসিয়াছিলেন। সেইখানে রমার পুত্র আসিল। আবার রমার চক্ষুতে জল আসিল—কিছুক্ষণ অবাধে জল, শুষ্ক গণ্ড বহিয়া পড়িতে লাগিল। ছেলেও মার কান্না দেখিয়া কাঁদিতেছিল। রমা ইঙ্গিতে অস্ফুটস্বরে সীতারামকে বলিলেন, "ওকে একবার কোলে নাও।" সীতারাম অগত্যা পুত্রকে কোলে লইলেন। তখন রমা, সকাতরে ক্ষীণকণ্ঠে রুদ্ধশ্বাসে বলিতে লাগিল, "মার দোষে ছেলেকে ত্যাগ করিও না। এই তোমার কাছে আমার শেষ ভিক্ষা। বড় রাণীর হাতে ওকে সমর্পণ করিয়া যাব মনে করেছিলাম—কিন্তু তা না করিয়া তোমারই হাতে সমর্পণ করিলাম। কথা রাখিবে কি?"

সীতারাম কলের পুতুলের মত স্বীকৃত হইলেন। রমা তখন সীতারামকে আরও নিকটে আসিয়া বসিতে ইঙ্গিত করিলেন। সীতারাম সরিয়া বসিলে, রমা তাঁর পায়ে হাত দিয়া, পায়ের ধূলা লইয়া আপনার মাথায় দিল। বলিল, "এ জন্মের মত বিদায় হইলাম। আশীর্ব্বাদ করিও, জন্মান্তরে যেন তোমাকেই পাই।"

তার পর বাক্য বন্ধ হইল। শ্বাস বড় জোরে জোরে পড়িতে লাগিল। চক্ষুর জ্যোতি গেল। মুখের উপর কালো ছায়া আরও কালো হইতে লাগিল। শেষে সব অন্ধকার হইল। সব জ্বালা জুড়াইল। রমা চলিয়া গেল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

যে দিন রমা মরিল, সে দিন সীতারাম আর চিত্তবিশ্রামে গেলেন না। এখনও তত দূর হয় নাই। যখন সীতারাম রাজা না হইয়াছিলেন, যখন আবার শ্রীকে না দেখিয়াছিলেন, তখন সীতারাম রমাকে বড় ভাল বাসিতেন—নন্দার অপেক্ষাও ভাল বাসিতেন। সে ভালবাসা গিয়াছিল। কিসে গেল, সীতারাম তাহার চিন্তা কখনও করেন

নাই। আজ একটু ভাবিলেন। ভাবিয়া দেখিলেন—রমার দোষ বড় বেশী নয়,—দোষ তাঁর নিজের। মনে মনে আপনার উপর বড় অসন্তুষ্ট হইলেন।

কাজেই মেজাজ খারাব হইয়া উঠিল। চিত্ত প্রফুল্ল করিবার জন্য শ্রীর কাছে যাইতে প্রবৃত্তি হইল না; কেন না, শ্রীর সঙ্গে এই আত্মগ্লানির বড় নিকট সম্বন্ধ; রমার প্রতি তাঁহার নিষ্ঠুরাচরণের কারণই শ্রী। শ্রীর কাছে গেলে আগুন আরও বাড়িবে। তাই শ্রীর কাছে না গিয়া রাজা নন্দার কাছে গেলেন। কিন্তু নন্দা সে দিন একটা ভুল করিল। নন্দা বড় চটিয়াছিল। ডাকিনীই হউক আর মানুষীই হউক, কোন পাপিষ্ঠার জন্য যে রাজা নন্দাকে অবহেলা করিতেন, নন্দা তাহাতে আপনার মনকে রাগিতে দেয় নাই। কিন্তু রমাকে এত অবহেলা করায়, রমা যে মরিল, তাহাতে রাজার উপর নন্দার রাগ হইল; কেন না, আপনার অপমানও তাহার সঙ্গে মিশিল। রাগটা এত বেশী হইল যে, অনেক চেষ্টা করিয়াও নন্দা, সকলটুকু লুকাইতে পারিল না।

রমার প্রসঙ্গ উঠিলে, নন্দা বলিল, "মহারাজ! তুমিই রমার মৃত্যুর কারণ।"

নন্দা এইটুকু মাত্র রাগ প্রকাশ করিল, আর কিছুই না। কিন্তু তাহাতেই আগুন জ্বলিল; কেন না, ইন্ধন প্রস্তুত। একে ত আত্মগ্লানিতে সীতারামের মেজাজ খারাব হইয়াছিল—কোন মতে আপনার নিকটে আপনার সাফাই করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, তাহার উপর নন্দার এই উচিত তিরস্কার শেলের মত বিঁধিল। "মহারাজ! তুমিই রমার মৃত্যুর কারণ।" শুনিয়া রাজা গর্জ্জিয়া উঠিলেন। বলিলেন, "ঠিক কথা। আমিই তোমাদের মৃত্যুর কারণ। আমি প্রাণপাত করিয়া, আপনার রক্তে পৃথিবী ভাসাইয়া তোমাদিগকে রাজরাণী করিয়াছি—কাজেই এখন বল্‌বে বৈ কি, আমিই তোমাদের মৃত্যুর কারণ। যখন রমা, গঙ্গারামকে ডাকিয়া আমার মৃত্যুর কারণ হইবার চেষ্টা করিয়াছিল, কৈ—তখন ত কেহ কিছু বল নাই?"

এই বলিয়া রাজা রাগ করিয়া বহির্ব্বাটীতে গেলেন। সেখানে চন্দ্রচূড় ঠাকুর, রাজাকে রমার জন্য শোকাকুল বিবেচনা করিয়া, তাঁহাকে সান্ত্বনা করিবার জন্য নানা প্রকার আলাপ করিতে লাগিলেন। রাজার মেজাজ তপ্ত তেলের মত ফুটিতেছিল, রাজা তাঁহার কথার বড় উত্তর করিলেন না। চন্দ্রচূড় ঠাকুরও একটা ভুল করিলেন। তিনি মনে করিলেন, রমার মৃত্যুর জন্য রাজার অনুতাপ হইয়াছে, এই সময়ে চেষ্টা করিলে, যদি ডাকিনী হইতে মন ফিরে, তবে সে চেষ্টা করা উচিত। তাই চন্দ্রচূড় ঠাকুর ভূমিকা করিবার অভিপ্রায়ে বলিলেন, "মহারাজ! আপনি যদি ছোট রাণীর প্রতি আর একটু মনোযোগী হইতেন, তা হইলে তিনি আরোগ্য লাভ করিতে পারিতেন।"

জ্বলন্ত আগুন এ ফুৎকারে আরও জ্বলিয়া উঠিল। রাজা বলিলেন, "আপনারও কি বিশ্বাস যে, আমিই ছোট রাণীর মৃত্যুর কারণ ?"

চন্দ্রচূড়ের সেই বিশ্বাস বটে। তিনি মনে করিলেন, "এ কথা রাজাকে স্পষ্ট করিয়া বলাই উচিত। আপনার দোষ না দেখিলে, কাহারও চরিত্র শোধন হয় না। আমি ইঁহার গুরু ও মন্ত্রী, আমি যদি বলিতে সাহস না করিব, তবে কে বলিবে ?" অতএব চন্দ্রচূড় বলিলেন, "তাহা এক রকম বলা যাইতে পারে।"

রাজা। পারে বটে। বলুন। কেবল বিবেচনা করুন, আমি যদি লোকের মৃত্যু-কামনা করিতাম, তাহা হইলে এই রাজ্যে এক জনও এত দিন টিকিত না।

চন্দ্র। আমি বলিতেছি না যে, আপনি কাহারও মৃত্যুকামনা করেন। কিন্তু আপনি মৃত্যুকামনা না করিলেও, যে আপনার রক্ষণীয়, তাহাকে আপনি যত্ন ও রক্ষা না করিলে, কাজেই তাহার মৃত্যু উপস্থিত হইবে। কেবল ছোট রাণী কেন, আপনার তত্ত্বাবধানের অভাবে বুঝি সমস্ত রাজ্য যায়। কথাটা আপনাকে বলিবার জন্য কয় দিন হইতে আমি চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু আপনার অবসর অভাবে, তাহা বলিতে পারি নাই।

রাজা মনে মনে বলিলেন, "সকল বেটাই বলে—তত্ত্বাবধানের অভাব—বেটারা করে কি ?" প্রকাশ্যে বলিলেন, "তত্ত্বাবধানের অভাব—আপনারা করেন কি ?"

চন্দ্র। যা করিতে পারি—সব করি। তবে আমরা রাজা নহি। যেটা রাজার হুকুম নহিলে সিদ্ধ হয় না, সেইটুকু পারি না। আমার ভিক্ষা, কাল প্রাতে একবার দরবারে বসেন, আমি আপনাকে সবিশেষ অবগত করি, কাগজপত্র দেখাই ; আপনি রাজাজ্ঞা প্রচার করিবেন।

রাজা মনে মনে বলিলেন, "তোমার গুরুগিরির কিছু বাড়াবাড়ি হইয়াছে—আমারও ইচ্ছা, তোমায় কিছু শিখাই।" প্রকাশ্যে বলিলেন, "বিবেচনা করা যাইবে।"

চন্দ্রচূড়ের তিরস্কারে রাজার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিতেছিল, কেবল গুরু বলিয়া সীতারাম তাঁহাকে বেশী কিছু বলিতে পারেন নাই। কিন্তু রাগে সে রাত্রি নিদ্রা গেলেন না। চন্দ্রচূড়কে কিসে শিক্ষা দিবেন, সে চিন্তা করিতে লাগিলেন। প্রভাতে উঠিয়াই, প্রাতঃকৃত্য সমস্ত সমাপন করিয়া দরবারে বসিলেন। চন্দ্রচূড় খাতাপত্রের রাশি আনিয়া উপস্থিত করিলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

যে কথাটা চন্দ্রচূড় রাজাকে জানাইতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, তাহা এই। যত বড় রাজ্য হউক না কেন, আর যত বড় রাজা হউক না কেন, টাকা নইলে কোন রাজ্যই চলে না। আমরা একালে দেখিতে পাই, যেমন তোমার আমার সংসার টাকা নহিলে চলে না—তেমনই ইংরেজের এত বড় রাজ্যও টাকা নহিলে চলে না। টাকার অভাবে তেমনই রোমক সাম্রাজ্য লোপ পাইল—প্রাচীন সভ্যতা অন্ধকারে মিশাইল। সীতারামের সহসা টাকার অভাব হইল।

সীতারামের টাকার অভাব হওয়া অনুচিত ; কেন না, সীতারামের আয় অনেক গুণ বাড়িয়াছিল। ভূষণার ফৌজদারীর এলাকা তাঁহার করতলস্থ হইয়াছিল—বারো ভুঁইয়া তাঁহার বশে আসিয়াছিল। তচ্ছাসিত প্রদেশ সম্বন্ধে দিল্লীর বাদশাহের প্রাপ্য যে কর, সীতারামের উপর তাহার আদায়ের ভার হইয়াছিল। সীতারাম এ পর্য্যন্ত তাহার এক কড়াও মুর্শিদাবাদে পাঠান নাই—যাহা আদায় করিয়াছিলেন, তাহা নিজে ভোগ করিতেছিলেন। তবে টাকার অকুলান কেন ?

লোকের আয় বাড়িলেই অকুলান হইয়া উঠে। কেন না, খরচ বাড়ে। ভূষণা বশে আনিতে কিছু খরচ হইয়াছিল—বারো ভুঁইয়াকে বশে আনিতে কিছু খরচ হইয়াছিল। এখন অনেক ফৌজ রাখিতে হইত—কেন না, কখন কে বিদ্রোহী হয়, কখন কে আক্রমণ করে—সে জন্যও ব্যয় হইতেছিল। অভিষেকেও কিছু ব্যয় হইয়াছিল। অতএব যেমন আয়, তেমনই ব্যয় বটে।

কিন্তু যেমন আয়, তেমনই ব্যয় হইলে অকুলান হয় না। অকুলানের আসল কারণ চুরি। রাজা এখন আর বড় কিছু দেখেন না—চিত্তবিশ্রামেই দিনপাত করেন। কাজেই রাজপুরুষেরা রাজভাণ্ডারের টাকা লইয়া যাহার যাহা ইচ্ছা, সে তাহাই করে,—কে নিষেধ করে ? চন্দ্রচূড় ঠাকুর নিষেধ করেন, কিন্তু তাঁহার নিষেধ কেহ মানে না। চন্দ্রচূড় জনকত বড় বড় রাজকর্ম্মচারীর চুরি ধরিলেন,—মনে করিলেন, এবার যে দিন রাজা দরবারে বসিবেন, সেই দিন খাতাপত্র সকল তাঁহার সম্মুখে ধরিয়া দিবেন। কিন্তু রাজা কিছুতেই ধরা দেন না, "কাজ যা থাকে, মহাশয় করুন" বলিয়া কোন মতে পাশ কাটাইয়া চিত্তবিশ্রামে পলায়ন করেন। চন্দ্রচূড় হতাশ হইয়া শেষে নিজেই কয় জনের বর্‌তরফের হুকুম জারি করিলেন। তাহারা তাঁহাকে হাসিয়া উড়াইয়া দিল—বলিল, "ঠাকুর! যখন স্মৃতির ব্যবস্থা প্রয়োজন হইবে, তখন আপনার কথা শুনিব। রাজার সহি মোহরের পরওয়ানা দেখান, নহিলে ঘরে গিয়া সন্ধ্যা আহ্নিক করুন।"

রাজার সহি মোহর পাওয়া কিছু শক্ত কথা নহে। এখন রাজার কাছে যা হয় একখানা কাগজ ধরিয়া দিলেই তিনি সহি দেন—পড়িবার অবকাশ হয় না—চিত্তবিশ্রামে যাইতে হইবে। অতএব চন্দ্রচূড়, এই অপরাধীদিগের বর্‌তরফি পরওয়ানাতে রাজার সহি করাইয়া লইলেন। রাজা না পড়িয়াই সহি দিলেন।

কিন্তু তাহাতে চন্দ্রচূড়ের কার্য্যসিদ্ধি হইল না। প্রধান অপরাধী খাতাঞ্জি দরবারে উপস্থিত ছিল, সে দেখিল যে, রাজা না পড়িয়াই সহি দিলেন। রাজা চলিয়া গেলে, সে বলিল, "ও হুকুম মানি না। ও তোমার হুকুম—রাজার নয়। রাজা কাগজ পড়িয়াও দেখেন নাই। যখন রাজা স্বয়ং বিচার করিয়া আমাদিগকে বর্‌তরফ করিবেন, তখন আমরা যাইব,—এখন নহে।" কেহই গেল না। খুব চুরি করিতে লাগিল। ধনাগার তাহাদের হাতে, সুতরাং চন্দ্রচূড় কিছু করিতে পারিলেন না।

তাই আজ চন্দ্রচূড় রাজাকে পাকড়াও করিয়াছিলেন। রাজা দরবারে বসিলে, অপরাধীদিগের সমক্ষেই চন্দ্রচূড় কাগজপত্র সকল রাজাকে বুঝাইতে লাগিলেন। রাজা একে সমস্ত জগতের উপর রাগিয়াছিলেন, তাহাতে আবার চুরির বাহুল্য দেখিয়া ক্রোধে অত্যন্ত বিকৃতচিত্ত হইয়া উঠিলেন। রাজাজ্ঞা প্রচার করিলেন যে, অপরাধী সকলেই শূলে যাইবে।

হুকুম শুনিয়া আম দরবার শিহরিয়া উঠিল। চন্দ্রচূড় যেন বজ্রাহত হইলেন। বলিলেন, "সে কি মহারাজ! লঘু পাপে এত গুরু দণ্ড?"

রাজা ক্রোধে অধীর হইয়া বলিলেন, "লঘু পাপ কি? চোরের শূলই ব্যবস্থা।"

চন্দ্র। ইহার মধ্যে কয় জন ব্রাহ্মণ আছে। ব্রহ্মহত্যা করিবেন কি প্রকারে?

রাজা। ব্রাহ্মণদিগের নাক কাণ কাটিয়া, কপালে তপ্ত লোহার দ্বারা "চোর" লিখিয়া ছাড়িয়া দিবে। আর সকলে শূলে যাইবে।

এই হুকুম জারি করিয়া, রাজা চিত্তবিশ্রামে চলিয়া গেলেন। হুকুম মত অপরাধীদিগের দণ্ড হইল। নগরে হাহাকার পড়িয়া গেল। অনেক রাজকর্ম্মচারী কর্ম্ম ছাড়িয়া পলাইল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

চুরি বন্ধ হইল, কিন্তু টাকার তবু কুলান হয় না। রাজ্যের অবস্থা রাজাকে বলা নিতান্ত আবশ্যক, কিন্তু রাজাকে পাওয়া ভার, পাইলেও কথা হয় না। চন্দ্রচূড় সন্ধানে সন্ধানে ফিরিয়া আবার একদিন রাজাকে ধরিলেন—বলিলেন, "মহারাজ! একবার এ কথায় কর্ণপাত না করিলে রাজ্য থাকে না।"

রাজা। থাকে থাকে, যায় যায়। ভাল শুনিতেছি, বলুন কি হয়েছে ?

চন্দ্র। সিপাহী সব দলে দলে ছাড়িয়া চলিতেছে।

রাজা। কেন ?

চন্দ্র। বেতন পায় না।

রাজা। কেন পায় না ?

চন্দ্র। টাকা নাই।

রাজা। এখনও কি চুরি চলিতেছে না কি ?

চন্দ্র। না, চুরি বন্ধ হইয়াছে। কিন্তু তাতে কি হইবে ? যে টাকা চোরের পেটে গিয়েছে তা ত আর ফেরে নাই।

রাজা। কেন, আদায় তহশীল হইতেছে না ?

চন্দ্র। এক পয়সাও না।

রাজা। কারণ কি ?

চন্দ্র। যাহাদের প্রতি আদায়ের ভার, তাহারা কেহ বলে, "আদায় করিয়া শেষ তহবিল গরমিল হইলে শূলে যাব না কি ?"

রাজা। তাহাদের বরতরফ করুন।

চন্দ্র। নূতন লোক পাইব কোথায় ? আর কেবল নূতন লোকের দ্বারায় কি আদায় তহশীলের কাজ হয় ?

রাজা। তবে তাহাদিগকে কয়েদ করুন।

চন্দ্র। সর্ব্বনাশ! তবে আদায় তহশীল করিবে কে ?

রাজা! পনের দিনের মধ্যে যে বাকী বকেয়া সব আদায় না করিবে, তাহাকে কয়েদ করিব।

চন্দ্র। সকল তহশীলদারেরও দোষ নাই। দেনেওয়ালারা অনেকে দিতেছে না।

রাজা। কেন দেয় না ?

চন্দ্র। বলে, "মুসলমানের রাজ্য হইলে দিব। এখন দিয়া কি দোকর দিব ?"

রাজা। যে টাকা না দিবে, যাহার বাকী পড়িবে, তাহাকেও কয়েদ করিতে হইবে।

চন্দ্রচূড় হাঁ করিয়া রহিলেন। শেষ বলিলেন, "মহারাজ, কারাগারে এত স্থান কোথা ?"

রাজা। বড় বড় চালা তুলিয়া দিবেন।

এই বলিয়া বাকিদার ও তহশীলদার, উভয়ের কয়েদের হুকুমে স্বাক্ষর করিয়া রাজা চিত্তবিশ্রামে প্রস্থান করিলেন। চন্দ্রচূড় মনে মনে শপথ করিলেন, আর কখনও রাজাকে রাজকার্য্যের কোন কথা জানাইবেন না।

এই হুকুমে দেশে ভারি হাহাকার পড়িয়া গেল। কারাগার সকল ভরিয়া গেল—চন্দ্রচূড় চালা তুলিয়া কুলাইতে পারিলেন না। বাকিদার, তহশীলদার, উভয়েই দেশ ছাড়িয়া পলাইতে লাগিল। যে বাকিদার নয়, সেও সঙ্গে সঙ্গে পলাইতে লাগিল।

তাই বলিতেছিলাম যে, আগে আগুন ত জ্বলিয়াইছিল, এখন ঘর পুড়িল; যদি শ্রী না আসিত, তবে সীতারামের এতটা অবনতি হইত কি না জানি না; কেন না, সীতারাম ত মনে মনে স্থির করিয়াছিলেন যে, রাজ্যশাসনে মন দিয়া শ্রীকে ভুলিবেন—সে কথা যথাস্থানে বলিয়াছি। অসময়ে আসিয়া শ্রী দেখা দিল, সে অভিপ্রায় বালির বাঁধের মত আসক্তির বেগে ভাসিয়া গেল। রাজ্যে মন দিলেই যে সব আপদ্ ঘুচিত, তাহা নাই বলিলাম, কিন্তু শ্রী যদি আসিয়াছিল, তবে সে যদি নন্দার মত রাজপুরীমধ্যে মহিষী হইয়া থাকিয়া, নন্দার মত রাজার রাজধর্ম্মের সহায়তা করিত, তাহা হইলেও সীতারামের এতটা অবনতি হইত না বোধ হয়; কেন না, কেবল ঐশ্বর্য্যমদে যে অবনতিটুকু হইতেছিল, শ্রী ও নন্দার সাহায্যে সেটুকুরও কিছু খর্ব্বতা হইত। তা শ্রী, যদি রাজপুরীতে মহিষী না থাকিয়া, চিত্তবিশ্রামে আসিয়া উপপত্নীর মত রহিল, তবে সন্ন্যাসীর মত না থাকিয়া, সেই মত থাকিলেই এতটা প্রমাদ ঘটিত না। আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইলে তাহার মোহিনী শক্তির অনেক লাঘব হইত। কিছু দিনের পর রাজার চৈতন্য হইতে পারিত। তা, যদি শ্রী সন্ন্যাসিনী হইয়াই রহিল, তবে সোজা রকম সন্ন্যাসিনী হইলেও এ বিপদ্ হইত না। কিন্তু এই ইন্দ্রাণীর মত সন্ন্যাসিনী বাঘছালে বসিয়া বাক্যে মধুবৃষ্টি করিতে থাকিবে, আর সীতারাম কুকুরের মত তফাতে বসিয়া মুখ পানে চাহিয়া থাকিবে—অথচ সে সীতারামের স্ত্রী। পাঁচ বৎসর ধরিয়া সীতারাম তাহার জন্য প্রায় প্রাণপাত করিয়াছিলেন। এ দুঃখের কি আর তুলনা হয়! ইহাতেই সীতারামের সর্ব্বনাশ ঘটিল। আগে আগুন লাগিয়াছিল মাত্র,—এখন ঘর পুড়িল। সীতারাম আর সহ্য করিতে না পারিয়া, মনে মনে সঙ্কল্প করিলেন, শ্রীর উপর বলপ্রয়োগ করিবেন।

তবে যাকে ভালবাসে, তাহার উপর বলপ্রয়োগ বড় পামরেও পারে না। শ্রীর উপর রাজার যে ভালবাসা, তাহা এখন কাজেই ইন্দ্রিয়বশ্যতায় আসিয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু ভালবাসা এখনও যায় নাই। তাই বলপ্রয়োগে ইচ্ছুক হইয়াও সীতারাম তাহা করিতেছিলেন না। বলপ্রয়োগ করিব কি না, এ কথার মীমাংসা করিতে সীতারামের প্রাণ বাহির হইতেছিল। যত দিন না সীতারাম একটা এদিক্ ওদিক্ স্থির করিতে পারিলেন, তত দিন সীতারাম এক প্রকার জ্ঞানশূন্যাবস্থায় ছিলেন। সেই ভয়ানক সময়ের বুদ্ধিবিপর্য্যয়ে রাজপুরুষেরা শূলে গেল, আদায় তহশীলের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীরা কারাগারে গেল, বাকিদারেরা আবদ্ধ হইল, প্রজা সব পলাইল, রাজ্য ছারখারে যাইতে লাগিল।

শেষ সীতারাম স্থির করিলেন, শ্রীর প্রতি বলপ্রয়োগই করিবেন। কথাটা মনোমধ্যে স্থির হইয়া কার্য্যে পরিণত হইতে না হইতেই অকস্মাৎ এক গোলযোগ উপস্থিত হইল। চন্দ্রচূড় ঠাকুর রাজাকে আর একদিন পাকড়া করিয়া বলিলেন, "মহারাজ! তীর্থপর্য্যটনে যাইব ইচ্ছা করিয়াছি। আপনি অনুমতি করিলেই যাই।"

কথাটা রাজার মাথায় যেন বজ্রাঘাতের মত পড়িল। চন্দ্রচূড় গেলে নিশ্চয়ই শ্রীকে পরিত্যাগ করিতে হইবে, নয় রাজ্য পরিত্যাগ করিতে হইবে। অতএব রাজা চন্দ্রচূড় ঠাকুরকে তীর্থযাত্রা হইতে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

এখন চন্দ্রচূড় ঠাকুরের স্থির সিদ্ধান্ত এই যে, এ পাপ রাজ্যে আর বাস করিবেন না, এই পাপিষ্ঠ রাজার কর্ম্ম আর করিবেন না। অতএব তিনি সহজে সম্মত হইলেন না। অনেক কথাবার্ত্তা হইল। চন্দ্রচূড় অনেক তিরস্কার করিলেন। রাজাও অনেক উত্তর প্রত্যুত্তর করিলেন। শেষে চন্দ্রচূড় থাকিতে সম্মত হইলেন। কিন্তু কথায় কথায় অনেক রাত্রি হইল। কাজেই রাজা সে দিন চিত্তবিশ্রামে গেলেন না। এদিকে চিত্তবিশ্রামে সেই রাত্রে একটা কাণ্ড উপস্থিত হইল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

সেই দিন দৈবগতিকে চিত্তবিশ্রামের দ্বারদেশে এক জন ভৈরবী আসিয়া দর্শন দিল। এখন চিত্তবিশ্রাম ক্ষুদ্র প্রমোদগৃহ হইলেও রাজগৃহ; জনকত দ্বারবানও দ্বারদেশে আছে। ভৈরবী দ্বারবানদিগের নিকট পথ ভিক্ষা করিল।

দ্বারবানেরা বলিল, "এ রাজবাড়ী—এখানে একটি রাণী থাকেন। কাহারও যাইবার হুকুম নাই।" বলা বাহুল্য যে, রাজাদিগের উপরাণীরাও ভৃত্যদিগের নিকট রাণী নাম পাইয়া থাকে।

ভৈরবী বলিল, "আমার তাহা জানা আছে। রাজাও আমায় জানেন। আমার যাইবার নিষেধ নাই। তোমরা গিয়া রাজাকে জানাও।"

দ্বারবানেরা বলিল, "রাজা এখন এখানে নাই—রাজধানী গিয়াছেন।"

ভৈরবী। তবে যে রাণী এখানে থাকেন, তাঁহাকেই জানাও। তাঁর হুকুমে হইবে না?

দ্বারবানেরা মুখ চাওয়াচাওয়ি করিল। চিত্তবিশ্রামের অন্তঃপুরে কখনও কেহ প্রবেশ করিতে পায় নাই—রাজার বিশেষ নিষেধ। রাণীরও নিষেধ। রাজার অবর্ত্তমানে দুই এক জন স্ত্রীলোক (নন্দার প্রেরিতা) অন্তঃপুরে যাইতে চাহিয়াছিল, কিন্তু রাণীকে সংবাদ

দেওয়াতে তিনি কাহাকেও আসিতে দিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। তবে আবার রাণীকে খবর দেওয়া যাইবে কি ? তবে এ ভৈরবীটার মূর্ত্তি দেখিয়া ইহাকে মনুষ্য বলিয়া বোধ হয় না—তাড়াইয়া দিলেও যদি কোন গোলযোগ ঘটে।

দ্বারবানেরা সাত পাঁচ ভাবিয়া পরিচারিকার দ্বারা অন্তঃপুরে সংবাদ পাঠাইল। ভৈরবী আসিতেছে শুনিয়া শ্রী তখনই আসিবার অনুমতি দিল। জয়ন্তী অন্তঃপুরে গেল।

দেখিয়া শ্রী বলিল, "আসিয়াছ, ভাল হইয়াছে। আমার এমন সময় উপস্থিত হইয়াছে যে, তোমার পরামর্শ নহিলে চলিতেছে না।"

জয়ন্তী বলিল, "আমি ত এই সময়ে তোমার সংবাদ লইতে আসিব বলিয়া গিয়াছিলাম। এখন সংবাদ কি, বল। নগরে শুনিলাম, রাজ্যের নাকি বড় গোলযোগ। আর তুমিই নাকি তার কারণ ? টোলে টোলে শুনিয়া আসিলাম, ছাত্রেরা সব রঘুর ঊনবিংশের শ্লোক আওড়াইতেছে। ব্যাপারটা কি ?"

শ্রী বলিল, "তাই তোমায় খুঁজিতেছিলাম।" শ্রী তখন আদ্যোপান্ত সকল বলিল। জয়ন্তী বলিল, "তবে তোমার অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম করিতেছ না কেন ?"

শ্রী। সেটা ত বুঝিতে পারিতেছি না।

জয়ন্তী। রাজধানীতে যাও। রাজপুরীমধ্যে মহিষী হইয়া বাস কর। সেখানে রাজার প্রধান মন্ত্রী হইয়া তাঁহাকে স্বধর্ম্মে রাখ। এ তোমারই কাজ।

শ্রী। তা ত জানি না। মহিষীর ধর্ম্ম ত শিখি নাই। সন্ন্যাসিনীর ধর্ম্ম শিখাইয়াছ, তাই শিখিয়াছি। যাহা জানি না, যাহা পারি না, সেই ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া সব গোল করিব। সন্ন্যাসিনী মহিষী হইলে কি মঙ্গল হইবে ?

জয়ন্তী ভাবিল। বলিল, "তা আমি বলিতে পারি না। তোমা হইতে সে ধর্ম্ম পালন হইবে না, বোধ হইতেছে—তাহা হইবার সম্ভাবনা থাকিলে কি এত দূর হয় ?"

শ্রী। বুঝি সে একদিন ছিল। যে দিন আঁচল দোলাইয়া মুসলমান সেনা ধ্বংস করিয়াছিলাম—সে দিন থাকিলে বুঝি হইত। কিন্তু অদৃষ্ট সে পথে গেল না, সে শিক্ষা হইল না। অদৃষ্ট গেল ঠিক উল্‌টা পথে—বনবাসে—সন্ন্যাসে গেল। কে জানে আবার অদৃষ্ট ফিরিবে ?

জ। এখন উপায় ?

শ্রী। পলায়ন ভিন্ন ত আর উপায় দেখি না। কেবল রাজার জন্য বা রাজ্যের জন্য বলি না। আমার আপনার জন্যও বলিতেছি। রাজাকে রাত্রি দিন দেখিতে দেখিতে অনেক সময়ে মনে হয়, আমি গৃহিণী, উঁহার ধর্ম্মপত্নী।

জ। তা ত বটেই।

শ্রী। তাতে পুরাণ কথা মনে আসে ; আবার কি ভালবাসার ফাঁদে পড়িব ? তাই, আগেই বলিয়াছিলাম, রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ না করাই ভাল। শত্রু, রাজা লইয়া বার জন।

জয়ন্তী। আর এগার জন আপনার শরীরে ? ভারি ত সন্ন্যাস সাধিয়াছ, দেখিতেছি। যাহা জগদীশ্বরে সমর্পণ করিয়াছিলে, তাহা আবার কাড়িয়া লইয়াছ, দেখিতেছি। আবার আপনার ভাবনাও ভাবিতে শিখিয়াছ, দেখিতেছি। একে কি বলে সন্ন্যাস ?

শ্রী। তাই বলিতেছিলাম, পলায়নই বিধি কি না ?

জ। বিধি বটে।

শ্রী। রাজা বলেন, আমি পলাইলে তিনি আত্মঘাতী হইবেন।

জ। পুরুষ মানুষের মেয়ে ভুলান কথা। পুষ্পশরাহতের প্রলাপ।

শ্রী। সে ভয় নাই ?

জ। থাকিলে তোমার কি ? রাজা বাঁচিল মরিল, তাতে তোমার কি ? তোমার স্বামী বলিয়া কি তোমার এত ব্যথা ? এই কি সন্ন্যাস ?

শ্রী। তা হোক না হোক—রাজা মরিলেই কোন্ সর্ব্বভূতের হিতসাধন হইল ?

জ। রাজা মরিবে না, ভয় নাই। ছেলে খেলানা হারাইলে কাঁদে, মরে না। তুমি ঈশ্বরে কর্ম্মসংন্যাস করিয়া যাহাতে সংযতচিত্ত হইতে পার, তাই কর।

শ্রী। তা হইলে এখান হইতে প্রস্থান করিতে হয়।

জ। এখনই।

শ্রী। কি প্রকারে যাই ? দ্বারবানেরা ছাড়িবে কেন ?

জ। তোমার সে গৈরিক, রুদ্রাক্ষ, ত্রিশূল, সবই আছে দেখিতেছি। ভৈরবীবেশে পলাও, দ্বারবানেরা কিছু বলিবে না।

শ্রী। মনে করিবে, তুমি যাইতেছ ? তার পর তুমি যাইবে কি প্রকারে ?

জয়ন্তী হাসিয়া বলিল, "এ কি আমার সৌভাগ্য ! এত কালের পর আমার জন্য ভাবিবার একটা লোক হইয়াছে। আমি নাই যাইতে পারিলাম, তাতে ক্ষতি কি দিদি ?"

শ্রী। রাজার হাতে পড়িবে—কি জানি, রাজা যদি তোমার উপর ক্রুদ্ধ হন।

জ। হইলে আমার কি করিবেন ? রাজার এমন কোন ক্ষমতা আছে কি যে, সন্ন্যাসিনীর অনিষ্ট করিতে পারে ?

জয়ন্তীর উপর শ্রীর অনন্ত বিশ্বাস। সুতরাং শ্রী আর বাদানুবাদ না করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার সঙ্গে কোথায় সাক্ষাৎ হইবে ?"

জ। তুমি বরাবর—গ্রামে যাও। সেখানে রাজার পুরোহিতের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিও। তোমার ত্রিশূল আমাকে দাও, আমার ত্রিশূল তুমি নাও। সে গ্রামের রাজার

পুরোহিত আমার মন্ত্রশিষ্য। তিনি আমার চিহ্নিত ত্রিশূল দেখিলে তুমি যা বলিবে, তাই করিবেন। তাঁকে বলিও, তোমাকে অতি গোপনীয় স্থানে লুকাইয়া রাখেন। কেন না, তোমার জন্য বিস্তর খোঁজ তল্লাস হইবে। তিনি তোমাকে রাজপুরীমধ্যে লুকাইয়া রাখিবেন। সেইখানে তোমার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হইবে।

তখন শ্রী জয়ন্তীর পদধূলি গ্রহণ করিয়া আবার বনবাসে নিষ্ক্রান্ত হইল। দ্বারবানেরা কিছু বলিল না।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

রামচাঁদ। ভয়ানক ব্যাপার! লোক অস্থির হ'য়ে উঠ্‌লো।

শ্যামচাঁদ। তাই ত দাদা। আর তিলার্দ্ধ এ রাজ্যে থাকা নয়।

রামচাঁদ। তা তুমি ত আজ কত দিন ধ'রে যাই যাই ক'চ্ছো—যাও নি যে?

শ্যামচাঁদ। যাওয়ারই মধ্যে, মেয়ে ছেলে সব নলডাঙ্গা পা'ঠিয়ে দিয়েছি। তবে আমার কিছু লহনা পড়ে রয়েছে, সেগুলা যত দূর হয়, আদায় ওসুল ক'রে নিয়ে যাই। আর আদায় ওসুল বা করবো কার কাছে—দেনেওয়ালারাও সব ফেরার হয়েছে।

রামচাঁদ। আচ্ছা, এ আবার নূতন ব্যাপার কি? কেন এত হাঙ্গামা, তা কিছু জান? শুনেছি না কি, হাবুজখানায় আর কয়েদী ধরে না, নূতন চালাগুলাতেও ধরে না, এখন না কি গোহালের গোরু বাহির করিয়া কয়েদী রাখ্‌ছে?

শ্যামচাঁদ। ব্যাপারটা কি জান না? সেই ডাকিনীটা পালিয়েছে।

রাম। তা শুনেছি। আচ্ছা, সে ডাকিনীটা ত এত যাগ যজ্ঞে কিছুতেই গেল না—এখন আপনি পালাল যে?

শ্যাম। আপনি কি আর গিয়েছে? (চুপি চুপি) বল্‌তে গায়ে কাঁটা দেয়। সে নাকি দেবতার তাড়নায় গিয়েছে।

রাম। সে কি?

শ্যাম। এই নগরে এক দেবী অধিষ্ঠান করেন শুন নি? তিনি কখন কখন দেখা দেন—অনেকেই তাঁকে দেখেছে। কেন, যে দিন ছোট রাণীর পরীক্ষা হয়, সে দিন তুমি ছিলে না?

রাম। হাঁ। হাঁ। সেই তিনিই। আচ্ছা, বল দেখি তিনি কে?

শ্যাম। তা তিনি কি কারও কাছে আপনার পরিচয় দিতে গিয়েছেন। তবে পাঁচ জন লোকে পাঁচ রকম বল্‌চে।

রাম। কি বলে?

শ্যাম। কেউ বলে, তিনি এই পুরীর রাজলক্ষ্মী। কেউ বলে, তিনি স্বয়ং লক্ষ্মী-নারায়ণ জিউর মন্দির হইতে কখনও কখনও রূপ ধারণ ক'রে বা'র হন, লোকে এমন দেখেছে। কেউ বলে, তিনি স্বয়ং দশভুজা; দশভুজার মন্দিরে গিয়া অন্তর্দ্ধান হ'তে তাঁকে না কি দেখেছে।

রাম। তাই হবে। নইলে তিনি ভৈরবীবেশ ধারণ কর্‌বেন কেন? সে সভায় ত তিনি ভৈরবীবেশে অধিষ্ঠান করেছিলেন?

শ্যাম। তা যিনিই হ'ন, আমাদের অনেক ভাগ্য যে, আমরা তাঁকে সে দিন দর্শন করেছিলাম। কিন্তু রাজার এমনই মতিচ্ছন্ন ধরেছে যে—

রাম। হাঁ—তার পর ডাকিনীটা গেল কি ক'রে শুনি।

শ্যাম। সেই দেবী, ডাকিনী হ'তে রাজ্যের অমঙ্গল হ'চ্ছে দেখে, এক দিন ভৈরবী-বেশে ত্রিশূল ধারণ ক'রে তাকে বধ করতে গেলেন।

রাম। ইঃ! তার পর?

শ্যাম। তার পর আর কি? মার রণরঙ্গিণী মূর্ত্তি দেখে, সেটা তালগাছপ্রমাণ বিকটাকার মূর্ত্তি ধারণ ক'রে ঘোর গর্জ্জন কর্‌তে কর্‌তে কোথায় যে আকাশপথে উড়ে গেল, কেউ আর দেখ্‌তে পেলে না।

রাম। কে বল্‌লে?

শ্যাম। বল্‌লে আর কে? যারা দেখেছে, তারাই বলেছে। রাজা এমনই সেই ডাকিনীর মায়ায় বদ্ধ যে, সেটা গেছে ব'লে চিত্তবিশ্রামের যত দ্বারবান দাস দাসী, সবাইকে ধরে এনে কয়েদ করেছেন। তারাই এই সব কথা প্রকাশ করেছে। তারা বলে, "মহারাজ! আমাদের অপরাধ কি? দেবতার কাছে আমরা কি কর্‌ব?"

রাম। গল্প কথা নয় ত?

শ্যাম। এ কি আর গল্প কথা!

রাম। কি জানি। হয় ত ডাকিনীটা মড়া ফড়া খাবার জন্য রাত্রিতে কোথা বেরিয়ে গিয়েছিল, আর আসে নি। এখন রাজার পীড়াপীড়িতে তারা আপনার বাঁচন জন্য একটা রচে মচে বলচে।

শ্যাম। এ কি আর রচা কথা? তারা দেখেছে যে, সেটার এমন এমন মূলোর মত দাঁত, শোনের মত চুল, বারকোশের মত চোক, একটা আস্ত কুমীরের মত জিব, দুটো জালার মত দুটো স্তন, মেঘগর্জ্জনের মত নিশ্বাস, আর ডাকেতে একেবারে মেদিনী বিদীর্ণ।

রাম। সর্ব্বনাশ! এ ত বড় অদ্ভুত ব্যাপার! রাজার মতিচ্ছন্ন ধরেছে বলছিলে কি?

শ্যাম। তাই বল্‌চি শোন না। এই ত গেল নিরপরাধী বেচারাদের নাহক কয়েদ। তার পর, সেই ডাকিনীটাকে খুঁজে ধরে আন্‌বার জন্য রাজা ত দিক্‌ বিদিকে কত লোকই পাঠাচ্চেন। এখন সে আপনার স্বস্থানে চলে গেছে, মনুষ্যের সাধ্য কি যে, তাকে সন্ধান ক'রে ধ'রে আনে। কেউ তা পার্‌চে না—সবাই এসে যোড় হাত ক'রে এত্তেলা কর্‌ছে যে, সন্ধান করতে পার্‌লে না।

রাম। তাতে রাজা কি বলেন?

শ্যাম। এখন যাই কেউ ফিরে এসে বল্‌চে যে, সন্ধান পেলে না, অমনই রাজা তাকে কয়েদে পাঠাচ্চেন। এই করে ত হাবুজখানা পরিপূর্ণ। এ দিকে রাজপুরুষদের এমনই ভয় লেগেছে যে, বাড়ী, ঘর, দ্বার, স্ত্রী, পুত্র ছেড়ে পালাচ্চে। দেখাদেখি নগরের প্রজা দোকানদারও সব পালাচ্চে।

রাম। তা, দেবী কি করেন? তিনি কটাক্ষ করিলেই ত এই সকল নিরপরাধী লোক রক্ষা পায়।

শ্যাম। তিনি সাক্ষাৎ ভগবতী। তিনি এই সকল ব্যাপার দেখিয়া ভৈরবীবেশে রাজাকে দর্শন দিয়া বলিলেন, "রাজা! নিরপরাধীর পীড়ন করিও না। নিরপরাধীর পীড়ন করিলে, রাজার রাজ্য থাকে না। এদের কোন দোষ নাই। আমিই সেটাকে তাড়াইয়াছি—কেন না, সেটা হ'তে তোমার রাজ্যের অমঙ্গল হতেছিল। দোষ হয়ে থাকে, আমারই হয়েছে। দণ্ড করিতে হয়, ওদের ছেড়ে দিয়ে আমারই দণ্ড কর।

রাম। তার পর?

শ্যাম। তাই বল্‌ছিলাম, রাজার বড় মতিচ্ছন্ন ধরেছে। সেটা পালান অবধি রাজার মেজাজ এমন গরম যে, কাক পক্ষী কাছে যেতে পাচ্চে না। তর্কালঙ্কার ঠাকুর কাছে গিয়েছিলেন, বড় রাণী কাছে গিয়েছিলেন, গাল খেয়ে পালিয়ে এলেন।

রাম। সে কি! গুরুকে গালি গালাজ? নির্ব্বংশ হবেন যে!

শ্যাম। তার কি আর কথা আছে? তার পর শোন না। গরম মেজাজের প্রথম মোহড়াতেই সেই দেবতা গিয়া দর্শন দিয়া ঐ কথা বললেন। বলতেই রাজা চক্ষু আরক্ত করিয়া তাঁকে স্বহস্তে প্রহার করিতেই উদ্যত। তা না ক'রে, যা করেছে, সে ত আরও ভয়ানক!

রাম। কি করেছে?

শ্যাম। ঠাকুরাণীকে কয়েদ করেছে। আর হুকুম দিয়েছে যে, তিন দিন মধ্যে ডাকিনীকে যদি না পাওয়া যায়, তবে সমস্ত রাজ্যের লোকের সমুখে (সেই দেবীকে) উলঙ্গ ক'রে চাঁড়ালের দ্বারা বেত মারিবে।

রাম। হো! হো! হোহো! দেবতার আবার কি কর্‌বে! রাজা কি পাগল হয়েছে! তা, মা কি কয়েদে গিয়েছেন না কি? তাঁকে কয়েদ করে কার বাপের সাধ্য?

শ্যাম। দেবচরিত্র কার সাধ্য বুঝে। রাজার না কি রাজ্যভোগের নির্দ্দিষ্ট কাল ফুরিয়েছে, তাই মা ছল ধরিয়া, এখন স্বধামে গমনের চেষ্টায় আছেন। রাজা কয়েদের হুকুম দিলেন, মা স্বচ্ছন্দে গজেন্দ্রগমনে কারাগারমধ্যে গিয়া প্রবেশ করিলেন। শুনিতে পাই, রাত্রে কারাগারে মহাকোলাহল উপস্থিত হয়। যত দেবতারা আসিয়া স্তব পাঠ করেন—ঋষিরা আসিয়া বেদ পাঠ, মন্ত্র পাঠ করেন। পাহারাওয়ালারা বাহির হইতে শুনিতে পায়, কিন্তু দ্বার খুলিলেই সব অন্তর্দ্ধান হয়। (বলা বাহুল্য যে, জয়ন্তী নিজেই রাত্রিকালে ঈশ্বরস্তোত্র পাঠ করেন। পাহারাওয়ালারা তাহাই শুনিতে পায়।)

রাম। তার পর?

শ্যাম। তার পর এখন আজ সে তিন দিন পূরিল। রাজা ঢেঁট্‌রা দিয়েছেন যে, কাল এক মাগী চোরকে বেইজ্জৎ করিয়া বেত মারা যাইবে, যাহার ইচ্ছা হয়, দেখিতে আসিতে পারে। শুন নাই?

রাম। কি দুর্ব্বুদ্ধি! তর্কালঙ্কার ঠাকুরই বা কিছু বলেন না কেন? বড় রাণী বা কিছু বলেন না কেন? দুটো গালাগালির ভয়ে কি তাঁরা আর কাছে আসিতে পারেন না?

শ্যাম। তাঁরা না কি অনেক বলেছেন। রাজা বলেন, ভাল, দেবতাই যদি হয়, তবে আপনার রক্ষা আপনিই করিবে, তোমাদের কথা কবার প্রয়োজন কি? আর যদি মানুষ হয়, তবে আমি রাজা, চোরের দণ্ড আমি দিব, তোমাদের কথা কবার প্রয়োজন কি?

রাম। তা এক রকম বলেছে মন্দ নয়—ঠিক কথাই ত। তা ব্যাপারটা কি হয়, কাল দেখ্‌তে যেতে হবে। তুমি যাবে?

শ্যাম। যাব বৈ কি। সবাই যাবে। এমন কাণ্ড কে না দেখতে যাবে?

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

আজ জয়ন্তীর বেত্রাঘাত হইবে। রাজ্যে ঘোষণা দেওয়া হইয়াছে যে, তাহাকে বিবস্ত্রা করিয়া বেত্রাঘাত করা হইবে। প্রভাত হইতে লোক আসিতে আরম্ভ করিল। বেলা অল্প হইতেই দুর্গ পরিপূর্ণ হইল, আর লোক ধরে না। ক্রমে ঠেসাঠেসি ঘেঁসাঘেঁসি পেষাপেষি মিশামিশি হইতে লাগিল। এই দুর্গমধ্যে আর এক দিন এমনই লোকারণ্য হইয়াছিল—সে দিন রমার বিচার। আজ জয়ন্তীর দণ্ড। বিচার অপেক্ষা দণ্ড দেখিতে লোক বেশী আসিল। নন্দা বাতায়ন হইতে দেখিলেন, কালো চুল মাথার তরঙ্গ ভিন্ন আর

কিছু দেখা যায় না; কদাচিৎ কোন স্ত্রীলোকের মাথায় আঁচল বা কোন পুরুষের মাথায় চাদর জড়ান, সেই কৃষ্ণসাগরে ফেনরাশির ন্যায় ভাসিতেছে। সেই রমার পরীক্ষা নন্দার মনে পড়িল, কিন্তু মনে পড়িল যে, সে দিন দেখিয়াছিলেন যে, সেই জনার্ণব বড় চঞ্চল, সংক্ষুব্ধ, যেন বাত্যাতাড়িত; রাজপুরুষেরা কষ্টে শান্তি রক্ষা করিয়াছিল;—আজ সকলেই নিস্তব্ধ। সকলেরই মনে রাজ্যের অমঙ্গল আশঙ্কা বড় জাগরূক। সকলেই মনে মনে ভয় পাইতেছিল। আজ এই লোকারণ্য সিংহব্যাঘ্রবিমর্দ্দিত মহারণ্য অপেক্ষাও ভয়ানক দেখাইতেছিল।

সেই বৃহৎ দুর্গপ্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে এক উচ্চ মঞ্চ নির্ম্মিত হইয়াছিল। তদুপরি এক কৃষ্ণকায় বলিষ্ঠগঠন বিকটদর্শন চণ্ডাল, মূর্ত্তিমান্ অন্ধকারের ন্যায় দীর্ঘ বেত্র হস্তে লইয়া দণ্ডায়মান আছে। জয়ন্তীকে তদুপরি আরোহণ করাইয়া সর্ব্বসমক্ষে বিবস্ত্রা করিয়া সেই চণ্ডাল বেত্রাঘাত করিবে, ইহাই রাজাজ্ঞা।

জয়ন্তীকে এখনও সেখানে আনা হয় নাই। রাজা এখনও আসেন নাই—আসিলে তবে তাহাকে আনা হইবে। মঞ্চের সম্মুখে রাজার জন্য সিংহাসন রক্ষিত হইয়াছে। তাহা বেষ্টন করিয়া চোপদার ও সিপাহীগণ দাঁড়াইয়া আছে। অমাত্যবর্গ আজ সকলেই অনুপস্থিত। এমন কুকাণ্ড দেখিতে আসিতে কাহারও প্রবৃত্তি হয় নাই। রাজাও কাহাকে ডাকেন নাই।

কতক্ষণে রাজা আসিবেন, কতক্ষণে সেই দণ্ডনীয় দেবী বা মানবী আসিবে, কতক্ষণে কি হইবে, সেই জন্য প্রত্যাশাপন্ন হইয়া লোকারণ্য ঊর্দ্ধমুখ হইয়াছিল। এমন সময়ে হঠাৎ নকিব ফুকরাইল; স্তাবকেরা স্তুতিবাদ করিল। দর্শকেরা জানিল, রাজা আসিতেছেন।

রাজার আজ বেশভূষার কিছুমাত্র পারিপাট্য নাই—বৈশাখের দিনান্তকালের মেঘের মত রাজা আজ ভয়ঙ্করমূর্ত্তি! আয়ত চক্ষু রক্তবর্ণ—বিশাল বক্ষ মধ্যে মধ্যে স্ফীত ও উচ্ছ্বসিত হইতেছে। বর্ষণোন্মুখ জলধরের উন্নমনের ন্যায় রাজা আসিয়া সিংহাসনের উপর বসিলেন। কেহ বলিল না, "মহারাজাধিরাজকি জয়!"

তখন সেই লোকারণ্য ঊর্দ্ধমুখ হইয়া ইতস্ততঃ দেখিতে লাগিল—দেখিল, সেই সময়ে প্রহরিগণ জয়ন্তীকে লইয়া মঞ্চোপরি আরোহণ করিতেছে। প্রহরীরা তাহাকে মঞ্চোপরি স্থাপিত করিয়া চলিয়া গেল। কোন প্রাসাদশিখরোপরি উদিত পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় জয়ন্তীর অতুলনীয় রূপরাশি সেই মঞ্চোপরি উদিত হইল। তখন সেই সহস্র সহস্র দর্শক ঊর্দ্ধমুখে, উৎক্ষিপ্তলোচনে গৈরিকবসনাবৃতা মঞ্চস্থা অপূর্ব্ব জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। সেই উন্নত, সম্পূর্ণায়ত, ললিত মধুর অথচ উজ্জ্বল জ্যোতির্বিশিষ্ট দেহ; তাহার দেবোপম স্থৈর্য্য—দেবদুর্ল্লভ শান্তি; সকলে বিমুগ্ধ হইয়া দেখিতে লাগিল। দেখিল, জয়ন্তীর

নবরবিকরপ্রোদ্ভিন্ন পদ্মবৎ অপূর্ব্ব প্রফুল্ল মুখ; এখনও অধরভরা মৃদু মৃদু মধুর স্নিগ্ধ বিনম্র হাস্য—সর্ব্ববিপৎসংহারিণী শক্তির পরিচয়স্বরূপ সেই স্নিগ্ধ মধুর মন্দহাস্য। দেখিয়া, অনেকে দেবতা জ্ঞানে যুক্তকরে প্রণাম করিল। যখন কতকগুলি লোক দেখিল, আর কতকগুলি লোক জয়ন্তীকে প্রণাম করিতেছে—তখন তাহাদের মনে সেই ভক্তিভাব প্রবেশ করিল। তখন তাহারা "জয় মায়িকি জয়!" "জয় লছ্‌মী মায়িকি জয়!" ইত্যাদি ঘোর রবে জয়ধ্বনি করিল। সেই জয়ধ্বনি ক্রমে ক্রমে প্রাঙ্গণের এক ভাগ হইতে অপর ভাগে, এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্তে গিরিশ্রেণীস্থিত বজ্রনাদের মত প্রক্ষিপ্ত ও প্রবাহিত হইতে লাগিল। শেষ সেই সমবেত লোকসমারোহ এককণ্ঠ হইয়া তুমুল জয়শব্দ করিল। পুরী কম্পিতা হইল। চণ্ডালের হস্ত হইতে বেত্র খসিয়া পড়িল। জয়ন্তী মনে মনে ডাকিতে লাগিল, "জয় জগদীশ্বর! তোমারই জয়! তুমি আপনি এই লোকারণ্য, আপনিই এই লোকের কণ্ঠে থাকিয়া, আপনার জয়বাদ আপনিই দিতেছ! জয় জগন্নাথ! তোমারই জয়! আমি কে?"

ক্রুদ্ধ রাজা তখন অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া মেঘগম্ভীরস্বরে চণ্ডালকে আজ্ঞা করিলেন, "কাপড় কাড়িয়া নিয়া বেত লাগা!"

এই সময়ে চন্দ্রচূড় তর্কালঙ্কার সহসা রাজসমীপে আসিয়া রাজার দুইটি হাত ধরিলেন। বলিলেন, "মহারাজ! রক্ষা কর! আমি আর কখনও ভিক্ষা চাহিব না, এইবার আমায় এই ভিক্ষা দাও—ইহাকে ছাড়িয়া দাও!"

রাজা। (ব্যঙ্গের সহিত) কেন—দেবতার এমন সাধ্য নাই যে, আপনি ছাড়াইয়া যায়! বেটী জুয়াচোরের উচিত শাসন হইতেছে।

চন্দ্র। দেবতা না হইল—স্ত্রীলোক বটে।

রাজা। স্ত্রীলোকেরও রাজা দণ্ড করিতে পারেন।

চন্দ্র। এই জয়ধ্বনি শুনিতেছেন? এই জয়ধ্বনিতে আপনার রাজার নাম ডুবিয়া যাইতেছে।

রাজা। ঠাকুর! আপনার কাজে যাও। পুঁথি পাঁজি নাই কি?

চন্দ্রচূড় চলিয়া গেলেন। তখন চণ্ডাল পুনরপি রাজাজ্ঞা পাইয়া আবার বেত উঠাইয়া লইল—বেত উঁচু করিল—জয়ন্তীর মুখ প্রতি চাহিয়া দেখিল; বেত নামাইয়া—রাজার পানে চাহিল—আবার জয়ন্তীর পানে চাহিল—শেষ বেত আছাড়িয়া ফেলিয়া দিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

"কি!" বলিয়া রাজা বজ্রের ন্যায় শব্দ করিলেন।

চণ্ডাল বলিল, "মহারাজ! আমা হইতে হইবে না।"

রাজা বলিলেন, "তোমাকে শূলে যাইতে হইবে।"

চণ্ডাল যোড়হাত করিয়া বলিল, "মহারাজের হুকুমে তা পারিব। এ পারিব না।"

তখন রাজা অনুচরবর্গকে আদেশ করিলেন, "চণ্ডালকে ধরিয়া লইয়া গিয়া কয়েদ কর।"

রক্ষিবর্গ চণ্ডালকে ধরিবার জন্য মঞ্চের উপর আরোহণ করিতে উদ্যত দেখিয়া, জয়ন্তী সীতারামকে বলিলেন, "এ ব্যক্তিকে পীড়ন করিবেন না, আপনার যে আজ্ঞা, আমি নিজেই পালন করিতেছি—চণ্ডাল বা জল্লাদের প্রয়োজন নাই।" তথাপি রক্ষিবর্গ চণ্ডালকে ধরিতে আসিতেছে দেখিয়া, জয়ন্তী তাহাকে বলিল, "বাছা! তুমি আমার জন্য কেন দুঃখ পাইবে? আমি সন্ন্যাসিনী, আমার কিছুতেই সুখ দুঃখ নাই; বেতে আমার কি হইবে? আর বিবস্ত্র—সন্ন্যাসীর পক্ষে সবস্ত্র বিবস্ত্র সমান। কেন দুঃখ পাও—বেত তোল।"

চণ্ডাল বেত উঠাইল না। জয়ন্তী তখন চণ্ডালকে বলিল, "বাছা! স্ত্রীলোকের কথা বলিয়া বিশ্বাস করিলে না—এই তার প্রমাণ দেখ।" এই বলিয়া জয়ন্তী আপনি বেত উঠাইয়া লইয়া, দক্ষিণ হস্তে দৃঢ়মুষ্টিতে তাহা ধরিল। পরে সেই জনসমারোহ সমক্ষে, আপনার প্রফুল্লপদ্মসন্নিভ রক্তপ্রভ ক্ষুদ্র করপল্লব পাতিয়া, সবলে তাহাতে বেত্রাঘাত করিল। বেত, মাংস কাটিয়া লইয়া উঠিল—হাতে রক্তের স্রোত বহিল। জয়ন্তীর গৈরিক বস্ত্র এবং মঞ্চতল তাহাতে প্লাবিত হইল। দেখিয়া লোকে হাহাকার করিতে লাগিল।

জয়ন্তী মৃদু হাসিয়া চণ্ডালকে বলিল, "দেখিলে বাছা! সন্ন্যাসিনীকে কি লাগে? তোমার ভয় কি?"

চণ্ডাল একবার রুধিরাক্ত ক্ষত পানে চাহিল—একবার জয়ন্তীর সহাস্য প্রফুল্ল মুখ পানে চাহিয়া দেখিল—দেখিয়া পশ্চাৎ ফিরিয়া, অতি ত্রস্তভাবে মঞ্চসোপান অবরোহণ করিয়া, ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল। লোকারণ্যমধ্যে সে কোথায় লুকাইল, কেহ দেখিতে পাইল না।

রাজা তখন অনুচরবর্গকে আজ্ঞা করিলেন, "দোস্‌রা লোক লইয়া আইস—মুসলমান।"

অনুচরবর্গ, কালান্তক যমের সদৃশ এক জন কসাইকে লইয়া আসিল। সে মহম্মদপুরে গোরু কাটিতে পারিত না—কিন্তু নগরপ্রান্তে বক্‌রি মেড়া কাটিয়া বেচিত। সে ব্যক্তি অতিশয় বলবান্ ও কদাকার। সে রাজাজ্ঞা পাইয়া মঞ্চের উপর উঠিয়া, বেত হাতে লইয়া জয়ন্তীর সম্মুখে দাঁড়াইল। বেত উঁচু করিয়া, কসাই জয়ন্তীকে বলিল, "কাপ্‌ড়া উতার্—তেরি গোশ্‌ত টুক্‌রা টুক্‌রা করকে হাম দোকানমে বেচেঙ্গে।"

জয়ন্তী তখন অপরিম্লান মুখে, জনসমারোহকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "রাজাজ্ঞায় এই মঞ্চের উপর বিবস্ত্র হইব। তোমাদের মধ্যে যে সতীপুত্র হইবে, সেই আপনার মাতাকে স্মরণ করিয়া ক্ষণকালের জন্য এখন চক্ষু আবৃত করুক। যাহার কন্যা আছে, সেই আপনার

কন্যাকে মনে করিয়া, আমাকে সেই কন্যা ভাবিয়া চক্ষু আবৃত করুক। যে হিন্দু, যাহার দেবতা ব্রাহ্মণে ভক্তি আছে, সেই চক্ষু আবৃত করুক। যাহার মাতা অসতী, যে বেশ্যার গর্ভে জন্মিয়াছে, সে যাহা ইচ্ছা করুক, তাহার কাছে আমার লজ্জা নাই, আমি তাহাদের মনুষ্যের মধ্যে গণ্য করি না।"

লোকে এই কথা শুনিয়া চক্ষু বুজিল, কি না বুজিল, জয়ন্তী তাহা আর চাহিয়া দেখিল না। মন তখন খুব উঁচু সুরে বাঁধা আছে—জয়ন্তী তখন জগদীশ্বর ভিন্ন আর কাহাকে দেখিতে পাইতেছে না। জয়ন্তী কেবল রাজার দিকে ফিরিয়া বলিল, "তোমার আজ্ঞায় আমি বিবস্ত্র হইব। কিন্তু তুমি চাহিয়া দেখিও না। তুমি রাজ্যেশ্বর; তোমায় পশুবৃত্ত দেখিলে প্রজারা কি না করিবে? মহারাজ, আমি বনবাসিনী, বনে থাকিতে গেলে অনেক সময়ে বিবস্ত্র হইতে হয়। একদা আমি বাঘের মুখে পড়িয়াছিলাম—বাঘের মুখ হইতে আপনার শরীর রক্ষা করিতে পারিয়াছিলাম, কিন্তু বস্ত্র রক্ষা করিতে পারি নাই। তোমাকেও আমি, তোমার আচরণ দেখিয়া সেইরূপ বন্য পশু মনে করিতেছি, অতএব তোমার কাছে আমার লজ্জা হইতেছে না। কিন্তু তোমার লজ্জা হওয়া উচিত—কেন না, তুমি রাজা এবং গৃহী, তোমার মহিষী আছেন। চক্ষু বুজ।"

বৃথা বলা! তখন মহাক্রোধান্ধকারে রাজা একেবারে অন্ধ হইয়াছেন। জয়ন্তীর কথার কোন উত্তর না দিয়া, কসাইকে বলিলেন, "জবরদস্তী কাপ্‌ড়া উতার লেও।"

তখন জয়ন্তী আর বৃথা কথা না কহিয়া, জানু পাতিয়া মঞ্চের উপর বসিল। জয়ন্তী আপনার কাছে আপনি ঠকিয়াছে,—এখন বুঝি জয়ন্তীর চোখে জল আসে। জয়ন্তী মনে করিয়াছিল, "যখন পৃথিবীর সকল সুখদুঃখে জলাঞ্জলি দিয়াছি, যখন আর আমার সুখও নাই, দুঃখও নাই, তখন আমার আবার লজ্জা কি? ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে আমার মনের যখন কোন সম্বন্ধ নাই, তখন আমার আর বিবস্ত্র আর সবস্ত্র কি? পাপই লজ্জা, আবার কিসে লজ্জা করিব? জগদীশ্বরের নিকট ভিন্ন, সুখদুঃখের অধীন মনুষ্যের কাছে লজ্জা কি? আমি কেন এই সভামধ্যে বিবস্ত্র হইতে পারিব না?" তাই জয়ন্তী এতক্ষণ আপনাকে বিপন্নই মনে করে নাই—বেত্রাঘাতটা ত গণ্যের মধ্যে নহে। কিন্তু এখন যখন বিবস্ত্র হইবার সময় উপস্থিত হইল—তখন কোথা হইতে এই পাপ লজ্জা আসিয়া সেই ইন্দ্রিয়বিজয়িনী সুখদুঃখ-বর্জ্জিতা জয়ন্তীকেও অভিভূত করিল। তাই নারীজন্মকে ধিক্কার দিয়া জয়ন্তী মঞ্চতলে জানু পাতিয়া বসিল। তখন যুক্তকরে, পবিত্রচিত্তে জয়ন্তী আত্মাকে সমাহিত করিয়া মনে মনে ডাকিতে লাগিল, "দীনবন্ধু! আজ রক্ষা কর! মনে করিয়াছিলাম, বুঝি এ পৃথিবীর সকল সুখদুঃখে জলাঞ্জলি দিয়াছি, কিন্তু হে দর্পহারী! আমার দর্প চূর্ণ হইয়াছে, আমায় আজ রক্ষা কর! নারীদেহ কেন দিয়াছিলে, প্রভু! সব সুখদুঃখ বিসর্জ্জন করা যায়, কিন্তু

নারীদেহ থাকিতে লজ্জা বিসর্জ্জন করা যায় না। তাই আজ কাতরে ডাকিতেছি, জগন্নাথ! আজ রক্ষা কর।"

যতক্ষণ জয়ন্তী জগদীশ্বরকে ডাকিতেছিল, ততক্ষণ কসাই তাহার অঞ্চল ধরিয়া আকর্ষণ করিতেছিল। দেখিয়া সমস্ত জনমণ্ডলী এককণ্ঠে হাহাকার শব্দ করিতে লাগিল—বলিতে লাগিল, "মহারাজ! এই পাপে তোমার সর্ব্বনাশ হইবে—তোমার রাজ্য গেল।" রাজা কর্ণপাত করিলেন না। নিরুপায় জয়ন্তী আপনার অঞ্চল ধরিয়া টানাটানি করিতেছিল, ছাড়িতেছিল না। তাহার চক্ষু দিয়া জল পড়িতেছিল। শ্রী থাকিলে বড় বিস্মিতা হইত—জয়ন্তীর চক্ষুতে আর কখনও কেহ জল দেখে নাই। জয়ন্তী রুধিরাক্ত ক্ষত হস্তে আপনার অঞ্চল ধরিয়া ডাকিতেছিল, "জগন্নাথ! রক্ষা কর।"

বুঝি জগন্নাথ সে কথা শুনিলেন। সেই অসংখ্য জনসমূহ হাহাকার করিতে করিতে সহসা আবার জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। "রাণীজিকি জয়! মহারাণীকি জয়! দেবীকি জয়!" এই সময়ে অধোমুখী জয়ন্তীর কর্ণে অলঙ্কারশিঞ্জিত প্রবেশ করিল। তখন জয়ন্তী মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিল, সমস্ত পৌরস্ত্রী সঙ্গে করিয়া, মহারাণী নন্দা মঞ্চোপরি আরোহণ করিতেছেন। জয়ন্তী উঠিয়া দাঁড়াইল।

সেই সমস্ত পৌরস্ত্রী জয়ন্তীকে ঘেরিয়া দাঁড়াইল। মহারাণী নিজে জয়ন্তীকে আড়াল করিয়া, তাহার সম্মুখে দাঁড়াইলেন। দর্শকেরা সকলে করতালি দিয়া হরিবোল দিতে লাগিল। কসাই জয়ন্তীর হাত ছাড়িয়া দিল, কিন্তু মঞ্চ হইতে নামিল না।

রাজা অত্যন্ত বিস্মিত ও রুষ্ট হইয়া অতি পরুষভাবে নন্দাকে বলিলেন, "এ কি এ মহারাণী!"

নন্দা বলিলেন, "মহারাজ! আমি পতিপুত্রবতী। আমি জীবিত থাকিতে তোমাকে কখনও এ পাপ করিতে দিব না। তাহা হইলে আমার কেহ থাকিবে না।"

রাজা পূর্ব্ববৎ ক্রুদ্ধভাবে বলিলেন, "তোমার ঠাঁই অন্তঃপুরে, এখানে নয়। অন্তঃপুরে যাও।"

নন্দা সে কথার কোন উত্তর না দিয়া বলিল, "মহারাজ! আমি যে মঞ্চের উপর দাঁড়াইয়াছি, এই কসাইটা সেই মঞ্চে দাঁড়াইয়া থাকে কোন্ সাহসে? উহাকে নামিতে আজ্ঞা দিন।"

রাজা কথা কহিলেন না। তখন নন্দা উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "এই রাজপুরীমধ্যে আমার কি এমন কেহ নাই যে, এটাকে নামাইয়া দেয়?"

তখন সহস্র দর্শক এককালে "মার! মার!" শব্দ করিয়া কসাইয়ের প্রতি ধাবমান হইল। সে লম্ফ দিয়া মঞ্চ হইতে পড়িয়া পলাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু দর্শকগণ তাহাকে

ধরিয়া ফেলিয়া, মারিতে মারিতে দুর্গের বাহিরে লইয়া গেল। পরে অনেক লাঞ্ছনা করিয়া, প্রাণ মাত্র রাখিয়া ছাড়িয়া দিল।

নন্দা জয়ন্তীকে বলিল, "মা! দয়া করিয়া অভয় দাও। মা! আমার বড় ভয় হইতেছে, পাছে কোন দেবতা ছলনা করিতে আসিয়া থাকেন। মা! অপরাধ লইও না। একবার অন্তঃপুরে পায়ের ধূলা দিবে চল, আমি তোমার পূজা করিব।"

তখন রাণী পৌরস্ত্রীগণ সমভিব্যাহারে জয়ন্তীকে ঘেরিয়া অন্তঃপুরে লইয়া চলিলেন। রাজা কিছু করিতে না পারিয়া সিংহাসন হইতে উঠিয়া গেলেন। তখন মহাকোলাহলপূর্ব্বক, এবং নন্দাকে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে দর্শকমণ্ডলী দুর্গ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

অন্তঃপুরে গিয়া জয়ন্তী ক্ষণকালও অবস্থিতি করিল না। নন্দা অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া, স্বহস্তে গঙ্গাজলে জয়ন্তীর পা ধুয়াইয়া, সিংহাসনে বসাইতে গেলেন। কিন্তু জয়ন্তী হাসিয়া উড়াইয়া দিল। বলিল, "মা! আমি কায়মনোবাক্যে আশীর্ব্বাদ করিতেছি, তোমাদের মঙ্গল হউক। ক্ষণমাত্র জন্য মনে করিও না যে, আমি কোন প্রকার রাগ বা দুঃখ করিয়াছি। ঈশ্বর না করুন, কিন্তু যদি কখনও তোমার বিপদ্ পড়ে, জানিতে পারিলে, আমি আসিয়া, আমার যথাসাধ্য উপকার করিব। কিন্তু রাজপুরীমধ্যে সন্ন্যাসিনীর ঠাঁই নাই। অতএব আমি চলিলাম।" নন্দা এবং পৌরবর্গ জয়ন্তীর পদধূলি লইয়া তাঁহাকে বিদায় করিল।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

রাজবাড়ীর অন্তঃপুরের কথা বাহিরে যায় বটে, কিন্তু কখনও ঠিক ঠিক যায় না। স্ত্রীলোকের মুখে মুখে যে কথাটা চলিয়া চলিয়া রটিতে থাকে, সেটা কাজেই মুখে মুখে বড় বাড়িয়া যায়। বিশেষ, যেখানে একটুখানি বিস্ময়ের গন্ধ থাকে, সেখানে বড় বাড়িয়া যায়। জয়ন্তী সম্বন্ধে অতিপ্রকৃত রটনা পূর্ব্বে যথেষ্টই ছিল, নাগরিকদিগের কথাবার্ত্তায় আমরা দেখিয়াছি। এখন জয়ন্তী রাজপুরীমধ্যে প্রবেশ করিয়াই বাহির হইয়া চলিয়া গিয়াছিল, এই সোজা কথাটা যেরূপে বাহিরে রটিল, তাহাতে লোকে বুঝিল যে, দেবী অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করিয়াই অন্তর্দ্ধান হইলেন, আর কেহ তাঁহাকে দেখিতে পাইল না।

কাজেই লোকের দৃঢ় প্রত্যয় হইল যে, তিনি নগরের অধিষ্ঠাত্রী এবং রক্ষাকর্ত্রী দেবতা, রাজাকে ছলনা করিয়া, এক্ষণে ছল পাইয়া রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। অতএব রাজ্য আর থাকিবে না। দুর্ভাগ্যক্রমে এই সময়ে জনরব উঠিল যে, মুর্শিদাবাদ হইতে নবাবি ফৌজ আসিতেছে। কাজেই রাজ্যধ্বংস যে অতি নিকট, সে বিষয়ে আর বড় বেশী লোকের

সন্দেহ রহিল না। তখন নগরমধ্যে বোচ্‌কা বাঁধিবার বড় ধুম পড়িয়া গেল। অনেকেই নগর ত্যাগ করিয়া চলিল।

সীতারাম এ সকলের কোন সংবাদ না রাখিয়া চিত্তবিশ্রামে গিয়া একাকী বাস করিতে লাগিলেন। এখন তাঁহার চিত্তে ক্রোধই প্রবল—সে ক্রোধ সর্ব্বব্যাপক, সর্ব্বগ্রাসক। অন্যকে ছাড়িয়া ক্রোধ শ্রীর উপরেই অধিক প্রবল হইল।

উদ্‌ভ্রান্তচিত্তে সীতারাম কতকগুলি নীচব্যবসায়ী নীচাশয় অনুচরবর্গকে আদেশ করিলেন, "রাজ্যে যেখানে যেখানে যে সুন্দরী স্ত্রী আছে, আমার জন্য চিত্তবিশ্রামে লইয়া আইস।" তখন দলে দলে সেই পামরেরা চারি দিকে ছুটিল। যে অর্থের বশীভূতা, তাহাকে অর্থ দিয়া লইয়া আসিল। যে সাধ্বী, তাহাকে বলপূর্ব্বক আনিতে লাগিল। রাজ্যে হাহাকারের উপর আবার হাহাকার পড়িয়া গেল।

এই সকল দেখিয়া শুনিয়া চন্দ্রচূড় ঠাকুর এবার কাহাকে কিছু না বলিয়া তল্পী বাঁধিয়া মুটের মাথায় দিয়া তীর্থযাত্রা করিলেন। ইহজীবনে আর মহম্মদপুরে ফিরিলেন না।

পথে যাইতে যাইতে চাঁদশাহ ফকিরের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। ফকির জিজ্ঞাসা করিল, "ঠাকুরজি, কোথায় যাইতেছেন?"

চন্দ্র। কাশী।—আপনি কোথায় যাইতেছেন?

ফকির। মোক্কা।

চন্দ্র। তীর্থযাত্রায়?

ফকির। যে দেশে হিন্দু আছে, সে দেশে আর থাকিব না। এই কথা সীতারাম শিখাইয়াছে।

বিংশ পরিচ্ছেদ

জয়ন্তী প্রসন্নমনে মহম্মদপুর হইতে নির্গত হইল। দুঃখ কিছুই নাই—মনে বড় সুখ। পথে চলিতে চলিতে মনে মনে ডাকিতে লাগিল—"জয় জগন্নাথ। তোমার দয়া অনন্ত। তোমার মহিমার পার নাই। তোমাকে যে না জানে, যে না ভাবে, সেই ভাবে বিপদ্। বিপদ্ কাহাকে বলে প্রভু? তাহা বলিতে পারি না; তুমি যাহাতে আমাকে ফেলিয়াছিলে, তাহা পরম সম্পদ্। আমি এত দিন এমন করিয়া বুঝিতে পারি নাই যে, আমি ধর্ম্মভ্রষ্টা; কেন না, আমি বৃথা গর্ব্বে গর্ব্বিতা, বৃথা অভিমানে অভিমানিনী, অহঙ্কারবিমূঢ়া। অর্জ্জুন ডাকিয়াছিলেন, আমিও ডাকিতেছি প্রভু, শিখাও প্রভু। শাসন কর।

যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে
শিষ্যস্তেহং সাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্।

জয়ন্তী, জগদীশ্বরকে সম্মুখে রাখিয়া, তাঁর সঙ্গে কথোপকথন করিতে শিখিয়াছিল। মনের সকল কথা খুলিয়া বিশ্বপিতার নিকট বলিতে শিখিয়াছিল। বালিকা যেমন মা বাপের নিকট আবদার করে, জয়ন্তীও তেমনই সেই পরম পিতা-মাতার নিকট আবদার করিতে শিখিয়াছিল। এখন জয়ন্তী একটা আবদার লইল। আবদার, সীতারামের জন্য। সীতারামের যে মতি গতি, সীতারাম ত উৎসন্ন যায়, বিলম্ব নাই। তার কি রক্ষা নাই? অনন্ত দয়ার আধারে তাহার জন্য কি একটু দয়া নাই? জয়ন্তী তাই ভাবিতেছিল। ভাবিতেছিল, "আমি জানি, ডাকিলে তিনি অবশ্য শুনেন। সীতারাম ডাকে না—ডাকিতে ভুলিয়া গিয়াছে—নহিলে এমন করিয়া ডুবিবে কেন? জানি, পাপীর দণ্ডই এই যে, সে দয়াময়কে ডাকিতে ভুলিয়া যায়। তাই সীতারাম তাঁকে ডাকিতে ভুলিয়া গিয়াছে, আর ডাকে না। তা, সে না ডাকুক, আমি তার হইয়া জগদীশ্বরকে ডাকিলে তিনি কি শুনিবেন না? আমি যদি বাপের কাছে আবদার করি যে, এই পাপিষ্ঠ সীতারামকে পাপ হইতে মোচন কর, তবে কি তিনি শুনিবেন না? জয় জগন্নাথ! তোমার নামের জয়! সীতারামকে উদ্ধার করিতে হইবে।"

তার পর জয়ন্তী ভাবিল যে, "যে নিশ্চেষ্ট, তাহার ডাক ভগবান্ শুনেন না। আমি যদি নিজে সীতারামের উদ্ধারের জন্য কোন চেষ্টা না করি, তবে ভগবান্ কেন আমার কথায় কর্ণপাত করিবেন? দেখি, কি করা যায়। আগে শ্রীকে চাই। শ্রী পলাইয়া ভাল করে নাই। অথবা না পলাইলেও কি হইত বলা যায় না। আমার কি সাধ্য যে, ভগবন্নির্দিষ্ট কার্য্যকারণপরম্পরা বুঝিয়া উঠি।"

জয়ন্তী তখন শ্রীর কাছে চলিল। যথাকালে শ্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। জয়ন্তী শ্রীর কাছে সমস্ত বৃত্তান্ত সবিশেষ বলিল। শ্রী বিষণ্ণ হইয়া বলিল, "রাজার অধঃপতন নিকট। তাঁহার উদ্ধারের কি কোন উপায় নাই?"

জয়ন্তী। উপায় ভগবান্। ভগবান্‌কে তিনি ভুলিয়া গিয়াছেন। ভগবান্‌কে যে দিন আবার তাঁর মনে হইবে, সেই দিন তাঁহার আবার উন্নতি আরম্ভ হইবে।

শ্রী। তাহার উপায় কি? আমি যখন তাঁহার কাছে ছিলাম, তখন সর্ব্বদা ভগবৎ-প্রসঙ্গই তাঁর কাছে কহিতাম। তিনি মনোযোগ দিয়া শুনিতেন।

জয়ন্তী। তোমার মুখের কথা, তাই মনোযোগ দিতেন। তোমার মুখ পানে হাঁ করিয়া চাহিয়া থাকিতেন, তোমার রূপে ও কণ্ঠে মুগ্ধ হইয়া থাকিতেন, ভগবৎপ্রসঙ্গ তাঁর কাণে প্রবেশ করিত না। তিনি কোন দিন তোমার এ সকল কথার কিছু উত্তর করিয়াছিলেন

কি? কোন দিন কোন তত্ত্বের মীমাংসা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন কি? হরিনামে কোন দিন উৎসাহ দেখিয়াছিলে কি?

শ্রী। না। তা বড় লক্ষ্য করি নাই।

জয়ন্তী। তবে সে মনোযোগ তোমার লাবণ্যের প্রতি,—ভগবৎপ্রসঙ্গে নয়।

শ্রী। তবে, এখন কি কর্ত্তব্য?

জ। তুমি করিবে কি? তুমি ত বলিয়াছ যে, তুমি সন্ন্যাসিনী, তোমার কর্ম্ম নাই?

শ্রী। যেমন শিখাইয়াছ।

জ। আমি কি তাই শিখাইয়াছিলাম? আমি কি শিখাই নাই যে, অনুষ্ঠেয় যে কর্ম্ম, অনাসক্ত হইয়া ফলত্যাগপূর্ব্বক তাহার নিয়ত অনুষ্ঠান করিলেই কর্ম্মত্যাগ হইল, নচেৎ হইল না?* স্বামিসেবা কি তোমার অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম নহে?

শ্রী। তবে আমাকে পলাইতে পরামর্শ দিয়াছিলে কেন?

জ। তুমি যে বলিলে, তোমার শত্রু, রাজা নিয়া বার জন। যদি ইন্দ্রিয়গণ তোমার বশ্য নয়, তবে তোমার স্বামিসেবা সকাম হইয়া পড়িবে। অনাসক্তি ভিন্ন কর্ম্মানুষ্ঠানে কর্ম্মত্যাগ ঘটে না। তাই তোমাকে পলাইতে বলিয়াছিলাম। যার যে ভার সয় না, তাকে সে ভার দিই না। "পদং সহেত ভ্রমরস্য পেলবং" ইত্যাদি উপমা মনে আছে ত?

শ্রী বড় লজ্জিতা হইল। ভাবিয়া বলিল, "কাল ইহার উত্তর দিব।"

সে দিন আর সে কথা হইল না। শ্রী সে দিন জয়ন্তীর সঙ্গে বড় দেখা সাক্ষাৎ করিল না। পরে জয়ন্তী তাহাকে ধরিল। বলিল, "আমার কথার কি উত্তর সন্ন্যাসিনী?"

শ্রী বলিল, "আমায় আর একবার পরীক্ষা কর।"

জয়ন্তী বলিল, "এ কথা ভাল। তবে মহম্মদপুর চল। তোমার আমার অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম কি, পথে তাহার পরামর্শ করিতে করিতে যাইব।"

দুই জনে তখন পুনর্ব্বার মহম্মদপুর অভিমুখে যাত্রা করিল।

একবিংশতিতম পরিচ্ছেদ

গঙ্গারাম গেল, রমা গেল, শ্রী গেল, জয়ন্তী গেল, চন্দ্রচূড় গেল, চাঁদশাহ গেল তবু সীতারামের চৈতন্য নাই।

* কার্য্যমিত্যেব যৎ কর্ম্ম নিয়তং ক্রিয়তেঽর্জ্জুন।
সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলঞ্চৈব স ত্যাগঃ সাত্ত্বিকো মতঃ॥—গীতা, ১৮।৯

বাকি মৃণ্ময় আর নন্দা। নন্দা এবার বড় রাগিল—আর পতিভক্তিতে রাগ থামে না। কিন্তু নন্দার আর সহায় নাই। এক মৃণ্ময় মাত্র সহায় আছে। অতএব নন্দা কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য স্থির করিবার জন্য এক দিন প্রাতে মৃণ্ময়কেই ডাকিতে পাঠাইল। সে ডাক মৃণ্ময়ের নিকট পৌঁছিল না। মৃণ্ময় আর নাই। সেই দিন প্রাতে মৃণ্ময়ের মৃত্যু হইয়াছিল।

প্রাতে উঠিয়াই মৃণ্ময় সংবাদ শুনিলেন যে, মুসলমান সেনা মহম্মদপুর আক্রমণে আসিতেছে—আগতপ্রায়—প্রায় গড়ে পৌঁছিল। বজ্রাঘাতের ন্যায় এ সংবাদ মৃণ্ময়ের কর্ণে প্রবেশ করিল। মৃণ্ময়ের যুদ্ধের কোন উদ্যোগই নাই। এখন আর চন্দ্রচূড়ের সে গুপ্তচর নাই যে, পূর্ব্বাহ্ণে সংবাদ দিবে। সংবাদ পাইবামাত্র মৃণ্ময় সবিশেষ জানিবার জন্য স্বয়ং অশ্বারোহণ করিয়া যাত্রা করিলেন। কিছু দূর গিয়া মুসলমান সেনার সম্মুখে পড়িলেন। তিনি পলাইতে জানিতেন না, সুতরাং তাহাদের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া নিহত হইলেন।

মুসলমান সেনা আসিয়া সীতারামের দুর্গ বেষ্টন করিল—নগর ভাঙ্গিয়া অবশিষ্ট নাগরিকেরা পলাইয়া গেল। চিত্তবিশ্রামে যেখানে সুন্দরীমণ্ডলীপরিবেষ্টিত সীতারাম লীলায় উন্মত্ত, সেইখানে সীতারামের কাছে সংবাদ পৌঁছিল যে, "মৃণ্ময় মরিয়াছে। মুসলমান সেনা আসিয়া দুর্গ ঘেরিয়াছে।" সীতারাম মনে মনে বলিলেন, "তবে আজ শেষ। ভোগবিলাসের শেষ; রাজ্যের শেষ; জীবনের শেষ।" তখন রাজা রমণীমণ্ডল পরিত্যাগ করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন।

বিলাসিনীরা বলিল, "মহারাজ, কোথা যান? আমাদের ফেলিয়া কোথা যান?"

সীতারাম চোপদারকে আজ্ঞা করিলেন, "ইহাদের বেত মারিয়া তাড়াইয়া দাও।"

স্ত্রীলোকেরা খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া হরিবোল দিয়া উঠিল। তাহাদিগের থামাইয়া ভানুমতী নামে তাহাদিগের মধ্যস্থ এক সুন্দরী রাজার সম্মুখীন হইয়া বলিল, "মহারাজ! আজ জানিলে বোধ হয় যে, সত্যই ধর্ম্ম আছে। আমরা কুলকন্যা, আমাদের কুলনাশ, ধর্ম্মনাশ কবিয়াছ, মনে করিয়াছ কি, তার প্রতিফল নাই? আমাদের কাহারও মা কাঁদিতেছে, কাহারও বাপ কাঁদিতেছে, কাহারও স্বামী কাঁদিতেছে, কাহারও শিশু সন্তান কাঁদিতেছে—মনে করিয়াছিলে কি, সে কান্না জগদীশ্বর শুনিতে পান না? মহারাজ, নগরে না, বনে যাও, লোকালয়ে আর মুখ দেখাইও না; কিন্তু মনে রাখিও যে, ধর্ম্ম আছে।"

রাজা এ কথার উত্তর না করিয়া, ঘোড়ায় চড়িয়া বায়ুবেগে অশ্ব সঞ্চালিত করিয়া দুর্গদ্বারে চলিলেন। যুবতীগণ পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিল। কেহ বলিল, "আয় ভাই, রাজার রাজধানী লুঠি গিয়া চল। সীতারাম রায়ের সর্ব্বনাশ দেখি গিয়া চল।" কেহ বলিল, "সীতারাম আল্লা ভজিবে, আমরা সঙ্গে সঙ্গে ভজি গে চল।" সে সকল কথা রাজার কাণে গেল না। ভানুমতীর কথায় রাজার কাণ ভরিয়াছিল। রাজা এখন স্বীকার করিলেন, "ধর্ম্ম আছে।"

রাজা গিয়া দেখিলেন, মুসলমান সেনা এখনও গড় ঘেরে নাই—সবে আসিতেছে মাত্র —তাহাদের অগ্রবর্ত্তী ধূলি, পতাকা ও অশ্বারোহী সকল নানা দিকে ধাবমান হইয়া আপন আপন নির্দ্দিষ্ট স্থান গ্রহণ করিতেছে; এবং প্রধানাংশ দুর্গদ্বার-সম্মুখে আসিতেছে। সীতারাম দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিলেন।

তখন রাজা চারি দিকে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, প্রায় সিপাহী নাই। বলা বাহুল্য যে, তাহারা অনেক দিন বেতন না পাইয়া ইতিপূর্ব্বেই পলায়ন করিয়াছিল। যে কয় জন বাকি ছিল, তাহারা মৃণ্ময়ের মৃত্যু ও মুসলমানের আগমনবার্ত্তা শুনিয়া সরিয়া পড়িয়াছে। তবে দুই চারি জন ব্রাহ্মণ বা রাজপুত অত্যন্ত প্রভুভক্ত, একবার নুন খাইলে আর ভুলিতে পারে না, তাহারাই আছে। গণিয়া গাঁথিয়া তাহারা জোর পঞ্চাশ জন হইবে। রাজা মনে মনে কহিলেন, "অনেক পাপ করিয়াছি। ইহাদের প্রাণ দান করিব। ধর্ম্ম আছে।"

রাজা দেখিলেন, রাজকর্ম্মচারীরা কেহই নাই। সকলেই আপন আপন ধন প্রাণ লইয়া সরিয়া পড়িয়াছে। ভৃত্যবর্গ কেহ নাই। দুই এক জন অতি পুরাতন দাস দাসী প্রভুর সঙ্গে একত্রে প্রাণপরিত্যাগে কৃতসঙ্কল্প হইয়া সাশ্রুলোচনে অবস্থিতি করিতেছে।

রাজা তখন অন্তঃপুরে গিয়া দেখিলেন, জ্ঞাতি কুটুম্ব আত্মীয় স্বজন যে যে পুরীমধ্যে বাস করিত, সকলেই যথাকালে আপন আপন প্রাণ লইয়া প্রস্থান করিয়াছে। সেই বৃহৎ রাজভবন আজ অরণ্যতুল্য, জনশূন্য, নিঃশব্দ, অন্ধকার। রাজার চক্ষুতে জল আসিল।

রাজা মনে জানিতেন, নন্দা কখনও যাইবে না, তাহার যাইবারও স্থান নাই। তিনি চক্ষু মুছিতে মুছিতে নন্দার সন্ধানে চলিলেন। তখন গুড়ুম্ গুড়ুম্ করিয়া মুসলমানের কামান ডাকিতে লাগিল—তাহারা আসিয়া গড় ঘেরিয়া প্রাচীর ভাঙ্গিবার চেষ্টা করিতেছে। মহা কোলাহল, অন্তঃপুর হইতে শুনা যাইতে লাগিল।

রাজা নন্দার ভবনে গিয়া দেখিলেন, নন্দা ধূলায় পড়িয়া শুইয়া আছে, চারি পাশে তাহার পুত্রকন্যা এবং রমার পুত্র বসিয়া কাঁদিতেছে। রাজাকে দেখিয়া নন্দা বলিল, "হায় মহারাজ! এ কি করিলে!"

রাজা বলিলেন, "যাহা অদৃষ্টে ছিল, তাই করিয়াছি। আমি প্রথমে পতিঘাতিনী বিবাহ করিয়াছিলাম, তাহার কুহকে পড়িয়া এই মৃত্যুবুদ্ধি উপস্থিত হইয়াছে—"

নন্দা। সে কি মহারাজ? শ্রী?

রাজা। শ্রীর কথাই বলিতেছি।

নন্দা। যাহাকে আমরা ডাকিনী বলিয়া জানিতাম, সে শ্রী? এত দিন বল নাই কেন, মহারাজ?

নন্দার মুখ সেই আসন্ন মৃত্যুকালেও প্রফুল্ল হইল।

রাজা। বলিয়াই কি হইবে? ডাকিনীই হউক, শ্রীই হউক, ফল একই হইয়াছে। মৃত্যু উপস্থিত।

নন্দা। মহারাজ! শরীরধারণে মৃত্যু আছেই। সে জন্য দুঃখ করি না। তবে তুমি লক্ষ যোদ্ধার নায়ক হইয়া যুদ্ধ করিতে করিতে মরিবে, আমি তোমার অনুগামিনী হইব—তাহা অদৃষ্টে ঘটিল না কেন?

রাজা। লক্ষ যোদ্ধা আমার নাই, এক শত যোদ্ধাও নাই। কিন্তু আমি যুদ্ধে মরিব; তাহা কেহ নিবারণ করিতে পারিবে না। আমি এখনই ফটক খুলিয়া মুসলমান সেনামধ্যে একাই প্রবেশ করিব। তোমাকে বলিতে ও হাতিয়ার লইতে আসিয়াছি।

নন্দার চক্ষুতে বড় ভারি বেগে স্রোত বহিতে লাগিল; কিন্তু নন্দা তাহা মুছিল। বলিল, "মহারাজ! আমি যদি ইহাতে নিষেধ করি, তবে আমি তোমার দাসী হইবার যোগ্য নহি। তুমি যে প্রকৃতিস্থ হইয়াছ, ইহাই আমার বহু ভাগ্য—আর যদি দুদিন আগে হইতে! তুমিও মরিবে মহারাজ! আমিও মরিব—তোমার অনুগমন করিব। কিন্তু ভাবিতেছি—এই অপোগণ্ডগুলির কি হইবে! ইহারা যে মুসলমানের হাতে পড়িবে।"

এবার নন্দা কাঁদিয়া ভাসাইয়া দিল।

রাজা বলিলেন, "তাই তোমার মরা হইবে না। ইহাদিগের জন্য তোমাকে থাকিতে হইবে।"

নন্দা। আমি থাকিলেই বা উহারা বাঁচিবে কি প্রকারে?

রাজা। নন্দা! এত লোক পলাইল—তুমি পলাইলে না কেন? তাহা হইলে ইহারা রক্ষা পাইত।

নন্দা। তোমার মহিষী হইয়া আমি কার সঙ্গে পলাইব মহারাজ? তোমার পুত্র-কন্যা আমি তোমাকে না বলিয়া কাহার হাতে দিব? পুত্র বল, কন্যা বল, সকলই ধর্ম্মের জন্য। আমার ধর্ম্ম তুমি। আমি তোমাকে ফেলিয়া পুত্রকন্যা লইয়া কোথায় যাইব?

রাজা। কিন্তু এখন উপায়?

নন্দা। এখন আর উপায় নাই। অনাথা দেখিয়া মুসলমান যদি দয়া করে। না করে, জগদীশ্বর যাহা করিবেন, তাহাই হইবে। মহারাজ, রাজার ঔরসে ইহাদের জন্ম। রাজকুলের সম্পদ্ বিপদ্ উভয়ই আছে—তজ্জন্য আমার তেমন চিন্তা নাই। পাছে তোমায় কেহ কাপুরুষ বলে, আমার সেই বড় ভাবনা।

রাজা। তবে বিধাতা যাহা করিবেন, তাহাই হইবে। ইহজন্মে তোমাদের সঙ্গে এই দেখা।

এই বলিয়া আর কোন কথা না কহিয়া, রাজা সজ্জার্থ অস্ত্রগৃহে গেলেন। নন্দা বালকবালিকাদিগকে সঙ্গে লইয়া রাজার সঙ্গে অস্ত্রগৃহে গেলেন। রাজা রণসজ্জায় আপনাকে বিভূষিত করিতে লাগিলেন, নন্দা বালকবালিকাগুলি লইয়া চক্ষু মুছিতে মুছিতে দেখিতে লাগিল।

যোদ্ধৃবেশ পরিধান করিয়া, সর্ব্বাঙ্গে অস্ত্র বাঁধিয়া, সীতারাম আবার সীতারামের মত শোভা পাইতে লাগিলেন। তিনি তখন বীরদর্পে, মৃত্যুকামনায়, একাকী দুর্গদ্বারাভিমুখে চলিলেন। নন্দা আবার মাটিতে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল।

একাকী দুর্গদ্বারে যাইতে দেখিলেন যে, যে বেদীতে জয়ন্তীকে বেত্রাঘাতের জন্য আরূঢ় করিয়াছিলেন, সেই বেদীতে দুই জন কে বসিয়া রহিয়াছে। সেই মৃত্যুকামী যোদ্ধারও হৃদয়ে ভয়সঞ্চার হইল। শশব্যস্তে নিকটে আসিয়া দেখিলেন—ত্রিশূল হস্তে, গৈরিকভস্মরুদ্রাক্ষ-বিভূষিতা জয়ন্তীই পা ঝুলাইয়া বসিয়া আছে। তাহার পাশে, সেইরূপ ভৈরবীবেশে শ্রী।

রাজা তাহাদিগকে সেই বিষম সময়ে, তাঁহার আসন্নকালে, সেই বেশে সেই স্থানে সমাসীনা দেখিয়া কিছু ভীত হইলেন। বলিলেন, "তোমরা আমার এই আসন্নকালে, এখানে আসিয়া কেন বসিয়া আছ? তোমাদের এখনও কি মনস্কামনা সিদ্ধ হয় নাই?"

জয়ন্তী ঈষৎ হাসিল। রাজা দেখিলেন, শ্রী গদ্গদকণ্ঠ, সজললোচন—কথা কহিবে ইচ্ছা করিতেছে, কিন্তু কথা কহিতে পারিতেছে না। রাজা তাহার মুখ পানে চাহিয়া রহিলেন। শ্রী কিছু বলিল না।

রাজা তখন বলিলেন, "শ্রী! তোমারই অদৃষ্ট ফলিয়াছে। তুমিই আমার মৃত্যুর কারণ। তোমাকে প্রিয়প্রাণহন্ত্রী বলিয়া আগে ত্যাগ করিয়া ভালই করিয়াছিলাম। এখন অদৃষ্ট ফলিয়াছে—আর কেন আসিয়াছ?"

শ্রী। আমার অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম আছে—তাহা করিতে আসিয়াছি। আজ তোমার মৃত্যু উপস্থিত, আমি তোমার সঙ্গে মরিতে আসিয়াছি।

রাজা। সন্ন্যাসিনী কি অনুমৃতা হয়?

শ্রী। সন্ন্যাসীই হউক, আর গৃহীই হউক, মরিবার অধিকার সকলেরই আছে।

রাজা। সন্ন্যাসীর কর্ম্ম নাই। তুমি কর্ম্মত্যাগ করিয়াছ— তুমি আমার সঙ্গে মরিবে কেন? আমার সঙ্গে, নন্দা যাইবে, প্রস্তুত হইয়াছে। তুমি সন্ন্যাসধর্ম্ম পালন কর।

শ্রী। মহারাজ! যদি এত কাল আমার উপর রাগ করেন নাই, তবে আজ আর রাগ করিবেন না। আমি আপনার কাছে যে অপরাধ করিয়াছি—তা এই আপনার আর আমার আসন্ন মৃত্যুকালে বুঝিয়াছি। এই আপনার পায়ে মাথা দিয়া,—

এই বলিয়া শ্রী মঞ্চ হইতে নামিয়া, সীতারামের চরণের উপর পড়িয়া, উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিল, "এই তোমার পায়ে হাত দিয়া বলিতেছি—আমি আর সন্ন্যাসিনী নই। আমার অপরাধ ক্ষমা করিবে? আমায় আবার গ্রহণ করিবে?"

সী। তোমায় ত বড় আদরেই গ্রহণ করিয়াছিলাম—এখন আর ত গ্রহণের সময় নাই।

শ্রী। সময় আছে—আমার মরিবার সময় যথেষ্ট আছে।

সী। তুমিই আমার মহিষী।

শ্রী রাজার পদধূলি গ্রহণ করিল। জয়ন্তী বলিল, "আমি ভিখারিণী, আশীর্ব্বাদ করিতেছি—আজ হইতে অনন্তকাল আপনারা উভয়ে জয়যুক্ত হইবেন।"

সী। মা! তোমার নিকট আমি বড় অপরাধী। তুমি যে আজ আমার দুর্দ্দশা দেখিতে আসিয়াছ, তাহা মনে করি না, তোমার আশীর্ব্বাদেই বুঝিতেছি, তুমি যথার্থ দেবী। এখন আমায় বল, তোমার কাছে কি প্রায়শ্চিত্ত করিলে তুমি প্রসন্ন হও। ঐ শোন! মুসলমানের কামান! আমি ঐ কামানের মুখে এখনই এই দেহ সমর্পণ করিব। কি করিলে তুমি প্রসন্ন হও, তা এই সময়ে বল।

জয়ন্তী। আর একদিন তুমি একাই দুর্গ রক্ষা করিয়াছিলে।

রাজা। আজ তাহা হয় না। জলে আর তটে অনেক প্রভেদ। পৃথিবীতে এমন মনুষ্য নাই, যে আজ একা দুর্গ রক্ষা করিতে পারে।

জয়ন্তী। তোমার ত এখনও পঞ্চাশ জন সিপাহী আছে।

রাজা। ঐ কোলাহল শুনিতেছ? ঐ সেনা সকলের, এই পঞ্চাশ জনে কি করিবে? আমার আপনার প্রাণ আমি যখন ইচ্ছা, যেমন করিয়া ইচ্ছা, পরিত্যাগ করিতে পারি। কিন্তু বিনাপরাধে উহাদিগের হত্যা করি কেন? পঞ্চাশ জন লইয়া এ যুদ্ধে মৃত্যু ভিন্ন অন্য কোন ফল নাই।

শ্রী। মহারাজ! আমি বা নন্দা মরিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু নন্দা রমার কতকগুলি পুত্রকন্যা আছে, তাহাদের রক্ষার কিছু উপায় হয় না?

সীতারামের চক্ষুতে জলধারা ছুটিল। বলিলেন, "নিরুপায়! উপায় কি করিব?"

জয়ন্তী বলিল, "মহারাজ! নিরুপায়ের এক উপায় আছে—আপনি কি তাহা জানেন না? জানেন বৈ কি। জানিতেন, জানিয়া ঐশ্বর্য্যমদে ভুলিয়া গিয়াছিলেন—এখন কি সেই নিরুপায়ের উপায়, অগতির গতিকে মনে পড়ে না?"

সীতারাম মুখ নত করিলেন। তখন অনেক দিনের পর, সেই নিরুপায়ের উপায়, অগতির গতিকে মনে পড়িল। কাল কাদম্বিনী বাতাসে উড়িয়া গেল—হৃদয়মধ্যে অল্পে অল্পে,

ক্রমে ক্রমে, সূর্য্যরশ্মি বিকসিত হইতে লাগিল—চিন্তা করিতে করিতে অন্তর্ব্রহ্মাণ্ড-প্রকাশক সেই মহাজ্যোতিঃ প্রভাসিত হইল। তখন সীতারাম মনে মনে ডাকিতে লাগিলেন, "নাথ। দীননাথ। অনাথনাথ। নিরুপায়ের উপায়। অগতির গতি। পুণ্যময়ের আশ্রয়। পাপিষ্ঠের পরিত্রাণ। আমি পাপিষ্ঠ বলিয়া আমায় কি দয়া করিবে না?"

সীতারাম অনন্যমনা হইয়া ঈশ্বরচিন্তা করিতেছেন দেখিয়া শ্রীকে জয়ন্তী ইঙ্গিত করিল। তখন সহসা দুই জনে সেই মঞ্চের উপর জানু পাতিয়া বসিয়া, দুই হাত যুক্ত করিয়া, উর্দ্ধনেত্র হইয়া, ডাকিতে লাগিল—গগনবিহারী গগনবিদারী কলবিহঙ্গনিন্দী কণ্ঠে, সেই মহাদুর্গের চারি দিক্ প্রতিধ্বনিত করিয়া ডাকিতে লাগিল,—

ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণ-
স্ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরং চ ধাম
ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ।॥

দুর্গের বাহিরে সেই সাগরগর্জ্জনবৎ মুসলমান সেনার কোলাহল; প্রাচীর ভেদার্থ প্রক্ষিপ্ত কামানের ভীষণ নিনাদ মাঠে মাঠে, জঙ্গলে জঙ্গলে, নদীর বাঁকে বাঁকে প্রতিধ্বনিত হইতেছে;—দুর্গমধ্যে জনশূন্য, সেই প্রতিধ্বনিত কোলাহল ভিন্ন অন্য শব্দশূন্য—তাহার মধ্যে সেই সাক্ষাৎ জ্ঞান ও ভক্তিরূপিণী জয়ন্তী ও শ্রীর সপ্তস্বরসংবাদিনী অতুলিতকণ্ঠনিঃসৃত মহাগীতি আকাশ বিদীর্ণ করিয়া, সীতারামের শরীর রোমাঞ্চিত করিয়া, উর্দ্ধে উঠিতে লাগিল—

নমো নমস্তেঽস্তু সহস্রকৃত্বঃ
পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমো নমস্তে।
নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে
নমোঽস্তু তে সর্ব্বত এব সর্ব্ব।॥

শুনিতে শুনিতে সীতারাম বিমুগ্ধ হইলেন,—আসন্ন বিপদ্ ভুলিয়া গেলেন, যুক্তকরে, উর্দ্ধমুখে বিহ্বল হইয়া আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন,—তাঁহার চিত্ত আবার বিশুদ্ধ হইল। জয়ন্তী ও শ্রী সেই আকাশবিপ্লাবী কণ্ঠে আবার হরিনাম করিতে লাগিল, হরি। হরি। হরি। হরি হে। হরি। হরি। হরি। হরি হে।

এমন সময়ে দুর্গমধ্যে মহা কোলাহল হইতে লাগিল—শব্দ শুনা গেল—"জয় মহারাজকি জয়। জয় সীতারামকি জয়।"

দ্বাবিংশতিতম পরিচ্ছেদ

পাঠককে বলিতে হইবে না যে, দুর্গমধ্যেই সিপাহীরা বাস করিত। ইহাও বলা গিয়াছে যে, সিপাহী সকলই দুর্গ ছাড়িয়া পলাইয়াছে, কেবল জন পঞ্চাশ নিতান্ত প্রভুভক্ত ব্রাহ্মণ ও রাজপুত পলায় নাই। তাহারা বাছা বাছা লোক—বাছা বাছা লোক নহিলে এমন সময়ে বিনা বেতনে কেবল প্রাণ দিবার জন্য পড়িয়া থাকে না। এখন তাহারা বড় অপ্রসন্ন হইয়া উঠিল। এ দিকে মুসলমান সেনা আসিয়া পড়িয়াছে, মহা কোলাহল করিতেছে, কামানের ডাকে মেদিনী কাঁপাইতেছে—গোলার আঘাতে দুর্গপ্রাচীর ফাটাইতেছে—তবু ইহাদিগকে সাজিতে কেহ হুকুম দেয় না। রাজা নিজে আসিয়া সব দেখিয়া গেলেন। কৈ? তাহাদের ত সাজিতে হুকুম দিলেন না। তাহারা কেবল প্রাণ দিবার জন্য পড়িয়া আছে, অন্য পুরস্কার কামনা করে না, কিন্তু তাও ত ঘটিয়া উঠে না—কেহ ত বলে না, "আইস। আমার জন্য মর।" তখন তাহারা বড় অপ্রসন্ন হইয়া উঠিল।

তখন তাহারা সকলে মিলিয়া এক বৈঠক করিল। রঘুবীর মিশ্র তাহার মধ্যে প্রাচীন এবং উচ্চপদস্থ—রঘুবীর তাহাদিগকে বুঝাইতে লাগিল। বলিল, "ভাই সব। ঘরের ভিতর মুসলমান আসিয়া খোঁচাইয়া মারিবে, সেই কি ভাল হইবে? আইস, মরিতে হয় ত মরদের মত মরি। চল, সাজিয়া গিয়া লড়াই করি। কেহ হুকুম দেয় নাই—নাই দিক। মরিবার আবার হুকুম হাকাম কি? মহারাজের নিমক্ খাইয়াছি, মহারাজের জন্য লড়াই করিব—তা হুকুম না পাইলে, কি সময়ে তাঁর জন্য হাতিয়ার ধরিব না? চল, হুকুম হোক্ না হোক্, আমরা গিয়া লড়াই করি।"

এ কথায় সকলেই সম্মত হইল। তবে, গয়াদীন পাঁড়ে প্রশ্ন তুলিল যে, "লড়াই করিব কি প্রকার? এখন দুর্গরক্ষার উপায় একমাত্র কামান। কিন্তু গোলন্দাজ ফৌজ ত সব পলাইয়াছে। আমরা ত কামানের কাজ তেমন জানি না। আমাদের কি রকম লড়াই করা উচিত?"

তখন এ বিষয়ের বিচার আরম্ভ হইল। তাহাতে দুর্ম্মদ সিংহ জমাদ্দার বলিল, "অত বিচারে কাজ কি? হাতিয়ার আছে, ঘোড়া আছে, রাজাও গড়ে আছে। চল, আমরা হাতিয়ার বাঁধিয়া, ঘোড়ায় সওয়ার হইয়া রাজার কাছে গিয়া হুকুম লই। মহারাজ যাহা বলিবেন, তাহাই করা যাইবে।"

এই প্রস্তাব অতি উত্তম বলিয়া স্বীকার করিয়া সকলেই অনুমোদন করিল। অতি ত্বরা করিয়া সকলে রণসজ্জা করিল—আপন আপন অশ্ব সকল সুসজ্জিত করিল। তখন

সকলে সজ্জীভূত ও অশ্বারূঢ় হইয়া আস্ফালনপূর্ব্বক, অস্ত্রে অস্ত্রে ঝঞ্জনা শব্দ উঠাইয়া, উচ্চৈঃস্বরে ডাকিল, "জয় মহারাজকি জয়! জয় রাজা সীতারামকি জয়!"

সেই জয়ধ্বনি সীতারামের কাণে প্রবেশ করিয়াছিল।

ত্রয়োবিংশতিতম পরিচ্ছেদ

যোদ্ধৃগণ জয়ধ্বনি করিতে করিতে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া, যথায় মঞ্চপার্শ্বে সীতারাম, জয়ন্তী ও শ্রীর মহাগীতি শুনিতেছিলেন, সেইখানে আসিয়া জয়ধ্বনি করিল।

রঘুবীর মিশ্র জিজ্ঞাসা করিল, "মহারাজের কি হুকুম? আজ্ঞা পাইলে আমরা এই কয় জন নেড়া মুণ্ডকে হাঁকাইয়া দিই।"

সীতারাম বলিলেন, "তোমরা কিয়ৎক্ষণ এইখানে অপেক্ষা কর। আমি আসিতেছি।"

এই বলিয়া রাজা অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। সিপাহীরা ততক্ষণ নিবিষ্টমনা হইয়া অবিচলিতচিত্ত এবং অস্খলিতপ্রারম্ভ হইয়া সেই সন্ন্যাসিনীদ্বয়ের স্বর্গীয় গান শুনিতে লাগিল।

যথাকালে রাজা এক দোলা সঙ্গে করিয়া অন্তঃপুর হইতে নির্গত হইলেন। রাজভৃত্যেরা সব পলাইয়াছিল বলিয়াছি। কিন্তু দুই চারি জন প্রাচীন পুরাতন ভৃত্য পলায় নাই, তাহাও বলিয়াছি। তাহারাই দোলা বহিয়া আনিতেছিল। দোলার ভিতরে নন্দা এবং বালকবালিকাগণ।

রাজা সিপাহীদিগের নিকট প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া, তাহাদিগকে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া সাজাইয়া, অতি প্রাচীন প্রথানুসারে একটি অতি ক্ষুদ্র সূচীব্যূহ রচনা করিলেন। রন্ধ্রমধ্যে নন্দার শিবিকা রক্ষা করিয়া, স্বয়ং সূচীমুখে অশ্বারোহণে দণ্ডায়মান হইলেন। তখন তিনি জয়ন্তী ও শ্রীকে ডাকিয়া বলিলেন, "তোমরা বাহিরে কেন? সূচীর রন্ধ্রমধ্যে প্রবেশ কর।"

জয়ন্তী ও শ্রী হাসিল। বলিল, "আমরা সন্ন্যাসিনী, জীবনে মৃত্যুতে প্রভেদ দেখি না।"

তখন সীতারাম আর কিছু না বলিয়া, "জয় জগদীশ্বর! জয় লছমীনারায়ণজী!" বলিয়া দ্বারাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। সেই ক্ষুদ্র সূচীব্যূহ তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। তখন সেই সন্ন্যাসিনীরা অবলীলাক্রমে তাঁহার অশ্বের সম্মুখে আসিয়া ত্রিশূলদ্বয় উন্নত করিয়া—

জয় শিব শঙ্কর! ত্রিপুরনিধনকর!
রণে ভয়ঙ্কর! জয় জয় রে!

চক্রগদাধর। কৃষ্ণ পীতাম্বর।
জয় জয় হরি হর! জয় জয় রে!

ইত্যাকার জয়ধ্বনি করিতে করিতে অগ্রে অগ্রে চলিল। সবিস্ময়ে রাজা বলিলেন, "সে কি? এখনই পিশিয়া মরিবে যে!"

শ্রী বলিল, "মহারাজ! রাজাদিগের অপেক্ষা সন্ন্যাসীদিগের মরণে ভয় কি বেশী?" কিন্তু জয়ন্তী কিছু বলিল না। জয়ন্তী আর দর্প করে না। রাজাও, এই স্ত্রীলোকেরা কথার বাধ্য নহে বুঝিয়া আর কিছু বলিলেন না।

তার পর দুর্গদ্বারে উপস্থিত হইয়া রাজা স্বহস্তে তাহার চাবি খুলিয়া অর্গল মোচন করিলেন। লোহার শিকল সকলে মহা ঝঞ্জনা বাজিল—সিংহদ্বারের উচ্চ গুম্বুজের ভিতরে, তাহার ঘোরতর প্রতিধ্বনি হইতে লাগিল—সেই অশ্বগণের পদধ্বনিও প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। তখন যবনসেনাসাগরের তরঙ্গাভিঘাতে সেই দুশ্চালনীয় লৌহনির্ম্মিত বৃহৎ কবাট আপনি উদ্ঘাটিত হইল—উন্মুক্ত দ্বারপথ দেখিয়া সূচীব্যূহস্থিত রণবাজিগণ নৃত্য করিতে লাগিল।

এদিকে যেমন বাঁধ ভাঙ্গিলে বন্যার জল, পার্ব্বত্য জলপ্রপাতের মত ভীষণ বেগে প্রবাহিত হয়, মুসলমান সেনা দুর্গদ্বার মুক্ত পাইয়া তেমনই বেগে ছুটিল। কিন্তু সম্মুখেই জয়ন্তী ও শ্রীকে দেখিয়া সেই সেনা-তরঙ্গ,—সহসা মন্ত্রমুগ্ধ ভুজঙ্গের মত যেন নিশ্চল হইল। যেমন বিশ্বমোহিনী দেবীমূর্ত্তি, তেমনই অদ্ভুত বেশ, তেমনই অদ্ভুত, অশ্রুতপূর্ব্ব সাহস, তেমনই সর্ব্বজনমনোমুগ্ধকারী সেই জয়গীতি!—মুসলমান সেনা তাহাদিগকে পুররক্ষাকারিণী দেবী মনে করিয়া সভয়ে পথ ছাড়িয়া দিল। তাহারা ত্রিশূল-ফলকের দ্বারা পথ পরিষ্কার করিয়া, যবন সেনা ভেদ করিয়া চলিল। সেই ত্রিশূলমুক্ত পথে সীতারামের সূচীব্যূহ অবলীলাক্রমে মুসলমান সেনা ভেদ করিয়া চলিল। এখন সীতারামের অন্তঃকরণে জগদীশ্বর ভিন্ন আর কেহ নাই। এখন কেবল ইচ্ছা, জগদীশ্বর স্মরণ করিয়া তাঁহার নিদেশবর্ত্তী হইয়া মরিবেন। তাই সীতারাম চিন্তাশূন্য, অবিচলিত, কার্য্যে অভ্রান্ত, প্রফুল্লচিত্ত, হাস্যবদন। সীতারাম ভৈরবীমুখে হরিনাম শুনিয়া, শ্রীহরি স্মরণ করিয়া আত্মজয়ী হইয়াছেন, এখন তাঁর কাছে মুসলমান কোন্ ছার!

তাঁর প্রফুল্ল কান্তি, এবং সামান্যা অথচ জয়শালিনী সেনা দেখিয়া মুসলমান সেনা 'মার! মার!' শব্দে গর্জ্জিয়া উঠিল। স্ত্রীলোক দুই জনকে কেহ কিছু বলিল না—সকলেই পথ ছাড়িয়া দিল। কিন্তু সীতারাম ও তাঁহার সিপাহীগণকে চারি দিক্ হইতে আক্রমণ করিতে লাগিল। কিন্তু সীতারামের সৈনিকেরা তাঁহার আজ্ঞানুসারে, কোথাও তিলার্দ্ধ দাঁড়াইয়া যুদ্ধ করিল না—কেবল অগ্রবর্ত্তী হইতে লাগিল। অনেকে মুসলমানের

আঘাতে আহত হইল—অনেকে নিহত হইয়া ঘোড়া হইতে পড়িয়া গেল, অমনই আর এক জন পশ্চাৎ হইতে তাহার স্থান গ্রহণ করিতে লাগিল। এইরূপে সীতারামের সূচীব্যূহ অভগ্ন থাকিয়া ক্রমশঃ মুসলমান সেনার মধ্যস্থল ভেদ করিয়া চলিল, সম্মুখে জয়ন্তী ও শ্রী পথ করিয়া চলিল। সিপাহীদিগের উপর যে আক্রমণ হইতে লাগিল, তাহা ভয়ানক; কিন্তু সীতারামের দৃষ্টান্তে, উৎসাহবাক্যে, অধ্যবসায় এবং শিক্ষার প্রভাবে তাহারা সকল বিঘ্ন জয় করিয়া চলিল। পার্শ্বে দৃষ্টি না করিয়া, যে সম্মুখে গতিরোধ করে, তাহাকেই আহত, নিহত, অশ্বচরণবিদলিত করিয়া সম্মুখে তাহারা অগ্রসর হইতে লাগিল।

এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া, মুসলমান সেনাপতি সীতারামের গতিরোধ জন্য একটা কামান সূচীব্যূহের সম্মুখ দিকে পাঠাইলেন। ইতিপূর্ব্বেই মুসলমানেরা দুর্গপ্রাচীর ভগ্ন করিবার জন্য কামান সকল তদুপযুক্ত স্থানে পাতিয়াছিল, এজন্য সূচীব্যূহের সম্মুখে হঠাৎ কামান আনিয়া উপস্থিত করিতে পারে নাই। এক্ষণে, রাজা রাণী পলাইতেছে জানিতে পারিয়া, বহু কষ্টে ও যত্নে একটা কামান তুলিয়া লইয়া, সেনাপতি সূচীব্যূহের সম্মুখে পাঠাইলেন নিজে সে দিকে যাইতে পারিলেন না; কেন না, দুর্গদ্বার মুক্ত পাইয়া অধিকাংশ সৈন্য লুঠের লোভে সেই দিকে যাইতেছে। সুতরাং তাঁহাকেও সেই দিকে যাইতে হইল—সুবাদারের প্রাপ্য রাজভাণ্ডার পাঁচ জনে লুঠিয়া না আত্মসাৎ করে। কামান আসিয়া সীতারামের সূচীব্যূহের সম্মুখে পৌঁছিল। দেখিয়া, সীতারামের পক্ষের সকলে প্রমাদ গণিল। কিন্তু শ্রী প্রমাদ গণিল না। শ্রী জয়ন্তী দুই জনে দ্রুতপদে অগ্রসর হইয়া কামানের সম্মুখে আসিল। শ্রী, জয়ন্তীর মুখ চাহিয়া হাসিয়া, কামানের মুখে আপনার বক্ষ স্থাপন করিয়া, চারি দিক্ চাহিয়া ঈষৎ, মৃদু, প্রফুল্ল, জয়সূচক হাসি হাসিল। জয়ন্তীও শ্রীর মুখ পানে চাহিয়া, তার পর গোলন্দাজের মুখ পানে চাহিয়া, সেইরূপ হাসি হাসিল—দুই জনে যেন বলাবলি করিল—"তোপ জিতিয়া লইয়াছি।" দেখিয়া শুনিয়া, গোলন্দাজ হাতের পলিতা ফেলিয়া দিয়া, বিনীতভাবে তোপ হইতে তফাতে দাঁড়াইল। সেই অবসরে সীতারাম লাফ দিয়া আসিয়া তাহাকে কাটিয়া ফেলিবার জন্য তরবারি উঠাইলেন। জয়ন্তী অমনি চীৎকার করিল, "কি কর! কি কর! মহারাজ রক্ষা কর!" "শত্রুকে আবার রক্ষা কি?" বলিয়া সীতারাম সেই উত্থিত তরবারির আঘাতে গোলন্দাজের মাথা কাটিয়া ফেলিয়া তোপ দখল করিয়া লইলেন। দখল করিয়াই, ক্ষিপ্রহস্ত, অদ্বিতীয় শিক্ষায় শিক্ষিত সীতারাম, সেই তোপ ফিরাইয়া আপনার সূচীব্যূহের জন্য পথ সাফ করিতে লাগিলেন। সীতারামের হাতে তোপ প্রলয়কালের মেঘের মত বিরামশূন্য গভীর গর্জ্জন আরম্ভ করিল। তদ্বর্ষিত অনন্ত লৌহপিণ্ডশ্রেণীর আঘাতে মুসলমান সেনা ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া সম্মুখ ছাড়িয়া চারি দিকে পলাইতে লাগিল। সূচীব্যূহের পথ সাফ! তখন সীতারাম অনায়াসে নিজ

মহিষী ও পুত্র কন্যা ও হতাবশিষ্ট সিপাহীগণ লইয়া মুসলমানকটক কাটিয়া বৈরিশূন্য স্থানে উত্তীর্ণ হইলেন। মুসলমানেরা দুর্গ লুঠিতে লাগিল।

এইরূপে সীতারামের রাজ্যধ্বংস হইল।

চতুর্ব্বিংশতিতম পরিচ্ছেদ

শ্রী সন্ধ্যার পর জয়ন্তীকে নিভৃতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "জয়ন্তী! সেই গোলন্দাজ কে?"

জয়ন্তী। যাহাকে মহারাজ কাটিয়া ফেলিয়াছেন?

শ্রী। হাঁ, তুমি মহারাজকে কাটিতে নিষেধ করিয়াছিলে কেন?

জয়ন্তী। সন্ন্যাসিনীর জানিয়া কি হইবে?

শ্রী। না হয় একটু চোখের জল পড়িবে। তাহাতে সন্ন্যাসধর্ম্ম ভ্রষ্ট হয় না।

জয়ন্তী। চোখের জলই বা কেন পড়িবে?

শ্রী। জীবন্তে আমি চিনিতে পারি নাই। কিন্তু তোমার নিষেধবাক্য শুনিয়া আমি মরা মুখখানা একটু নিরীক্ষণ করিয়া দেখিয়াছিলাম: আমার একটা সন্দেহ হইতেছে। সে ব্যক্তি যেই হউক, আমিই তার মৃত্যুর কারণ। আমি তোপের মুখে বুক না দিলে সে অবশ্য তোপ দাগিত। তাহা হইলে মহারাজা নিশ্চিত বিনষ্ট হইতেন, গোলন্দাজকে তখন আর কে মারিত?

জয়ন্তী। সে মরিয়াছে, মহারাজা বাঁচিয়াছেন, সে তোমার উপযুক্ত কাজই হইয়াছে—তবে আর কথায় কাজ কি?

শ্রী। তবু মনের সন্দেহটা ভাঙ্গিয়া রাখিতে হইবে।

জয়ন্তী। সন্ন্যাসিনীর এ উৎকণ্ঠা কেন?

শ্রী। সন্ন্যাসিনীই হউক, যেই হউক, মানুষ মানুষই চিরকাল থাকিবে। আমি তোমাকে দেবী বলিয়াই জানি, কিন্তু যখন তুমিও লোকালয়ে লৌকিক লজ্জায় অভিভূত হইয়াছিলে, তখন আমার সন্ন্যাসবিভ্রংশের কথা কেন বল?

জয়ন্তী। তবে চল, সন্দেহ মিটাইয়া আসি। আমি সে স্থানে একটা চিহ্ন রাখিয়া আসিয়াছি—রাত্রেও সে স্থানের ঠিক পাইব। কিন্তু আলো লইয়া যাইতে হইবে।

এই বলিয়া দুই জনে খড়ের মশাল তৈয়ার করিয়া তাহা জ্বালিয়া রণক্ষেত্র দেখিতে চলিল। চিহ্ন ধরিয়া জয়ন্তী অভীপ্সিত স্থানে পৌঁছিল। সেখানে মশালের আলো ধরিয়া তল্লাস করিতে করিতে সেই গোলন্দাজের মৃত দেহ পাওয়া গেল। দেখিয়া শ্রীর সন্দেহ

ভাঙ্গিল না। তখন জয়ন্তী সেই শবের রাশীকৃত পাকা চুল ধরিয়া টানিল—পরচুলা খসিয়া আসিল; শ্বেত শ্মশ্রু ধরিয়া টানিল—পরচুলা খসিয়া আসিল। তখন আর শ্রীর সন্দেহ রহিল না—গঙ্গারাম বটে।

শ্রীর চক্ষু দিয়া অবিরল জলধারা পড়িতে লাগিল। জয়ন্তী বলিল, "বহিন্, যদি এ শোকে কাতর হইবে, তবে কেন সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলে?"

শ্রী বলিল, "মহারাজ আমাকে বৃথা ভৎর্সনা করিয়াছেন। আমি তাঁহার প্রাণহন্ত্রী হই নাই—আপনার সহোদরেরই প্রাণঘাতিনী হইয়াছি। বিধিলিপি এত দিনে ফলিল।"

জয়ন্তী। বিধাতা কাহার দ্বারা কাহার দণ্ড করেন, তাহা বলা যায় না। তোমা হইতেই গঙ্গারাম দুই বার জীবন লাভ করিয়াছিল, আবাব তোমা হইতেই ইহার বিনাশ হইল। যাই হউক, গঙ্গারাম পাপ করিয়াছিল, আবাব পাপ করিতে আসিয়াছিল। বোধ হয়, রমার মৃত্যু হইয়াছে, তাহা জানে না, ছদ্মবেশে ছলনা দ্বারা তাহাকে লাভ করিবাব জন্যই মুসলমান সেনার গোলন্দাজ হইয়া আসিয়াছিল। কেন না, রমা তাহাকে চিনিতে পারিলে কখনই তাহার সঙ্গে যাইবে না মনে করিয়া থাকিবে। বোধ হয়, শিবিকাতে রমা ছিল মনে করিয়া, তোপ লইয়া পথ রোধ করিয়াছিল। যাই হৌক, উহার জন্য বৃথা রোদন না করিয়া, উহার দাহ করা যাক আইস।

তখন দুই জনে ধরাধরি করিয়া গঙ্গারামের শব উপযুক্ত স্থানে লইয়া গিয়া দাহ করিল।

জয়ন্তী ও শ্রী আর সীতারামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিল না। সেই রাত্রিতে তাহারা কোথায় অন্ধকারে মিশিয়া গেল, কেহ জানিল না।

পরিশিষ্ট

আমাদের পূর্ব্বপরিচিত বন্ধুদ্বয় রামচাঁদ ও শ্যামচাঁদ ইতিপূর্ব্বেই পলাইয়া নলডাঙ্গায় বাস করিতেছিলেন। সেখানে একখানি আটচালায় বসিয়া কথোপকথন করিতেছেন।

রামচাঁদ। কেমন হে ভায়া! মহম্মদপুরের খবরটা শুনেছ?

শ্যামচাঁদ। আজ্ঞে হাঁ—সে ত জানাই ছিল। গড় টর সব মুসলমানে দখল করে লুঠপাঠ করে নিয়েছে।

রাম। রাজা রাণীর কি হ'লো, কিছু ঠিক্ খবর রাখ?

শ্যাম। শোনা যাচ্চে, তাঁদের না কি বেঁধে মুর্শিদাবাদ চালান দিয়েছে। সেখানে না কি তাঁদের শূলে দিয়েছে।

রাম। আমিও শুনেছি তাই বটে, তবে কি না শুন্‌তে পাই যে, তাঁরা পথে বিষ খেয়ে মরেছেন। তার পর মড়া ছুটো নিয়ে গিয়ে বেটারা শূলে চড়িয়ে দিয়েছে।

শ্যাম। কত লোকেই কত রকম বলে! আবার কেউ কেউ বলে, রাজা রাণী না কি ধরা পড়ে নাই—সেই দেবতা এসে তাদের বার ক'রে নিয়ে গিয়েছেন। তার পর নেড়ে বেটারা জাল রাজা রাণী সাজিয়ে মুর্শিদাবাদে নিয়ে শূলে দিয়েছে।

রাম। তুমিও যেমন! ও সব হিন্দুদের রচা কথা, উপন্যাস মাত্র।

শ্যাম। তা এটা উপন্যাস, না ওটা উপন্যাস, তার ঠিক কি? ওটা না হয় মুসলমানের রচা। তা যাক্ গিয়ে—আমরা আদার ব্যাপারী—জাহাজের খবরে কাজ কি? আপনার আপনার প্রাণ নিয়ে যে বেঁচে এয়েছি, এই ঢের। এখন তামাকটা ঢেলে সাজ দেখি।

রামচাঁদ ও শ্যামচাঁদ তামাক ঢালিয়া সাজিয়া খাইতে থাকুক। আমরা ততক্ষণ গ্রন্থ সমাপন করি।

পাঠভেদ

১২৯১ সালের শ্রাবণ মাস হইতে ১২৯৩ সালের মাঘ মাস পর্য্যন্ত ‘প্রচারে’ ধারাবাহিক ভাবে ‘সীতারাম’ প্রকাশিত হয়, মধ্যে কয়েক মাস বন্ধ ছিল। ১২৯৩ সালে ইহা প্রথম পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। ‘প্রচারে’ প্রকাশিত ‘সীতারামে’র সহিত ১ম সংস্করণ পুস্তকের পার্থক্য খুব বেশী নয়, কয়েকটি অনুচ্ছেদ পরিত্যক্ত হইয়াছে এবং কয়েকটি শব্দ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে মাত্র। ‘সীতারামে’র দ্বিতীয় সংস্করণ ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে (১২৯৫ সালে) বাহির হয়, এই সংস্করণে বিশেষ পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছিল, ১ম সংস্করণের বহু পরিচ্ছেদ ও বহু অনুচ্ছেদ বাদ দেওয়া হয়। ১৮৯৪ সনের মে মাসে ‘সীতারামে’র তৃতীয় সংস্করণ বাহির হয়, বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর কয়েক দিন পরেই। বঙ্কিমচন্দ্রের জীবিতকালেই ইহা মুদ্রিত হইয়াছিল, সুতরাং এই সংস্করণের পাঠই মূল পাঠ হইয়াছে। ১ম সংস্করণের পুস্তকের পৃষ্ঠা-সংখ্যা ছিল ৪১৯, ৩য় সংস্করণে পৃষ্ঠা-সংখ্যা হয় ৩২২। ১ম ও ৩য় সংস্করণের পাঠভেদ নিম্নে দেওয়া হইল।

পৃষ্ঠা ২৯, পংক্তি ৬, “তখন সেই ভূষণায়···বাস করিতেন।” ইহার পরিবর্ত্তে ছিল—

তখন সেই ভূষণা অতিশয় সমৃদ্ধিশালিনী নগরী ছিল। একজন ফৌজদার সেখানে বাস করিতেন।

পৃ. ৩৩, পংক্তি ১-৪, “ভিখারির পক্ষে···চলিয়া গেল।” ইহার পরিবর্ত্তে ছিল—

শ্রী একটু মাথা তুলিয়া, একটু ঘোম্‌টা কম করিয়া লজ্জায় বড় জড়সড় হইয়া কোন রকমে কিছু বলিল। কিন্তু কথাগুলি এত অস্ফুট যে, ভাণ্ডারী তাহার কিছু শুনিতে পাইল না। ভাণ্ডারী তখন, পাঁচকড়ির মাকে জিজ্ঞাসা করিল, “কি বলে? কিছুই ত শুনিতে পাই না।” তখন পাঁচকড়ির মা কথা বুঝাইয়া দিল। সে বলিল, “উনি বলিতেছেন যে, আমি তোমার হাতে যা দিতেছি, তাহা তোমার মুনিবের হাতে দিও। তিনি যা বলেন আমাকে আসিয়া বলিও। আমি এইখানে আছি।”

এই বলিয়া শ্রী কাঁকালের কাপড় হইতে একটা মোহর বাহির করিল। সেই মোহর পাঁচকড়ির মা ভাণ্ডারীর হাতে দিল। ভাণ্ডারী লইয়া প্রস্থান করিল। যাইতে যাইতে জীবন দরজার প্রদীপে সেই মোহরটি একবার দেখিল। দেখিল, একটা সোনার আকব্বরী মোহর। কিন্তু তাহাতে একটা ত্রিশূলের দাগ আছে। ভাণ্ডারী মহাশয় স্থির করিলেন, “এ বেটী ত ভিখারী নয়—এই ত আমার মুনিবকে ভিক্ষা দিতে আসিয়াছে। প্রভু আমার ধনবান্, তাঁর মোহরে দরকার কি? এটা জীবন ভাণ্ডারীর পেটারার মধ্যে প্রবেশ করিলেই শোভা পায়। তবে কি না, যে ত্রিশূলের দাগ দেখিতেছি, এ ধরা পড়া বড় বিচিত্র নহে। ও সব মতিগতি আমার মত দুঃখী প্রাণীর ভাল না—যার ধন তার কাছে পৌঁছাইয়া দেওয়াই ভাল।” এইরূপ বিবেচনা করিয়া জীবন ভাণ্ডারী লোভ সম্বরণপূর্ব্বক যেখানে প্রভু গদির উপর বসিয়া

আলবোলায় সুগন্ধি তামাকু টানিতেছিলেন, সেইখানে মোহর পৌঁছাইয়া দিল। এবং সবিশেষ বৃত্তান্ত নিবেদিত হইল।

জীবন ভাণ্ডারীর মুনিব অতি সুপুরুষ। ত্রিশ বৎসরের যুবা, অতি বলিষ্ঠ গঠন, রূপে কার্ত্তিকেয়। তিনি মোহরটি লইয়া দুই চারি বার আলোতে ধরিয়া ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিলেন। শেষ দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "দুর্গে! এ কি এ!"

ভাণ্ডারী বলিল, "কি বলিব?"

প্রভু বলিলেন, "যে তোকে মোহর দিয়েছে, তাকে এইখানে ডেকে নিয়ে আয়। সঙ্গে কেহ আছে?"

ভাণ্ডারী মহাশয় তরকারীর কথাটা একেবারে গোপন করিবার মানসে বলিলেন, "এক জন মেছুনি আছে।"

প্রভু। সে যেন আসে না, তুইও পৌঁছাইয়া দিয়াই চলিয়া যাইবি।

শুনিয়া ভাণ্ডারী বেগে প্রস্থান করিল। এবং অচিরাৎ শ্রীকে পৌঁছাইয়া দিয়া চলিয়া গেল।

পৃ. ৩৩ পংক্তি ৬-৯, "তুমি কে?...সীতারাম রায়।" ইহার পরিবর্ত্তে ছিল—

আমি সীতারাম রায়—তুমি কে? তোমার মুখে ঘোম্‌টা—কথা কহিতেছ না, আমি চিনিব কি প্রকারে?

পৃ. ৩৩, পংক্তি ১১, "এত সুন্দরী!" কথা দুইটি ছিল না।

পংক্তি ১২, "শ্রী বলিল...ল্যাগিল।" এই কথাগুলির পরিবর্ত্তে ছিল—

শুনিয়া শ্রী কাঁদিয়া উঠিল।

পৃ. ৩৪, পংক্তি ১৫-১৬, "একবার আবার...অন্য কথা।" এই কথাগুলি ছিল না।

পংক্তি ১৮, এই "তৃতীয়" পরিচ্ছেদটি প্রথম সংস্করণের "চতুর্থ" পরিচ্ছেদ। এই পরিচ্ছেদের পূর্ব্বে ১ম সংস্করণে আর একটি পবিচ্ছেদ ছিল। তাহা এইরূপ:—

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

দণ্ড চারি ছয় পরে, সীতারাম দ্বার খুলিয়া, জীবন ভাণ্ডারীকে ডাকিয়া বলিলেন, "মৃণ্ময়কে ডাকিয়া আন।"

মৃণ্ময় সীতারামের স্বজাতি ও কুটুম্ব, এবং অতিশয় অনুগত ও বশম্বদ। তবে তাঁহার আকার এবং অগাধ বল ও সাহস বড় বিখ্যাত ছিল। মৃণ্ময়, তলব মত সীতারামের নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি জন্য ডাকিয়াছেন?"

সীতারাম বলিলেন, "বড় জরুরি কাজ আছে। আমার পরিবারবর্গকে এখান হইতে লইয়া যাইতে হইবে।"

মৃণ্ময়। কবে?

সীতা। আজ রাত্রেই—এখনই।

মৃণ্ময়। কোথায় নিয়ে যাব?

সীতারাম সে সকল বিষয়ে মৃণ্ময়কে উচিত উপদেশ প্রদান করিয়া অন্তঃপুরে গেলেন।

অন্তঃপুরে প্রশস্ত চত্বরমধ্যে বিস্তৃত প্রাঙ্গণ। চারি দিকে রোয়াক। কোথাও বঁটী পাতিয়া বিপুল স্থূল ঘোর কৃষ্ণাঙ্গী পরিচারিকা মৎস্য জাতির প্রাণাবশিষ্ট সংহারে সমুদ্যত। কোথাও ঘটোরী গাভী কদলী-পত্রাদি বিমিশ্র উদ্ভিদ প্রভৃতি কবলে গ্রহণপূর্ব্বক মীলিতলোচনে সুখে রোমন্থ করিতেছে;—পারিসনগরী কবলিত করিয়া চতুর্থ ফ্রেডেরিক্ উইলিয়মের সে সুখ হইয়াছিল কি না জানি না, কেন না, তিনি ত রোমন্থ করিতে পারেন নাই। কোথাও কৃষ্ণশ্বেতবর্ণবিমিশ্র মার্জ্জার মৎস্যাধারের কিঞ্চিদ্দূরে লাঙ্গুলাসনে অবস্থিত হইয়া মৎস্যকর্ত্তনকর্ত্রীর কিঞ্চিন্মাত্র অনবধানতার প্রতীক্ষা করিতেছে। কোথাও নিঃশব্দ কুক্কুর অতি ধূর্ত্তভাবে কোন্ ঘরের দ্বার অবারিত, তাহার অনুসন্ধানে নিযুক্ত। কোথাও বহু বালকগণ একমাত্র অন্ন-পাত্রকে বেষ্টন করিয়া বর্ষীয়সী কুটুম্বিনীর বহুবিধ প্ররোচনে উপশমিত ক্ষুধাতেও আহারে নিযুক্ত। কোথাও অন্য বালকবালিকাসম্প্রদায় কৃতাহার এবং কৃতকার্য্য হইয়া সাতুরে-পাটী পাতিয়া ঈষচ্চঞ্চলশীতলমন্দানিলনিস্নিগ্ধ-চন্দ্রালোকে শয়ন করিয়া অতি প্রাচীনার নিকট সহস্রবার শ্রুত উপন্যাস পুনঃশ্রবণ করিতেছে। কোথাও নবোঢ়া যুবতী এবং বালিকাগণ বাটনাবাটা কুটনাকোটা দুধজ্বাল ইত্যাদি গৃহকার্য্য উপলক্ষ করিয়া পরস্পরের কাছে আপনাপন আশা ভরসা, সুখ সৌন্দর্য্য এবং সৌভাগ্যের কথা বলিতেছে। এমন সময়ে অকালোদিতজলদবৎ, উদ্যান-বিহারকালে বৃষ্টিবৎ, দুঃখের চিন্তার কালে অপ্রার্থিত বন্ধুবৎ, নিদ্রাকালে বৈদ্যবৎ, গুরু ভোজনের পর নিমন্ত্রণবৎ এবং অর্থ-শেষ-কালে ভিক্ষুকবৎ, সীতারাম আসিয়া সেখানে দর্শন দিলেন।

"এত কি গোল কচ্চিস্ গো তোরা?" সীতারাম এই কথা বলিবামাত্র কৃষ্ণকায়াশালিনী মৎস্য-বিধ্বংসিনীর মৎস্য-কর্ত্তনশব্দ সহসা নির্ব্বাপিত হইল। তাহাকে অনাবৃত শিরোদেশে কিঞ্চিন্মাত্র অবগুণ্ঠন সংস্থানের উদ্যোগিনী দেখিয়া, ছিদ্রান্বেষিণী মার্জ্জারী মৎস্যমুণ্ড গ্রহণপূর্ব্বক যথেপ্সিত স্থানে প্রস্থান করিল। গৃহস্বামীর কণ্ঠস্বর শুনিবামাত্র অন্যা পরিচারিকা সেই সুখনিমীলিতনেত্রা কদলীপত্র-ভোজিনী গাভীর প্রতি ধাবমানা হইয়া তাহার প্রতি নানাবিধ উপদ্রব আরম্ভ করিল। এবং তস্যা স্বামিনীকে চক্ষুরাদি-ভোজিনী ইত্যাদি নবরসাত্মক বাক্যে অভিহিত করিতে আরম্ভ করিল। উপন্যাস-দত্তমনা পাত্রাবশিষ্টভোজী শিশুগণ অকস্মাৎ উপন্যাসের রসভঙ্গ দেখিয়া আহার্য্যের প্রতি নানাবিধ দোষারোপ পূর্ব্বক অধৌত বদনে দশদিকে প্রস্থান আরম্ভ করিল। যাহারা আহার সমাপনপূর্ব্বক চন্দ্রকিরণ শীতলশয্যায় শয়ন করিয়া উপন্যাস শ্রবণ করিতেছিল, তাহারা তাহার অকালে সমাপন দেখিয়া ঘোরতর অসূয়া-সূচক সমালোচনার অবতারণা করিল। উদ্ভিদ্-কর্ত্তন-পরায়ণা সুন্দরীগণ অস্পষ্টালোকে স্ব স্ব কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছিলেন, তথাপি অবগুণ্ঠন দীর্ঘীকৃত করিলেন। যে মেয়েরা বাটনা বাটিতেছিল, তাহারা বড় গোলে পড়িল। এত ঠক্ ঠক্ করিয়া শব্দই বা করি কি করে? আর কাজ বন্ধ করিলেই বা কি মনে করিবেন? আর যাহারা দুগ্ধকটাহের তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত ছিল তাহারা আরও গোলে পড়িল। তাহারা হঠাৎ একটু অন্যমনস্ক হওয়ায় সব দুধটুকু উছলিয়া পড়িয়া গেল।

সীতারাম বলিলেন, "তোমরা কেউ গঙ্গাস্নানে যাবে গা ?" অমনি "বাবা আমি যাব," "দাদা আমি যাব," "জ্যাঠা আমি যাব," "মামা আমি যাব," ইত্যাদি শব্দ নানা দিক্ হইতে উত্থিত হইতে লাগিল। বৃদ্ধা, অর্দ্ধবয়স্কা, প্রৌঢ়া, যুবতী, কিশোরী, বালিকা, পোগণ্ড এবং অপোগণ্ড শিশু, সকলেই এক স্বরে বলিল, "আমি যাব।" অকর্ত্তিত মৎস্য অরক্ষিত হইয়া কুক্কুর এবং বিড়ালের মনোহরণ করিতে লাগিল। যত্ন-প্রস্তুত এবং কর্ত্তিত অলাবু এবং বার্ত্তাকুরাশি রোমন্থশালিনী গাভী জিহ্বা প্রসারণপূর্ব্বক উদরসাৎ করিতে লাগিল, কেহ দেখিল না। কাহারও দুধ আঁকিয়া গেল, কেহ শিল নোড়া বাধিয়া পড়িয়া গেল। কাহারও ছেলে কাঁদিয়া বড় গণ্ডগোল বাধাইল, কিন্তু কিছুতেই কাহারও দৃক্পাত নাই।

সীতারাম বলিলেন, "তবে সকলেই চল। কিন্তু আর সময় নাই, আজ রাত্রে দিন ভাল, খাওয়া দাওয়ার পর সকলকেই যাত্রা করিতে হইবে। অতএব এই বেলা উদ্যোগ কর।"

তৎপরে সীতারাম যথাকালে গৃহিণীর নিকট দেখা দিলেন। গৃহিণী বলিলে একটু দোষ পড়ে। কেন না, গৃহিণী শব্দ একবচন। এদিকে গৃহিণী, দুইটি। তবে বাঙ্গালায় দ্বিবচন নাই; আর একবারেও দুই গৃহিণীর সাক্ষাৎ হইতে পারে না। এই জন্য বৈয়াকরণদিগের নিকট করযোড়ে মার্জ্জনা প্রার্থনা করিয়া আমরা গৃহিণী শব্দই প্রয়োগ করিলাম।

গৃহিণী দুইটি বলিয়া লোকে নাম রাখিয়াছিল, সত্যভামা আর রুক্মিণী। সত্যভামা এবং রুক্মিণীর চরিত্রের সঙ্গে তাহাদের চরিত্রের যে কোন সাদৃশ্য ছিল, এমন আমরা অবগত নহি। তাহাদিগের প্রকৃত নাম নন্দা ও রমা। যাঁহার কাছে এখন সীতারাম আসিলেন, তিনি নন্দা। লোকে বলিত সত্যভামা।

নন্দা অন্তরাল হইতে সব শুনিয়াছিল। সীতারামকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "হঠাৎ গঙ্গাস্নানের এত ঘটা কেন ?"

সীতারাম বলিলেন, "গঙ্গে গঙ্গেতি যো ব্রূয়াৎ—"

নন্দা। তা জানি, তিনি মাথায় থাকুন। হঠাৎ তাঁর উপর এ ভক্তি কেন ?

সীতা। দেখ, তোমাদের ঐহিক সুখের জন্য আমার যেমন জবাবদিহি, তোমাদের পরকালের সুখের জন্যও আমার তেমনি জবাবদিহি। সামনে একটি যোগ আছে, তোমাদের গঙ্গাস্নানে পাঠাব না ?

নন্দা। তুমি যখন কাছে আছ, তখন আবার আমাদের গঙ্গাস্নান কি ? তুমিই আমাদের সকল তীর্থ। তোমার পাদোদক খাইলেই আমার এক শ গঙ্গাস্নানের ফল হইবে। আমি যাব না।

সীতা। (সত্যভামার নিকট হার মানিয়া) তা তুমি না যাও না যাবে, যারা যেতে চায়, তারা যাক্।

নন্দা। তা যাক্, সবাই যাক্, আমি একা থাকিব, একটু ভূতের ভয় করিবে, তা কি করিব ? কিন্তু আসল কথা কি, বল দেখি ?

সীতা। আসল আর নকল কিছু আছে না কি ?

নন্দা। তুমি ত ভাজ পটল, বল উচ্ছে।

সীতা। তবু ভাল, উচ্ছে ভেজে ত পটল বলি না ?

নন্দা। তা বল না, কিন্তু আমাদের কাছে দুই সমান; লুকোচুরিতেই প্রাণ যায়। ভিতরের কথা কি বলিবে ?

সীতা। বলিবার হইত ত বলিতাম।

অমনি নন্দার মুখখানা মেঘঢাকা মেঘঢাকা আকাশের মত, জলভরা জলভরা ফোটা পদ্মটার মত, হাই দিলে আরসি যেমন হয়, সেই মত এক রকম কি হইয়া গেল। একটু ধরা ধরা ভরা ভরা আওয়াজে নন্দা বলিল, "তা নাই বলিলে, তা সন্ধ্যার পর তোমার কাছে কে এসেছিল, সেইটা বল?"

সীতা। তা ঢের লোক ত আমার কাছে আসে। সন্ধ্যার পর অনেক লোক এয়েছিল।

নন্দা। মেয়েমানুষ কে এয়েছিল?

সীতা। তাও ত ঢের আসে। খাজনা মেটাতে, ভিক্ষা মাঙ্‌তে, দায়ে অদায়ে পড়িয়া ঢের মাগী ত আমার কাছে আসে। স্ত্রীলোক প্রায় সন্ধ্যার পরই আসে।

নন্দা। আজ সন্ধ্যার পর কজন স্ত্রীলোক এয়েছিল?

সীতা। মোটে এক জন।

নন্দা। সে কে?

সীতা। তার ভাই বাঁচে না।

নন্দা। তা নয়—সে কে? নাম কি?

সীতা। আর এক দিন বলিব।

এইবার মেঘ বর্ষিল, দর্পণস্থ বাষ্পরাশি জলবিন্দুতে পরিণত হইল,—সত্যভামা কাঁদিল।

তখন সীতারাম নন্দার চিবুক গ্রহণপূর্ব্বক বড় মধুর আদর করিয়া সেখান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

যেখানে রমা ঠাকুরাণী দর্পণ লইয়া সরু সরু কালো কুচ্‌কুচে চুলের দড়িগুলি গুচাইতেছিলেন, সেইখানে গিয়া সীতারাম দর্শন দিলেন। রমা কনিষ্ঠা,—নন্দার অপেক্ষা একে বয়সে ছোট, আবার আকারেও ছোট, সুতরাং নন্দার অপেক্ষা অনেক ছোট দেখাইত। নন্দার যৌবন এবং রূপ উভয়ই পরিপূর্ণ, শ্রাবণের গঙ্গা,—রমার দুইই অপরিপূর্ণ, বসন্তনিকুঞ্জপ্রহ্লাদিনী ক্ষুদ্রা কল্লোলিনী। নন্দা তপ্তকাঞ্চনবৎ শ্যামাঙ্গ—রমা হিমানীপ্রতিফলিত কৌমুদীবৎ গৌরাঙ্গী। সেইখানে গিয়া সীতারাম দর্শন দিলেন। বলিলেন, "রুক্মিণি! গঙ্গাস্নানের কথা শুনেছ?"

রমা। ছি ছি, ও কি কথা!

সীতা। কোন্‌টা ছি ছি? গঙ্গাস্নান ছি ছি? না রুক্মিণী ছি ছি?

রমা। তাঁরা হোলেন দেবতা, লক্ষ্মী,—আর সেই একটা কি নাম মনে আসে না—

সীতা। শিশুপালের গল্পটা বটে? তা সে কথা রহিল। গঙ্গাস্নানের কথাটা কি? শুনেছ?

রমা। শুনেছি বৈ কি।

সীতা। যাবে?

রমা। তাই ত চুলের দড়ি গোছাচ্চি।

সীতা। কেন যাবে? এই ত আমি তোমার সর্ব্বতীর্থ কাছে আছি।

রমা। যেতে না বল, যাব না।

সীতা। তবে যাইবার উদ্যোগ করিতেছিলে কেন?

রমা। যাইতে বলিতেছিলে বলিয়া।

সীতা। আমি ত যাইতে বলি নাই—আমি কেবল সবাইকে জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম যে, কেহ যাবে? তা তুমি যাবে কি?

রমা। তুমি যাবে কি?

সীতা। যাব।

রমা। তবে আমিও যাব।

সীতা। কিন্তু আজ আমি তোমাদের সঙ্গে যাব না। কাল পথে মিলিব।

রমা। আজ আমাদের নিয়ে যাবে কে?

সীতা। মৃণ্ময় নিয়ে যাবে।

রমা। তা হোক্। একটা কথা বলিবে?

সীতা। কি?

রমা। তোমার কি কাজ?

সীতা। সব কথা কি বলা যায়?

রমা। (সীতারামকে উভয় বাহুদ্বারা বেষ্টন করিয়া) বলিতে হইবে। তোমার বড় সাহস, আমার বড় ভয় করে, তুমি কোন দুঃসাহসের কাজ করিবে,—তাই আমাদের সরাইয়া দিতেছ।

সীতারাম ক্রুদ্ধ হইয়া রমার খোঁপা ধরিয়া টানিল, মারিবার জন্য এক চড় উঠাইল, শেষে রমার নাক ধরিয়া নাড়িয়া দিল। বলিল, "আমি বড় দুঃসাহসের কাজ করিব সত্য, কিন্তু কোন ভয় নাই।"

রমা। তোমার ভয় নাই—আমার আছে। তোমার ভয় আমার ভয় কি স্বতন্ত্র? শোন, আজ সবার গঙ্গাস্নান যাওয়া বন্ধ। তুমি আজ আমার এই ঘরের ভিতর কয়েদী।

বলিতে বলিতে রমা দ্বার অর্গলবদ্ধ করিয়া দ্বারে পিঠ দিয়া বসিল। বলিল, "যাইতে হয়, আমার গলায় পা দিয়া যাও। এখন বল দেখি, আজ তোমার কাছে কে আসিয়াছিল?"

সীতা। তোমাদের কি অষ্ট প্রহর চর ফেরে নাকি?

রমা। ভাণ্ডারী মহাশয় কিছু তরকারির প্রত্যাশায় বঞ্চিত হয়েছেন, তাই আমরা ও কথাটাও শুনিয়াছি। সে কে?

সীতা। শ্রী।

রমা। সে কি? শ্রী? কেন আসিয়াছিল?

সীতা। তার একটি ভিক্ষা ছিল।

রমা। ভিক্ষা পাইয়াছে কি?

সীতা। তুমি কি ভিক্ষুককে ফিরাইয়া থাক?

রমা। তবে ভিক্ষা সে পাইয়াছে। কি দিলে?

সীতা। কিছু দিই নাই, দিব স্বীকার করিয়াছি।

রমা। কি দিবে শুনিতে পাই না

সীতা। এখন না; দ্বার ছাড়।

রমা। সকল কথা ভাঙ্গিয়া না বলিলে, আমি দ্বার ছাড়িব না।

সীতা। তবে শুন, কাজি সাহেব শ্রীর ভাইকে জীয়ন্ত পুঁতিয়া ফেলিবার হুকুম দিয়াছেন। শ্রীর ভিক্ষা, আমি তাহার ভাইকে রক্ষা করি। আমি তাহা স্বীকার করিয়াছি।

রমা। তাই, আমরা আজ গঙ্গাস্নানে যাইব! তুমি আমাদের পাঠাইয়া দিয়া, নির্বিঘ্নে ফৌজদারের ফৌজের সঙ্গে লাঠালাঠি দাঙ্গা করিবে।

সীতা। সে সকল কথায়, মেয়ে মানুষের কাজ কি?

রমা। কাজ কি? কিছুই কাজ নাই। তবে কি না, আমি গঙ্গাস্নানে যাইব না।

এই বলিয়া রমা, ভাল করিয়া দ্বার চাপিয়া বসিল। সীতারাম অনেক মিনতি করিতে লাগিল। রমা বলিল, "তবে আমারও কাছে একটা সত্য কর, দ্বার ছাড়িয়া দিতেছি।"

সীতা। কি বল?

রমা। তুমি বিনা বিবাদ বিসম্বাদে—দাঙ্গা লড়াই না করিয়া শ্রীর ভ্রাতার জন্য যাহা পার, কেবল তাহাই করিবে, ইহা স্বীকার কর।

সীতা। তাতে আমি খুব সম্মত। দাঙ্গা লড়াই, আমার কাজও নয়, ইচ্ছাও নয়। কিন্তু যত্ন সফল হইবে কি না, সন্দেহ।

রমা। হৌক না হৌক—বিনা অস্ত্রে যা হয়, কেবল তাই করিবে, স্বীকার কর।

কিছুক্ষণ ভাবিয়া সীতারাম বলিলেন, "স্বীকার করিলাম।"

রমা প্রসন্নমনে, দ্বার ছাড়িয়া দিল। বলিল, "তবে আমরা গঙ্গাস্নানে যাইব না।"

সীতারাম ভাবিলেন। বলিলেন, "যখন কথা মুখে আনা হইয়াছে, তখন যাওয়াই ভাল।"

রমা বিষণ্ণ হইল, কিন্তু আর কিছু বলিল না। সীতারাম আর কাহাকে কিছু না বলিয়া বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেলেন। আর ফিরিলেন না।

পৃ. ৩৪, প. ২৪-২৭, "আমরা আজিকার ··কিছুক্ষণ পরে" ইহার পরিবর্তে ছিল—
সীতারাম একখানি ভাল বাড়ী তাঁহাকে থাকিতে দিয়াছিলেন।

পৃ. ৩৫, প. ১-৪, "কথাবার্ত্তার ফল···পাঠাইয়া দিলেন।" ইহার পরিবর্তে ছিল—
চন্দ্রচূড়ের কাছে লুকাইবার যোগ্য সীতারামের কোন কথাই ছিল না। শ্রীর কাছে আর রমার কাছে যে দুইটি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, সীতারাম তাহা সবিস্তারে নিবেদিত হইলেন। বলিলেন, "এই উভয় সঙ্কটে কি প্রকারে মঙ্গল হইবে, আমি বুঝিতে পারিতেছি না। নারায়ণ মাত্র ভরসা। মারামারি কাটাকাটিতে আমার কিছুমাত্র প্রবৃত্তি নাই। আমি সেই জন্যই মৃণ্ময়কে সরাইয়াছি। কিন্তু স্তুতি মিনতিতেও কার্য্যসিদ্ধি হইবে, এমন ভরসা করি না। যাই হৌক, প্রাণপাত করিয়াও আমি এ কাজ উদ্ধার করিতে রাজি আছি। সিদ্ধি আপনার আশীর্ব্বাদ। যদি সিদ্ধি না হয়, তবে পাপ শান্তির জন্য কাল প্রাতে তীর্থযাত্রা করিব। তাই আপনাকে প্রণাম করিতে আসিয়াছি।"

চন্দ্রচূড়। আমি সর্ব্বদাই আশীর্ব্বাদ করিয়া থাকি, এখনও করিতেছি, মঙ্গল হইবে। সম্প্রতি এই রাত্রেই কি তুমি কাজির নিকট যাইবে?

সীতা। না। কাল উপযুক্ত সময়ে কাজির নিকট উপস্থিত হইব।

চন্দ্রচূড় তর্কালঙ্কার, সহজ লোক নহেন। তিনি মনে মনে ভাবিতেছিলেন, "বাবাজি একটু গোলে

পড়িয়াছেন, দেখিতেছি। যুদ্ধ বিগ্রহে যে ইচ্ছা নাই, সে কথাটা মনকে চোক্-ঠারাই বোধ হইতেছে। সেই রুক্মিণী বেটীই যত নষ্টের গোড়া। তা বেটী মনে করে কি, রুক্মিণী আছে, নারদ নাই! জাত নেড়ে, বাপু বাছার কি কাজ! নারায়ণ কি নেড়ের দমন করিবেন না? কত কাল আর হিন্দু এ অত্যাচার সহ্য করিবে? একবার দেখি না, সীতারামের বাহুতে বল কত? বৃথাই কি নারায়ণকে তুলসী দিই?"

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে তর্কালঙ্কার বলিলেন, "তুমি তীর্থযাত্রা করিবে, এবং পরিবারবর্গকে গঙ্গাস্নানে পাঠাইবে শুনিয়া, আমি বড় বিপন্ন হইলাম।

সীতা। কি? আজ্ঞা করুন।

চন্দ্র। আমি তোমাদের মঙ্গলার্থ কোন যজ্ঞের সঙ্কল্প করিয়াছি। তাহাতে এক সহস্র রৌপ্যের প্রয়োজন। তাই বা আমায় দিবে কে? উদ্যোগই বা করিয়া দেয় কে?

সীতা। টাকা এখনই আনাইয়া দিতেছি। আর উদ্যোগের জন্য কাহাকে চাই?

চন্দ্র। যজ্ঞের যে সকল আয়োজন করিতে হইবে, জীবন ভাণ্ডারী তাহাতে বড় সুপটু। জীবন ভাণ্ডারীকেও আনাইয়া দাও। আমার এই তল্পিদার ভৃত্য রামসেবক বড় গুণবান্ আর বিশ্বাসী। তার হস্তে খাজাঞ্চিকে পত্র পাঠাইয়া দাও, টাকা ও জীবন ভাণ্ডারীকে আনিবে।

সীতারাম তখন একটু কলাপাতে বাঁকারির কলমে খাজাঞ্চির উপর এক হাজার টাকা ও জীবন ভাণ্ডারীর জন্য চিঠি পাঠাইলেন। রামসেবক তাহা লইয়া গেল। চন্দ্রচূড় তর্কালঙ্কার তখন সীতারামকে বলিলেন, "এক্ষণে তুমি গমন কর। আমি আশীর্ব্বাদ করিতেছি, মঙ্গল হইবে।"

তখন সীতারাম গুরুদেবকে প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিলেন। এদিকে অনতিবিলম্বে জীবন ভাণ্ডারী সহস্র রৌপ্য লইয়া আসিয়া তর্কালঙ্কার মহাশয়কে প্রদান করিল। তর্কালঙ্কার বলিলেন, "কেমন জীবন! এ সহরে তোমার মুনিবের যে যে প্রজা, যে যে খাতক আছে, সকলের বাড়ী চেন ত?"

জীবন। আজ্ঞা হাঁ, সব চিনি।

চন্দ্র। আজ রাত্রে সব আমায় দেখাইয়া দিতে পারিবে ত?

জীবন। আজ্ঞা হাঁ, চলুন না। কিন্তু আপনি এত রাত্রে সে সব চাঁড়াল বাগ্দীর বাড়ী গিয়া কি করিবেন?

চন্দ্র। বেটা, তোর সে কথায় কাজ কি? তোর মুনিব আমার কথায় কথা কয় না,—তুই বকিস্! আমি যা বলিব, তাই করিবি, কথা কহিবি না।

জীবন। যে আজ্ঞা, চলুন। এ টাকা কোথায় রাখিব?

চন্দ্র। টাকা সঙ্গে নিয়ে চল্। আমি যা করিব, তা যদি কাহারও সাক্ষাতে প্রকাশ করিস্, তবে তোর শূল-বেদনা ধরিবে—আর তুই শিয়ালের কামড়ে মরিবি।

এখন জীবন ভাণ্ডারী শূল-বেদনা এবং শৃগাল, এ উভয়কেই বড় ভয় করিত—সুতরাং সে ব্রহ্মশাপ-ভয়ে আর দ্বিরুক্তি করিল না। চন্দ্রচূড় তর্কালঙ্কার তখন পূজার ঘর হইতে এক আঁজলা প্রসাদী ফুল নামাবলীতে লইয়া জীবন ভাণ্ডারী ও সহস্র রৌপ্য সহায় হইয়া বাহির হইলেন। কিয়দ্দূর গিয়া জীবন ভাণ্ডারী একটা বাড়ী দেখাইয়া দিয়া বলিল, "এই এক জন।"

চন্দ্র। এর নাম কি?

জীবন। এর নাম যুধিষ্ঠির মণ্ডল।

চন্দ্র। ডাক তাকে।

তখন জীবন ভাণ্ডারী "মণ্ডলের পো! মণ্ডলের পো!" বলিয়া যুধিষ্ঠিরকে ডাকিল। যুধিষ্ঠির বলিল, "কে গা?"

চন্দ্রচূড় বলিলেন, "কাল গঙ্গারাম দাসের জীয়ন্তে কবর হইবে শুনিয়াছ?"

যুধিষ্ঠির। শুনিয়াছি।

চন্দ্র। দেখিতে যাইবে?

যুধিষ্ঠির। নেড়ের দৌরাত্ম্য, কি হবে ঠাকুর, দেখে?

চন্দ্র। দেখিতে যাইও। লক্ষ্মীনারায়ণজীউর হুকুম। এই হুকুম নাও।

এই বলিয়া তর্কালঙ্কার ঠাকুর একটি প্রসাদী ফুল নামাবলী হইতে লইয়া যুধিষ্ঠিরের হাতে দিলেন। যুধিষ্ঠির তাহা মাথায় ঠেকাইয়া বলিল, "যে আজ্ঞে। যাইব।"

চন্দ্র। তোমার হাতিয়ার আছে?

যুধি। আজ্ঞে, এক রকম আছে। মুনিবের কাজে মধ্যে মধ্যে ঢাল শড়কী ধরিতে হয়।

চন্দ্র। লইয়া যাইও। লক্ষ্মীনারায়ণজীউর হুকুম। এই হুকুম লও।

এই বলিয়া চন্দ্রচূড় তর্কালঙ্কার জীবন ভাণ্ডারীর থলিয়া হইতে একটি টাকা লইয়া যুধিষ্ঠিরকে দিলেন।

যুধিষ্ঠির টাকা লইয়া—মাথায় ঠেকাইয়া বলিল, "যে আজ্ঞে, অবশ্য লইয়া যাইব। কিন্তু একটা কথা বলিতেছিলাম কি—একা যাব?"

চন্দ্র। কাকে নিয়ে যেতে চাও?

যুধি। এই পেসাদ মণ্ডল জোয়ানটাও খুব, খেলোয়াড়ও ভাল—সে গেলে হইত।

তখন চন্দ্রচূড় আরও কতকগুলি প্রসাদী ফুল ও টাকা যুধিষ্ঠিরের হাতে দিলেন। বলিলেন, "যত লোক পার, লইয়া যাইও।"

এই বলিয়া চন্দ্রচূড় ঠাকুর সেখান হইতে জীবন ভাণ্ডারীর সঙ্গে গৃহান্তরে গমন করিলেন। সেখানেও ঐরূপ টাকা ও ফুল বিতরণ করিলেন। এইরূপে সহস্র মুদ্রা বিতরণ করিয়া রাত্রিশেষে গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। শ্রীতে রমাতে সে রাত্রে এমনই আগুন জ্বালাইয়া তুলিয়াছিল।

পৃ. ৩৫, পংক্তি ৫, এই "চতুর্থ" পরিচ্ছেদটি প্রথম সংস্করণের "পঞ্চম" পরিচ্ছেদ।

পৃ. ৩৬, পংক্তি ১৩, এই পংক্তির শেষে ছিল—

তিনি অতি প্রত্যূষে উঠিয়া যে পথে শ্রীকে নগর হইতে প্রান্তরে আসিতে হইবে, সেই পথে দাঁড়াইয়াছিলেন। শ্রীকে দেখিয়া উপযাচক হইয়া তাহার সহায় হইয়াছিলেন। শ্রী তাঁহাকে চিনিত, তিনিও শ্রীকে চিনিতেন। সে পরিচয়ের কারণ পরে জানা যাইতে পারে।

পৃ. ৪৩, পংক্তি ১২, এই "পঞ্চম" পরিচ্ছেদটি প্রথম সংস্করণের "ষষ্ঠ" পরিচ্ছেদ।

পৃ. ৪৪, পংক্তি ১০-১১, "করিলেন। গঙ্গারাম সীতারামের" এই কথা কয়টির পরিবর্তে ছিল—

করিয়া বলিলেন, "আমি এখন ফোজদারের কাছে যাইব—তুমি আমার সঙ্গে যাইবে?"

গঙ্গারাম সীতারামের কথা শুনিয়া না হউক,

পৃ. ৪৪, পংক্তি ৩, "চন্দ্রচূড়···শ্রী এদিকে" এই পংক্তিটির পরিবর্ত্তে ছিল—

এদিকে চন্দ্রচূড় ঠাকুর মূর্চ্ছিতা শ্রীকে "ঝাড় ফুঁক" করিতেছিলেন। যদি সভ্য ভাষায় বলিতে হয়, বল, মেস্মেরাইস্ করিতেছিলেন। পরে শ্রী, যে কারণেই হউক,

পৃ. ৪৪, পংক্তি ১৫, এই পংক্তির শেষে ছিল—

তার পর কাহাকে কিছু না বলিয়া ধীরে ধীরে নগরাভিমুখে চলিয়া গেল।

সে কিছু দূর গেলে সীতারাম চন্দ্রচূড়কে বলিলেন, "আপনি ওঁর পিছু পিছু যান। ওঁর যাহাতে রক্ষা হয়, সে ব্যবস্থা করিবেন। আপনাকে বেশী বলিতে হইবে না।"

চন্দ্র। আর তুমি এখন কি করিবে?

সীতা। তাহা স্থির করি নাই। আপনি শ্যামপুরে গমন করুন। যদি জীবিত থাকি, সেইখানে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবে।

শুনিয়া চন্দ্রচূড় বিষণ্ণমনে বিদায় গ্রহণ করিয়া, শ্রীর পশ্চাদ্বর্ত্তী হইলেন। গুরু শিষ্য পরস্পরকে ভাল চিনিতেন। সুতরাং চন্দ্রচূড় কোন কথা কহিতে পারিলেন না।

সকলেই চলিয়া গেল। মাঠে আর কেহ নাই। কেবল একা সীতারাম—সেই বৃক্ষমূলে, যে ডালের উপর চণ্ডীমূর্ত্তি শ্রী দাঁড়াইয়া রণজয় করিয়াছিল, সেই ডাল ধরিয়া ভূতলে দাঁড়াইয়া সীতারাম একা। আমাদের সকলেরই কখনও কখনও এমন সময় উপস্থিত হয়, যখন এক মুহূর্ত্তের দ্বারা সমস্ত জীবন শাসিত হয়। সীতারামের তাই হইল। ভাবিতেছিলেন, এ কাণ্ড কি? কেন হইল? কে করিল? ভাল হইয়াছে কি? ইহার কারণ কি? উপায় কি? কিসের লক্ষণ?

যে দিকে সীতারাম মনশ্চক্ষু ফিরান, সেই দিকে দেখিতে পান, **মুসলমানের অত্যাচার!**

সুরাসুর মনে পড়িল। বৃত্র, সম্বর, ত্রিপুর, সুন্দ, উপসুন্দ, বলি, প্রহ্লাদ, বিরোচন—কে মারিল? কেন মারিল? কেনই বা হইল? কেনই মরিল?

তাহার পর রাক্ষস—মানুষ, ইহাদের কথা মনে পড়িল। রাবণ, কুম্ভকর্ণ, ইন্দ্রজিৎ, অলম্বুষ, হিড়িম্ব, বক, ঘটোৎকচ, দন্তবক্র, শিশুপাল, একলব্য, দুর্য্যোধন, কংস, জরাসন্ধ, কে মারিল? কেন মরিল? নহুষ কেন অজগর হইল?

শেষ মনে মনে স্থির হইল, সেই দুর্দ্দমনীয় মানসিক স্রোতের প্রক্ষিপ্ত সার এই পাইলেন—**দেব**। দেব—অর্থে ধর্ম্ম।

তখন একটা প্রকাণ্ড কাণ্ড সীতারামের মনের ভিতর উপস্থিত হইল। যেমন আলোক দেখিতে দেখিতে চোখ বুজিলে, তবু অন্ধকারের ভিতর একটু রাঙ্গা রাঙ্গা ছায়া দেখা যায়, প্রথমে মনে হয়, ভ্রম মাত্র, তার পর বুঝা যায় যে, ভ্রম নয়, সত্য আলোকের ছায়া—সীতারাম সেই রকম একটু রাঙ্গা ছায়া দেখিলেন মাত্র। তার পর, যেমন, বনস্থ ভূপতিত পত্ররাশি মধ্যে প্রথম যেন একটু খদ্যোতোন্মেষবৎ অগ্নি দেখা যায়, বড় ক্ষীণ বটে, কিন্তু তবু আলো, তেমনি আলো বলিয়া, সীতারামের বোধ হইল। হায়! হৃদয়ের ভিতর আলো কি মধুর! কি স্বর্গ! অথবা স্বর্গ ইহার কাছে কোন্ ছার! যে একবার, আপনার হৃদয়ে আলো দেখিয়াছে, সে আর ভুলে না! জগতের সার সুখ প্রতিভা। প্রতিভাই ঈশ্বরকে দেখায়।

জোনাকির মত তেমনি একটা আলোক, সীতারাম, আপনার হৃদয়মধ্যে দেখিলেন। যেমন বনতলস্থ শুষ্ক পত্ররাশিমধ্যে সেই খদ্যোতবৎ ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গ, ক্রমে একটু একটু করিয়া বাড়ে, ক্রমে একটু একটু করিয়া জ্বলে, সীতারামও আপনার হৃদয়ে তাই দেখিলেন। দেখিলেন, ক্রমে অনেক শুষ্ক পত্র ধরিয়া গেল, ক্রমে সেই অন্ধকার বন আলো হইতে লাগিল। ক্রমে সে শ্যামল পল্লবরাশি শ্যামলতা হারাইয়া উজ্জ্বল হরিৎ প্রভা প্রতিহত করিতে লাগিল,—ফুলে, ফলে, পাতায়, লতায়, কাণ্ডে, দণ্ডে, উজ্জ্বল জ্বালা কাঁপিতে লাগিল। ক্রমে সব আলো—শেষ ঘোর দাবানল, সব অগ্নিময়, শত সূর্য্য-প্রকাশ! তখন সীতারাম বুঝিলেন, হৃদয়ের সে আলোটা কি। বুঝিলেন, হৃদয়ে সহসা যে প্রভাকর উদিত হইয়াছে, তাহার নাম—

ধর্ম্ম-রাজ্য-স্থাপন!

বুঝিলেন, এই সূর্য্যে সকল অন্ধকার মোচন করিবে।

সীতারাম বুঝিবামাত্র ক্ষিপ্তবৎ হইলেন। প্রতিভা কে হৃদয়ে ধারণ করিয়া, ধৈর্য্য রক্ষা করে! প্রথম উচ্ছ্বাসে তিনি বাহ্বাস্ফোটন করিয়া বলিলেন, "এই বাহু! ইহাতে কি বল নাই? কে এমন তরবারি ধরিতে পারে? কাহার বন্দুকের এমন লক্ষ্য! কাহার মুষ্টিতে এত জোর! এ রসনায় কি বাগ্দেবীর প্রসাদ নাই? কে লোকের এমন মন হরণ করিতে পারে। আমি কি কৌশল জানি না—"

সহসা যেন সীতারামের মাথায় বজ্রাঘাত হইল। হৃদয়ের আলো একেবারে নিবিয়া গেল! "এ কি বলিতেছি! আমি কি পাগল হইয়াছি! আমি কি করিতেছি! আমি কে! আমি কি! আমি ত একটি ক্ষুদ্র পিপীলিকা—সমুদ্র-তীরের একটি বালি! আমার এত দর্প! এই বুদ্ধিতে সাম্রাজ্যের কথা আমার মনে আসে! ধিক্ মনুষ্যের বুদ্ধিতে!"

তখন সীতারাম কায়মনোবাক্যে জগদীশ্বরে চিত্ত সমর্পণ করিলেন। অনন্ত, অব্যয়, নিখিল জগতের মূলীভূত, সর্ব্বজীবের প্রাণস্বরূপ, সর্ব্বকার্য্যের প্রবর্ত্তক, সর্ব্বকর্ম্মের ফলদাতা, সর্ব্বাদৃষ্টের নিয়ন্তা, তাঁহার শুদ্ধি, জ্যোতি, অনন্ত প্রকৃতি ধ্যান করিতে লাগিলেন। তখন বুঝিলেন, "তিনিই বল! তিনিই বাহুবল! তিনিই ধর্ম্ম! ধর্ম্মচ্যুত যে বাহু-বল, তাহা পরিণামে দুর্ব্বলতা। সীতারাম তখন বুঝিলেন,

ধর্ম্মই ধর্ম্ম-সাম্রাজ্য সংস্থাপনের উপায়।

সীতারামের হৃদয়, অতিশয় স্নিগ্ধ, সন্তুষ্ট ও শীতল হইল।

তখন প্রান্তর পানে চাহিয়া সীতারাম দেখিলেন, মাঠ অশ্বারোহী মুসলমান-সেনায় ভরিয়া গিয়াছে।

পৃ. ৪৪, প. ১৬, এই "ষষ্ঠ" পরিচ্ছেদটি প্রথম সংস্করণের "দশম" পরিচ্ছেদ। এই পরিচ্ছেদের পূর্ব্বে ১ম সংস্করণে আরও তিনটি পরিচ্ছেদ ছিল। সেগুলি এইরূপ—

সপ্তম পরিচ্ছেদ

মুসলমান সেনা নির্গমের পূর্ব্বেই ফৌজদারের হুজুরে সম্বাদ পৌঁছিল যে, বিদ্রোহীরা পলাইয়াছে। অতএব এক্ষণে যুদ্ধার্থে সেনা নির্গত না হইয়া কেবল বিদ্রোহীর ধৃতার্থ অশ্বারোহী সেনাগণ নির্গত হইয়াছিল। বহুসংখ্যক সেনা প্রান্তরমধ্যে উপস্থিত হইয়া, কাহাকেও না দেখিয়া, কেহ গ্রামাভিমুখে, কেহ

নগরাভিমুখে ধাবমান হইতেছিল। তাহারই এক জন সীতারামের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। বলিল, "তোম্ কোন্ ?"

সীতা। মনুষ্য।

সিপাহী। সো তো দেখ্‌তে হেঁ। নাম কিয়া তোমার ?

সীতা। কি কাজ বাপু তোমার নামে ?

সিপাহী। তোম্ বদমাস্।

সীতা। হবে।

সিপাহী। খানাবদোষ।

সী। সম্ভব।

সি। ডাকু হো ?

সী। বোধ হয় কি ?

সি। চোট্টা হোগে।

সী। দিল্লীর বাদশাহের চেয়ে ?

সি। কিয়া বোলো ?

সী। বলি তুমি আমায় দিক্ করিতেছ কেন ?

সি। তোম্‌কো গিরেফ্‌তার কোরেঙ্গে ?

সী। আপত্তি কি ?

সি। চল্।

সী। কোথায় ?

সি। ফাটক্‌মে।

সী। চল। কিন্তু তুমি ত ঘোড়ায়। আমি হাঁটিয়া তোমার সঙ্গে যাইব কি প্রকারে ?

সি। কদম কদম আও।

সিপাহী সাহেব কদম কদম চলিলেন। সীতারাম সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। সিপাহী এক জন পাইকের সাক্ষাৎ পাইয়া তাহাকে হুকুম দিলেন যে, "এই ব্যক্তি চোর, ইহাকে ফাটকের জমাদ্দারের কাছে পঁহুছাইয়া দিবে।"

অষ্টম পরিচ্ছেদ

চন্দ্রচূড় তর্কালঙ্কার শ্রীকে লইয়া নির্ব্বিঘ্নে নগরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়া তাহাকে লইয়া এক নিভৃত ক্ষুদ্র বাটিকা মধ্যে গমন করিলেন, বলিলেন, "আইস বাছা! এখানে বড় জাগ্রত কালী আছেন, প্রণাম করিয়া যাই। তিনি মঙ্গল করিবেন।"

গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া শ্রী দেখিলেন, গৃহ বড় নিভৃত, তাহার এক ঘরে এক কালীমূর্ত্তি, ফুল বিল্বপত্রে অর্দ্ধেক ঢাকা পড়িয়া আছেন। গৃহে কেহ নাই, কেবল এক অশীতিপর বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী। তিনিই দেবীর অধিকারিণী। চন্দ্রচূড়কে দেখিয়া বৃদ্ধা বলিল, "তর্ক বাবা যে গো ?"

চন্দ্র। কেমন মা? মার পূজা চলিতেছে কেমন?

অশীতিপর বৃদ্ধার শ্রবণেন্দ্রিয় বড় তীক্ষ্ণ নহে। সে শুনিল, "তোমার বোনপো আছে কেমন?" উত্তরে বলিল, "আজও জ্বর সারে নাই, তার উপর পেটের ব্যামো, মা কালী রক্ষা করিলে হয়।" চন্দ্রচূড় এইরূপ দুই চারিটা কথাবার্ত্তা বৃদ্ধার সঙ্গে কহিবাতে শ্রী বুঝিল—বুড়ী ঘোর কালা। চন্দ্রচূড় তখন শ্রীকে বলিলেন, "এই বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীর ঘরে তুমি আজ কাল থাক। তার পর গঙ্গারাম সুস্থির হইলে, আমি তোমাকে তাহার কাছে লইয়া যাইব। তোমার নিজ বাড়ীতে এখন একা থাকিবে কি প্রকারে? বিশেষ মুসলমানের ভয়।"

শ্রী। ঠাকুর! মুসলমানের এ দৌরাত্ম্য কত কাল আর থাকিবে? শাস্ত্রে কি কিছু নাই?

চন্দ্র। কিছু না, মা। এ শাস্ত্রের কথা নয় মা। হিন্দুর গায়ে বল হইলেই হইল।

শ্রী। ঠাকুর! হিন্দুর গায়ে বলের কি অভাব? এই ত এখনই দেখিলেন?

বলিতে বলিতে শ্রী, দৃপ্তা সিংহীর মত ফুলিয়া উঠিল।

চন্দ্র। যা দেখিলাম মা, সে তোমারই বল—এমন কি আবার হইবে?

দৃপ্তা সিংহী লজ্জায় মুখ অবনত করিল। আবার মুখ তুলিয়া বলিল, "হিন্দুর গায়ে বলের এত অভাব কেন? কত লোকের বলের গল্প শুনি।"

তীক্ষ্ণবুদ্ধি চন্দ্রচূড় শ্রীর অলক্ষ্যে, শ্রীর আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিলেন, মনে মনে বলিলেন, "বেশ বাছা, বেশ! আমার মনের মত মেয়ে তুমি। আমিও সেই কথাটা ভাবিতেছিলাম।" প্রকাশ্যে বলিলেন, "হিন্দুর মধ্যে বলবান্ কি নাই? আছে বৈ কি। কিন্তু তাহারা মুসলমানের মুখ চায়। এই দেখ সীতারাম—সীতারাম না পারে কি? কিন্তু সীতারাম রাজভক্ত—বাদশাহের অনুগৃহীত—অকারণে রাজদ্রোহী হইবে না। কাজেই কে ধর্ম্ম রক্ষা করে?"

শ্রী। কারণ কি নাই?

জিজ্ঞাসা করিয়া শ্রী আবার লজ্জায় মুখ নামাইল। বলিল, "আমি অবলা—আপনাকে কেন এত জিজ্ঞাসা করিতেছি, জানি না,—আমার মার শোকে ভাইয়ের দুঃখে মন কেমন হইয়া গিয়াছে—তাই আমার জ্ঞান বুদ্ধি নাই।"

চন্দ্রচূড় সে কৈফিয়ৎটা কানেও না তুলিয়া, বলিলেন, "কারণ ত ঘটে নাই। ঘটিলে কি হইবে বলিতে পারি না। সীতারাম যত দিন মুসলমানের দ্বারা অত্যাচার প্রাপ্ত না হয়েন, বোধ হয় তত দিন তিনি রাজদ্রোহ-পাপে সম্মত হইবেন না।"

শ্রী অনেকক্ষণ নীরবে ভাবিতে লাগিল। চাতক পক্ষী যেমন মেঘের প্রতি চাহিয়া থাকে, ততক্ষণ চন্দ্রচূড় তাহার মুখ প্রতি সেইরূপ করিয়া চাহিয়া রহিলেন। শ্রী বহুক্ষণ অন্যমনা হইয়া ভাবিতেছে, সংজ্ঞালক্ষণ নাই দেখিয়া, শেষে চন্দ্রচূড় জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা! তবে তুমি এক্ষণে এখানে বাস কর, আমি এখন যাই।"

শ্রী কোন উত্তর করিল না—কথা তাহার কানে গিয়াছে, এমনও বোধ হইল না। চন্দ্রচূড় অপেক্ষা করিতে লাগিলেন—প্রতিভা কখন ফুটে, কখন নিবে, কখন স্থির, কখন আন্দোলিত, চন্দ্রচূড় তাহাকে চিনিতেন, অতএব ফলাকাঙ্ক্ষায় নীরবে শ্রীর মুখ প্রতি চাহিয়া রহিলেন। শেষ দেখিলেন, শ্রী সুস্থিরা,

প্রফুল্লমুখী, ভাস্বর-কটাক্ষবিশিষ্টা হইল। তখন বুঝিলেন, এবার মেঘ বারিবর্ষণ করিবে—চাতকের তৃষা ভাঙ্গিবে।

শ্রী অল্প ঘোমটা টানিয়া,—অল্প সলজ্জ হাসি হাসিয়া বলিল, "ঠাকুর! এখন কি একবার সে মাঠে যাওয়া যায় না?"

চন্দ্র। কেন? সেখানে এখন বিশেষ ভয়—চারি দিকে ফৌজ বেড়াইতেছে।

শ্রী। আমি সেখানে একটা কোন বিশেষ সামগ্রী হারাইয়া আসিয়াছি—আমার না গেলেই নয়। আপনি না হয় এইখানে থাকুন, আমি একা যাইতেছি। কিন্তু আপনি আসিলে ভাল হইত।

চন্দ্র। যে সাহস তোমার আছে, সে সাহস কি আমার নাই? চল, তোমার সঙ্গে যাইব।

তখন, শ্রী আগে আগে, চন্দ্রচূড় পিছে পিছে সেই মাঠে চলিলেন। সেখানে অনেক অশ্বারোহী পদাতিক বিদ্রোহীর অনুসন্ধানে ফিরিতেছিল—এক জন আসিয়া চন্দ্রচূড়কে ধরিল। জিজ্ঞাসা করিল, "তোম্ কোন্ হো?"

চন্দ্র। এই ত দেখিতেছ—ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণ। যজমানের বাড়ী পার্ব্বণের শ্রাদ্ধ—তাই গ্রামান্তরে যাইতেছি। কি করিতে হইবে বল—করি।

সিপাহী। আচ্ছা, তোম্ যাও—তোম্‌কো ছোড়্ দেতেহেঁ। যেহি আবরৎ* তোমারা কোন্ লগ্‌তী?

চন্দ্র। না বাপু—ও আমার কেহ হয় না।

এই বলিয়া চন্দ্রচূড় শ্রীর নিকট হইতে সরিয়া দাঁড়াইলেন, জানেন, এখন শ্রীর বুদ্ধিতে চলিতে হইবে।

তখন সিপাহী শ্রীকে জিজ্ঞাসা করিল, "তোম্ কোন্ হো? বোল্‌কে ঘর যাও। হম্‌লোগোঁকো হুকুম নেহি হৈ কে আবরৎকে পকড়েঁ। স্রেফ্ এক বেওয়াকো হম্‌লোগ্ ঢুণ্ড্‌তে হেঁ।"

শ্রী। যে ঐ গাছের উপর দাঁড়াইয়া তোমাদের দুর্দ্দশা করিয়াছিল?

সিপাহী। হাঁ—হাঁ—চন্দী বক্‌সী নাম হৈ।

শ্রী। চণ্ডী নাম নয়। চণ্ডী নাম হউক—আর যাই নাম হউক—আমিই সেই হতভাগিনী।

সিপাহী। (শিহরিয়া) কিয়া!!!

শ্রী। আমিই সেই হতভাগিনী।

সি। তোবা!! বেসা মৎ বোলো মায়ি! তোম্ ঘর্ যাও।

শ্রী। তোমার কল্যাণ হউক—আমি ঘরে চলিলাম।

এমন সময়ে, আর একজন সিপাহী সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। বলিল, "আরে আবরৎকো পকড়্‌তে হো কাহে?"

প্রথম সিপাহী দেখিল বিপদ্। যদি দ্বিতীয় সিপাহীর সঙ্গে স্ত্রীলোকটার কথাবার্ত্তা হয়, আর স্ত্রীলোকও যদি স্বীকার করে, তবে সিপাহী বিপন্ন হইবার সম্ভাবনা—প্রধান বিদ্রোহিণীকে ছাড়িয়া দেওয়ার অভিযোগ তাহার নামে হওয়া বিচিত্র নহে। অতএব সেই দয়ার্দ্র সিপাহী অগত্যা বলিল, "যেস্কি তোম ঢুণ্ড্‌তে সো যেহি হোতী হৈ।"

* হিন্দিতে স্থানবিশেষে [ব] y মত ও ব w মত উচ্চারিত হইবে।

দ্বিতীয় সিপাহী। আল্লা আক্‌বর! চলো, চলো, বস্‌কী হুজুরমে লে চলো—হম্‌ দোনোকে বখ্‌সিস্‌ মিল যায়েগা।

প্রথম সিপাহী। ভাই! তোম্‌ লে যাও! হমারা কুছ কাম হৈ।

দ্বিতীয় সিপাহী এ কথা শুনিয়া বড় আনন্দিত হইল—শ্রীর ঘাড়ে ধাক্কা দিয়া লইয়া চলিল। প্রথম সিপাহী বড় বিষণ্ণ বদনে দাঁড়াইয়া রহিল। দুই জনের নাম দুইটা বলা যাক—প্রথমের নাম, খয়ের আলি—দ্বিতীয়, পীর বক্‌স।

সিপাহীর কাছে ঘাড়-ধাক্কা খাইয়া শ্রী মৃদু হাসিল। তখন সে ডাকিয়া, চন্দ্রচূড়কে বলিল, "ঠাকুর! যদি আমার স্বামীকে চেনেন, তবে বলিবেন, আমার উদ্ধার তাঁহার কাজ।"

শুনিয়া চন্দ্রচূড়ের চক্ষে দর দর ধারা পড়িতে লাগিল। চন্দ্রচূড় কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "মা, তুমিই ধন্যা।"

নবম পরিচ্ছেদ

সিপাহীরা পালে পালে বিদ্রোহী ধরিয়া আনিতে লাগিল। যাহারা লাঠি চালাইয়াছিল, তাহারা নির্ব্বিঘ্নে স্বস্থানে অবস্থানপূর্ব্বক তামাসা দেখিতে লাগিল। যাহারা ধৃত হইল, তাহারা প্রায় নির্দ্দোষী। লোক ধরিয়া আনিতে হইবে, কাজেই সিপাহীরা যাহাকে পাইল, তাহাকে ধরিয়া আনিল। দোষীরা সাবধান ছিল, তাহাদিগকে পাওয়া গেল না। নির্দ্দোষীরা সতর্ক থাকা আবশ্যক বিবেচনা করে নাই—তাহারা ধৃত হইতে লাগিল। কেহ হাঁ করিয়া সিপাহী দেখিতেছিল, অতি সাহসী বলিয়া সে ধৃত হইল। কেহ সিপাহী দেখিয়া ভয়ে পলাইল, যে পলায়, সে দোষী বলিয়া ধৃত হইল। কেহ সিপাহীর প্রশ্নে চোট পাট উত্তর দিল; সে চতুর, কাজেই, "বদ্‌মাষ" বলিয়া ধৃত হইল। কেহ কোন উত্তর দিতে পারিল না,—অপরাধীই নিরুত্তর হয়, এই বলিয়া সেও ধৃত হইল। কেহ দুর্ব্বল, তাহাকে ধৃত করার কোন কষ্ট নাই, সিপাহীরা অনুগ্রহ করিয়া তাহাকে ধৃত করিলেন; কেহ বলবান্‌, কাজেই দাঙ্গাবাজ, সেও ধৃত হইল। কেহ দরিদ্র, দরিদ্রেরাই বদমাষ হইয়া থাকে, এজন্য সে ধৃত হইল; কেহ ধনী, ধনীরা টাকা দিয়া লোক নিযুক্ত করিয়া এই দাঙ্গা উপস্থিত করিয়াছে সন্দেহ নাই, তাহারাও ধৃত হইল। এইরূপে অনেক লোকে ধৃত হইল। এক জন মাত্র স্ত্রীলোককে ধরিবার আদেশ ছিল—যে গাছে চড়িয়া "মার! মার!" শব্দে হুকুম দিয়াছিল, তাহাকে। একের স্থানে শত জনে শত জন স্ত্রীলোককে ধরিয়া আনিল। কেহ শুনিয়াছিল সে বিধবা, অতএব সে বিধবা দেখিয়াই ধরিল, কেহ শুনিয়াছিল সে সুন্দরী, সে সুন্দরী দেখিয়াই ধৃত করিল। কেহ শুনিয়াছিল, সে যুবতী; এজন্য অনেক যুবতী এককালে বন্ধন ও পূজা প্রাপ্ত হইল। কেহ কেহ শুনিয়াছিল যে, বৃক্ষবিহারিণী মুক্তকুন্তলা ছিল; অতএব স্ত্রীলোকের এলোচুল দেখিলেই তাহাদের হুজুরে আনিয়া সিপাহীরা হাজির করিতে লাগিল।

এইরূপে ফৌজদারী কারাগার স্ত্রীপুরুষে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল— আর ধরে না। তখন সে দিনের মত কারাগার বন্ধ হইল। সে দিন কয়েদীরা বদ্ধ রহিল—তাহাদের নিস্‌বতে পর দিন যাহা হয় হুকুম হইবে। সীতারামও এই সঙ্গে আবদ্ধ রাহলেন।

সীতারামকে অনেকেই চিনিত। ইচ্ছা করিলে তিনি ফৌজদারের সঙ্গে সাক্ষাতের উপায় করিতে পারিতেন, অথবা যাহাতে সামান্য ব্যক্তিদের সঙ্গে একত্রে গাদাগাদি করিয়া থাকিতে না হয়, সে বন্দোবস্ত করিয়া লইতে পারিতেন। তিনি সে চেষ্টা কিছুই করিলেন না। তাঁহাকে চিনে, এমন লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে, ইঙ্গিতে তাঁহাকে চিনিতে নিষেধ করিলেন। তিনি মনে মনে এই ভাবিতেছিলেন, "আমি যদি ইহাদিগকে ছাড়িয়া যাই, তবে ইহাদিগের মুক্তির কোন উপায় হইবে না।"

রাত্রি উপস্থিত। কারাগারের একটি মাত্র দ্বার, প্রহরীরা সেই দ্বার বাহির হইতে রুদ্ধ করিয়া প্রহরায় নিযুক্ত রহিল।

কেহ কিছু খাইতে পায় নাই। সন্ধ্যার পর যে যেখানে পাইল, কাপড় পাতিয়া শুইতে লাগিল। সীতারাম তখন সকলের কাছে কাছে গিয়া বলিতে লাগিলেন, "তোমরা কেহ ঘুমাইও না, ঘুমাইলে রক্ষা নাই।"

সকলে সভয়ে শুনিল। কথাটা কেহ বুঝিতে পারিল না। কাহারও কিছু জিজ্ঞাসা করিতে সাহস হইল না। কিন্তু কেহ ঘুমাইল না। পেটে ক্ষুধা—মনে ভয়; নিদ্রার সম্ভাবনা বড় অল্প। একবার প্রহর বাজিয়া গেল—ঝিঝিট-খাম্বাজে নবতওয়ালা একটু মধুরালাপ করিয়া, আহারাদির অন্বেষণে নবতখানা হইতে নামিল। তখন সীতারাম এক স্থানে, কতকগুলি কয়েদীর খেদোক্তি শুনিতেছিলেন। তাহাদের কথা সমাপ্ত হইলে সীতারাম বলিলেন, "ভাই, অত কাঁদা কাটার দরকার কি? আমরা মনে করিলেই ত বাহির হইয়া যাইতে পারি।"

এক জন বলিল, "কেমন করিয়া যাইব?"

সীতারাম বলিলেন, "কেন? দ্বার ভাঙ্গিব।"

আর ব্যক্তি বলিল, "তুমি কি পাগল?"

সীতারাম বলিলেন, "কেন বাপু! এখানে আমরা কত লোক আছি মনে কর?"

একজন বলিল, "তা জন শ পাঁচ ছয় হইবে। তাতে কি হলো?"

সীতারাম বলিলেন, "পাঁচ শ লোকে একটা দরওয়াজা ভাঙ্গিতে পারি না?"

সকলে হাসিতে লাগিল। একজন বলিল, "দরওয়াজা যে লোহার?"

সীতা। মানুষ কি মিছরির? না কাদার?

আর এক জন বলিল, "লোহার কপাট কি হাত দিয়া ভাঙ্গিব? না দাঁত দিয়া কাটিব? না নখ দিয়া ছিঁড়িব?"

সকলে হাসিল।

সীতারাম বলিলেন, "কেন, পাঁচ শ লোকের লাথিতে এক জোড়া কপাট কি ভাঙ্গে না? হোক না কেন লোহা—এক হয়ে কাজ করিলে, লোহার কথা দূরে থাক, পাহাড়ও ভাঙ্গা যায়, সমুদ্রও বাঁধা যায়। কাঠবিড়ালীতে সমুদ্র বাঁধার কথা শুন নাই?"

তখন এক জন বলিল, "লোকটা বলিতেছে মন্দ নয়। তা ভাই, না হয় যেন লোহার কপাটও ভাঙ্গিলাম—বাহিরে যে সিপাহী?"

সীতারাম। তাহারা কয় জন?

সে ব্যক্তি বলিল, "দুই জন চারি জন থাকিতে পারে।"

সীতারাম। এই পাঁচ শ লোকে আর দুই চারি জন সিপাহী মারিতে পারিব না?

অপর এক জন কহিলেন, "তাদের যে হাতিয়ার আছে? আমরা আঁচড়ে কামড়ে কি করিব?"

সীতারাম বলিলেন, "তখন আমি তোমাদিগকে হাতিয়ার দিব।"

"তুমি হাতিয়ার কোথা পাইবে?"

"আমি সীতারাম রায়।"

শুনিয়া, যাহারা সীতারামের সঙ্গে তর্ক বিতর্ক করিতেছিল, তাহারা একটু কুণ্ঠিত হইয়া সরিয়া বসিল। এক জন বলিল, "বুঝিলাম, আমাদের উদ্ধারের জন্যই আপনি ইহার ভিতর প্রবেশ করিয়াছেন। আপনি যাহা বলিবেন, আমি তাহাই করিব।"

যে কয় জনের সঙ্গে সীতারাম কথোপকথন করিতেছিলেন, সকলেরই এই মত হইল। সীতারাম তখন আর এক স্থানে গিয়া বসিলেন, সেই রকম করিয়া তাহাদের সঙ্গে কথা কহিলেন, সেই রকম করিয়া তাহাদিগকে বশীভূত করিলেন; তাহারাও যথাসাধ্য সাহায্যে উদ্যত, এবং উত্তেজিত হইল। এইরূপে সীতারাম ক্রমে ক্রমে, অসাধারণ বুদ্ধি, অসাধারণ কৌশল, অসাধারণ বাগ্মিতার গুণে সেই বহুসংখ্যক বন্দি-বৃন্দকে একমত, উৎসাহিত এবং প্রাণপাতে পর্য্যন্ত সম্মত করিলেন।

তখন সীতারাম সেই সমস্ত বন্দিবর্গকে দাঁড়াইতে বলিলেন। তাহারা দাঁড়াইল। তখন সীতারাম তাহাদিগকে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া সাজাইতে লাগিলেন। দ্বারের সম্মুখে প্রথম সারি, তার পর আর এক সারি—এইরূপ বরাবর। প্রতি শ্রেণীমধ্যস্থ ব্যক্তিদিগকে তিন তিন জন করিয়া আবার বিভাগ করিলেন। আবার সেই তিন জনকে এমত করিয়া দাঁড় করাইলেন যে, দুই জনের মধ্য দিয়া এক জন মনুষ্য যাইতে পারে—তাহাতে এইরূপ ফল দাঁড়াইল যে, অনায়াসে পলক মধ্যে কোন তিন ব্যক্তির পিছনের সারি হইতে তিন জন আগু হইয়া পলক মধ্যে তাহাদের স্থান লইতে পারে—ঠেলাঠেলি হয় না।

এই সকল বন্দোবস্ত করিতে করিতে আবার প্রহর বাজিল। "দগড়া নগড়া গড়াগড়ি" বলিয়া দামামা কি বলিতে লাগিল। তার সঙ্গে মধুর বেহাগ রাগিণী যামিনীকে গভীরা, মূর্ত্তিমতী, ভয়ঙ্করী করিয়া তুলিল। তখন সীতারাম বুঝিলেন, উত্তম সময়, পাহারার সিপাহী ভিন্ন অন্য সিপাহী সকল ঘুমাইয়াছে—কর্ত্তৃপক্ষেরা নিদ্রিত। তখন সীতারাম দ্বারের সমীপস্থ তিন জনকে বলিলেন, "তোমরা তিন জন প্রথমে দ্বারে লাথি মার। গায়ে যত জোর আছে, তত জোরে তিন বার মাত্র লাথি মারিবে। তার পর পিছে সরিয়া দাঁড়াইবে। কিন্তু দেখিও, তিনখানা পা, যেন একেবারেই কপাটের উপর পড়ে; অগ্রপশ্চাৎ হইলে সকল বৃথা। একেবারে তিন জন লাথি মারিবার স্থান এ কপাটে আছে—তাই মাপ করিয়া তিন তিন জন করিয়া সাজাইয়াছি। মুখে বলিও—লছমী-নারায়েণকি জয়!"

বন্দীরা বুঝিল। "লছমী-নারায়েণকি জয়!" বলিয়া, তিন জনে ঠিক এক তালে, প্রাণপণ শক্তিতে, সেই লোহার কপাটে পদাঘাত করিল।

বাহিরে চারি জন সিপাহী পাহারায় ঢুলিতেছিল, বজ্রের মত শব্দ সহসা তাহাদের কর্ণে প্রবেশ করাতে তাহারা চমকিয়া উঠিল। কোথায় কিসের শব্দ তাহা বুঝিতে না পারিয়া, এদিক্ ওদিক্ চাহিতে লাগিল।

এ দিকে প্রথম তিন জন সরিয়া পিছনে গিয়াছে; আর তিন জন আসিয়া পলক মধ্যে তাহাদের

স্থান লইয়া সেই এক তালে তিন বার কপাটে পদাঘাত করিল। লোহার কপাটের তাহাতে কি হইবে? কিন্তু বড় ঝঞ্ঝনা বাজিতে লাগিল। এক জন সিপাহী বলিল, "কিয়া রে?"

কিন্তু ভিতর হইতে "লছমী-নারায়েণকি জয়!" ভিন্ন অন্য কোন উত্তর হইল না। দ্বিতীয় সিপাহী বলিল, "শালা লোগ কেওয়াড়ি তোড়নে মাঙ্‌তা হৈ।"

তৃতীয় সিপাহী। আরে তোড়্‌নে দেও। বাঙ্গালী লোহেকি কেওয়াড়ি তোড়েগা!

চতুর্থ সিপাহী। কেওয়াড়ি খোলকে দো চার থাপ্পড় লাগা দেঙ্গে?

প্রথম সিপাহী। আরে যানে দেও। আপহিসে বহু লোগ ঠণ্ডা হো যায়েগা।

এ সকল কথা বন্দীরাও বড় শুনিতে পাইল না। কেন না, এখন, বড় ঝড়ের সময়ে যেমন বজ্রাঘাত থামে না, তাহার যেমন উপর্য্যুপরি শব্দ থামে না, সেইরূপ শব্দে এখন লোহার কপাটের উপর পদাঘাত বৃষ্টি হইতেছিল—আর কিছুই শোনা যায় না। কয়েদীরা মাতিয়া উঠিয়াছিল—কিন্তু সীতারাম তাহাদিগকে ধৈর্য্যবিশিষ্ট করিয়া, যাহার যে নির্দ্দিষ্ট স্থান, তাহাকে সেইখানে স্থির রাখিতে লাগিলেন। ফাটকের ভিতর কিছুমাত্র গোলযোগ বা বিশৃঙ্খলা ছিল না।

সিপাহীরা প্রথমে রঙ্গ দেখিতেছিল। মনে করিতেছিল যে, কয়েদীরা কৌতুক করিতেছে, এখনই নিবৃত্ত হইবে। ক্রমে দেখিল যে, সে গতিক নহে—ক্রমে কয়েদীদিগের বল বাড়িতে লাগিল। তখন তাহারা কয়েদীদিগকে শাসিত করা নিতান্তই প্রয়োজন বোধ করিল। তিন জনে পরামর্শ এই করিল যে, তাহারা কপাট খুলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়া, কয়েদীদিগকে ভাল রকম প্রহার করিয়া নিরস্ত করিবে।

তিন জনের মত হইল, কিন্তু এক জনের হইল না। আলিয়ার খাঁ সকলের প্রাচীন—দাড়ি একেবারে শণের মত। সে বলিল, "বাবা! যদি সত্য সত্যই কয়েদী ক্ষেপিয়া থাকে, তবে আমরা চারি জনে কি তাহাদের থামাইতে পারিব? বরং দ্বার খোলা পাইলে, তাহারা আমাদের চারি জনকে পিষিয়া ফেলিয়া পিল পিল করিয়া পলাইয়া যাইবে। তখন আমরা কি করিব? বরং জমাদ্দারকে খবর দেওয়া যাক্‌।"

দ্বিতীয় সিপাহী। কেন জমাদ্দারকে খবর দিবারই তবে প্রয়োজন কি? সত্য সত্য উহারা কপাট ভাঙ্গিতে পারিবে, সে শঙ্কা ত আর করিতেছি না। তবে বড় দিক করিতেছে—তার জন্য জমাদ্দারকে দিক করিয়া কি হইবে? আজ থাক, কাল প্রাতে উহাদিগের উচিত সাজা হইবে।

কিছুক্ষণ সিপাহীরা এই মতাবলম্বী হইয়া নিরস্ত হইল। কয়েদীদিগের দ্বার ভঙ্গের উদ্যম দেখিয়া নানাবিধ হাস্য পরিহাস করিতে লাগিল। বলিতে লাগিল, "বাঙ্গালী লোহার কপাট ভাঙ্গিবে, আর বানরে সঙ্গীত গায়িবে, সমান কথা।"

লোহা সহজে ভাঙ্গে না বটে, কিন্তু দেয়াল ফাটিতে পারে। লোহার চৌকাট দেয়ালের ভিতর গাঁথা ছিল। দুই চারি দণ্ড পরে আলিয়ার খাঁ জ্যোৎস্নার আলোকে সভয়ে দেখিল, অবিরত সবল পদাঘাতের তাড়নে দেয়াল ফাটিয়া উঠিয়াছে। তখন সে বলিল, "আর দেখ কি? জমাদ্দারজিকে সম্বাদ দাও। এইবার কপাট পড়িবে।"

এক জন সিপাহী জমাদ্দারকে খবর দিতে শীঘ্র গেল। আর তিন জন হাঁ করিয়া কপাট পানে চাহিয়া রহিল।

দেখিল, ক্রমে দেয়াল বেশী বেশী ফাটিতে লাগিল। তার পর, দেয়ালটা কাঁপিয়া উঠিল—ভিতরে

চৌকাট ঢক্ ঢক্ করিয়া নড়িতে লাগিল—ঝন্ ঝন্ শব্দ বড় বাড়িয়া উঠিল। লাথির জোর আরও বাড়িতে লাগিল—বজ্রাঘাতের উপর বজ্রাঘাতের মত শব্দ হইতে লাগিল—শেষ, চতুর্দ্দিক্ প্রতিধ্বনিত করিয়া সেই লোহার কপাট, চৌকাট সমেত, দেয়াল ভাঙ্গিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল। লক্ষ্মীনারায়ণ জিউর জয় শব্দে গগন বিদীর্ণ হইল।

নির্ব্বোধ হিন্দুস্থানীরা, হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়া দেখিতেছিল, সরিয়া দাঁড়াইতে ভুলিয়া গিয়াছিল। যখন কপাট পড়িতেছে দেখিল, তখন দৌড়াইয়া পলাইতে লাগিল। দুই জন বাঁচিল, কিন্তু এক জনের পায়ের উপর কপাট পড়ায় সে ভগ্নপদ হইয়া ভূতলে পড়িয়া গেল। এ দিকে কপাট পড়িবামাত্র ভিতর হইতে, বাঁধ ভাঙ্গিলে জলপ্রবাহের মত বন্দি-স্রোত পতিত কপাটের উপর দিয়া হরিধ্বনি করিতে করিতে পতিত প্রহরীকে পদতলে পিষিয়া, গভীর গর্জ্জনে ছুটিল। সর্ব্বাগ্রে সীতারাম বাহির হইয়া আহত প্রহরীর ঢাল সড়কী তরবারি কাড়িয়া লইয়া আর দুই জনকে যমদূতের ন্যায় আক্রমণ করিলেন। তাঁহার তখনকার ভীষণ মূর্ত্তি দেখিয়া ও তাঁহার দারুণ প্রহারে আহত হইয়া প্রহরিদ্বয় ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল। জমাদ্দার সাহেব তখনও আসিয়া পৌছেন নাই।

বন্দিগণ হরিধ্বনি করিতে করিতে ছুটিতে লাগিল—সীতারাম অসি হস্তে স্থির হইয়া এক স্থানে দাঁড়াইয়া তাহাদিগের পৃষ্ঠ রক্ষা করিতে লাগিলেন। সকলেই বাহির হইয়া গেলে, সীতারাম আবার একবার কারাগারের ভিতর প্রবেশ করিলেন। তাঁহার স্মরণ হইল যে, এক কোণে এক জন বন্দীকে মুড়ি দিয়া পড়িয়া থাকিতে দেখিয়াছিলেন। সে একবারও উঠে নাই বা কোন সাড়া দেয় নাই। সীতারাম মনে করিয়াছিলেন, সে পীড়িত। এখন তাঁহার মনে হইল, সে হয় ত বিনা সাহায্যে উঠিতে পারে নাই বা বাহির হইতে পারে নাই। সে বাহির হইয়াছে কি না, দেখিবার জন্য সীতারাম কারাগৃহ মধ্যে পুনঃপ্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, সে তেমনি ভাবে সেই কোণে সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিয়া শুইয়া আছে।

সীতারাম ডাকিয়া বলিলেন, "ওগো! সবাই বাহির হইল, তুমি শুইয়া কেন?"

যে শুইয়াছিল, সে বলিল, "কি করিব?"

এ ত স্ত্রীলোকের গলা। চেনা গলা বলিয়াই সীতারামের বোধ হইল। তিনি আগ্রহ সহকারে জিজ্ঞাসা কারলেন, "তুমি কে গা?"

সে বলিল, "আমি শ্রী।"

পৃ. ৪৪, পংক্তি ১৭, "সীতারাম…যাইবে?" এই পংক্তিটির পরিবর্ত্তে ছিল—

সীতারাম বলিলেন, "শ্রী—তুমি এখানে কেন?"

শ্রী। সিপাইতে ধরিয়া আনিয়াছে।

সীতা। হাঙ্গামায় ছিলে বলিয়া? তা, ইহাদের বোধ সোধ নাই। অত্যাচার বেশী হইতেছে। যাই হউক, এখন ভগবানের কৃপায় আমরা মুক্ত হইয়াছি। এখন তুমি এখানে পড়িয়া কেন? আপনার স্থানে যাও।

পৃ. ৪৪, পংক্তি ২০, "সেখানে কে আছে?" এই কথা কয়টির পর ছিল—

আমার উপর এখন দৌরাত্ম্য

পৃ. ৪৪, পংক্তি ২৩, "মাঠ" কথাটির স্থলে "কারাগার" ছিল।

পৃ. ৪৫, পংক্তি ১৬, "আমি তোমার বিবাহিতা স্ত্রী," এই কথা কয়টির পর ছিল—
তোমার স্নেহের অধিকারিণী, আমি

পৃ. ৪৫, পংক্তি ২০-২১, "তোমার আর দুই স্ত্রী আছে, কিন্তু" এই কথাটির পরিবর্ত্তে ছিল—

নন্দা তোমার দ্বিতীয়া স্ত্রী,

পৃ. ৪৬, পংক্তি ৬, এই "সপ্তম" পরিচ্ছেদটি প্রথম সংস্করণের "একাদশ" পরিচ্ছেদ।

পংক্তি ৭-৮, "পলায়নের…হইয়াছে। সীতারাম" এই অংশটি ছিল না।

পৃ. ৪৭, পংক্তি ২১, "শ্রী আবার দাঁড়াইয়া উঠিল। বলিল," এই কথা কয়টির পর ছিল—

"এই আধখানা মোহর তুমি আমাকে পাঠাইয়া দিয়াছিলে—বিপদে পড়িলে নিদর্শন স্বরূপ তোমাকে ইহা দেখাইতে বলিয়া দিয়াছিলে। সে দিন ইহাই তোমাকে দেখাইয়া ভাইয়ের প্রাণ ভিক্ষা পাইয়াছি।

পৃ. ৪৭, পংক্তি ২২, "ইহা তোমার অশেষ গুণ।" এই কথা কয়টির পর ছিল—
কিন্তু আর কখন ইহাতে আমার প্রয়োজন হইবে না।

পৃ. ৪৭, পংক্তি ২৭, "ফিরিয়া না চাহিয়া," এই কথা কয়টির পরিবর্ত্তে ছিল—
সেই সুবর্ণার্দ্ধ নদীসৈকতে নিক্ষিপ্ত করিয়া

পৃ. ৪৮, পংক্তি ১, এই "অষ্টম" পরিচ্ছেদটি প্রথম সংস্করণের "দ্বাদশ" পরিচ্ছেদ।

পংক্তি ৪-৯, "তার পর সীতারাম…ভাসিয়া গেল।" এই অংশটি ছিল না।

পংক্তি ৯, এই পংক্তির শেষে ছিল—

একবার সে বড় দুঃখে পড়িয়াছে, লোকমুখে শুনিয়া সীতারাম তাহাকে কিছু অর্থ পাঠাইয়া দিলেন—আর চিহ্নিত করিয়া আধখানা মোহর পাঠাইয়া দিয়াছিলেন যে, "তোমার যখন কিছুর প্রয়োজন হইবে, এই আধখানা মোহর সঙ্গে দিয়া এক জন লোক আমার কাছে পাঠাইয়া দিও। সে যা চাবে, আমি তাই দিব।" শ্রী সে আধখানা মোহর কখনও কাজে লাগায় নাই—কখনও লোক পাঠায় নাই। কেবল ভাইয়ের প্রাণ রক্ষার্থ সে রাত্রে মোহর লইয়া আসিয়াছিল।

পৃ. ৪৮, পংক্তি ২৮, "পাপাচরণ করিতেছি।" এই কথা কয়টির পর ছিল—
পরশুরামের কুঠার তাঁহার মনে পড়িয়াছিল।

পৃ. ৪৯, পংক্তি ২১, "জাগরূক হইতে লাগিল।" এই কথা কয়টির পর ছিল—
যিনি সাম্রাজ্য সংস্থাপনের উচ্চ আশাকে মনে স্থান দিয়াছেন, তাঁহার উপযুক্ত মাহষী কই। নন্দা কি রমা কি সিংহাসনের যোগ্যা? না

পৃ. ৪৯, পংক্তি ২২, "রণজয় করিয়াছিল," এই কথা কয়টির পর ছিল—
সেই সে সিংহাসনের যোগ্যা?
এবং ইহার পরেই "যদি" কথাটির পর "সেই" কথাটি ছিল না।

পৃ. ৪৯, পংক্তি ২৮, "আমি কি জানি।" এই কথা কয়টির পর ছিল—
আপনি ত তাহাকে চন্দ্রচূড় ঠাকুরের জিম্মা করিয়া দিয়াছিলেন।

পৃ. ৪৯, পংক্তি ২৯, "সে এখানে আসে নাই ?" এই কথা কয়টির স্থলে ছিল—
সে ঠাকুরের সঙ্গ ছাড়া হইয়াছে। এখানে আসে নাই ?

পৃ. ৫০, পংক্তি ৭, এই "নবম" পরিচ্ছেদটি প্রথম সংস্করণের "চতুর্দ্দশ" পরিচ্ছেদ। এই পরিচ্ছেদের পূর্ব্বে প্রথম সংস্করণে আর একটি পরিচ্ছেদ ছিল। এই স্থলে তাহা মুদ্রিত হইল।—

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

শ্যামপুরে সীতারাম একটু স্থির হইলে, লক্ষ্মীনারায়ণ জিউর দর্শনে সস্ত্রীক হইয়া চলিলেন।

লক্ষ্মীনারায়ণ জিউর মন্দির নিকটস্থ এক জঙ্গলে ভূমিমধ্যে প্রোথিত ছিল। সীতারামের আজ্ঞাক্রমে ভূমি খননপূর্ব্বক, তাহার পুনর্বিকাশ সম্পন্ন হইয়াছিল। তন্মধ্যে প্রাচীন দেবদেবীমূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছিল। অদ্য প্রথম সীতারাম তদ্দর্শনে চলিলেন। সঙ্গে শিবিকারোহণে নন্দা ও রমা চলিলেন।

যে জঙ্গলের ভিতর মন্দির, তাহার সীমাদেশে উপস্থিত হইয়া তিন জনেই শিবিকা হইতে অবতরণ করিলেন, এবং এক জন মাত্র পথপ্রদর্শক সঙ্গে লইয়া তিন জনে জঙ্গলমধ্যে পদব্রজে প্রবেশ করিলেন। কাননের অপূর্ব্ব শোভা নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহাদিগের চিত্ত প্রফুল্ল হইল। অতিশয় শ্যামলোজ্জ্বল পত্র-রাশিমধ্যে স্তবকে স্তবকে পুষ্প সকল প্রস্ফুটিত হইয়া রহিয়াছে। শ্বেত হরিৎ কপিল পিঙ্গল রক্ত নীল প্রভৃতি নানা বর্ণের ফুল স্তরে স্তরে ফুটিয়া গন্ধে চারি দিক্ আমোদিত করিতেছে। তন্মধ্যে নানা বর্ণের পাখী সকল বসিয়া নানা স্বরে কূজন করিতেছে। পথ অতি সঙ্কীর্ণ। গাছের ডালপালা ঠেলিতে হয়, কখন কাঁটায় নন্দা রমার আঁচল বাঁধিয়া যায়, কখন ফুলের গোছা তাহাদিগের মুখে ঠেকে, কখন ডাল নাড়া পেয়ে ভোমরা ডাল ছেড়ে তাদের মুখের কাছে উড়িয়া বেড়ায়, কখন তাহাদের মলের শব্দে ত্রস্তা হইয়া চকিতা হরিণী শয়ন ত্যাগ করিয়া বেগে পলায়ন করে। পাতা খসিয়া পড়ে, ফুল ঝরিয়া যায়, পাখী উড়িয়া যায়, খরা দৌড়িয়া যায়। যথাকালে তাঁহারা মন্দিরসমীপে উপস্থিত হইলেন। তখন তাঁহারা পথপ্রদর্শককে বিদায় দিলেন।

দেখিলেন, মন্দির ভূগর্ভস্থ, বাহির হইতে কেবল চূড়া দেখা যায়। সীতারামের আজ্ঞাক্রমে মন্দির-দ্বারে অবতরণ করিবার সোপান প্রস্তুত হইয়াছিল; এবং অন্ধকার নিবারণের জন্য দীপ জ্বলিতেছিল। তাহাও সীতারামের আজ্ঞাক্রমে হইয়াছিল। কিন্তু সীতারামের আজ্ঞাক্রমে সেখানে ভৃত্যবর্গ কেহই ছিল না; কেন না, তিনি নির্জ্জনে ভার্য্যাদ্বয়সমভিব্যাহারে দেব দর্শনের ইচ্ছা করিয়াছিলেন।

সোপান সাহায্যে তাঁহারা তিন জনে মন্দিরদ্বারে অবতরণ করিলে পর, সীতারাম সবিস্ময়ে দেখিলেন যে, মন্দিরদ্বারে দেবমূর্ত্তিসমীপে এক জন মুসলমান বসিয়া আছে। বিস্মিত হইয়া সীতারাম জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে বাবা তুমি ?"

মুসলমান বলিল, "আমি ফকির।"

সীতারাম। মুসলমান?

ফকির। মুসলমান বটে।

সীতা। আ সর্ব্বনাশ!

ফকির। তুমি এত বড় জমীদার, হঠাৎ তোমার সর্ব্বনাশ কিসে হইল?

সীতা। ঠাকুরের মন্দিরের ভিতর মুসলমান!

ফকির। দোষ কি বাবা! ঠাকুর কি তাতে অপবিত্র হইল?

সীতা। হইল বৈ কি। তোমার এমন দুর্ব্বুদ্ধি কেন হইল?

ফকির। তোমাদের এ ঠাকুর, কি ঠাকুর? ইনি করেন কি?

সীতা। ইনি নারায়ণ, জগতের সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কর্ত্তা!

ফকির। তোমাকে কে সৃষ্টি করিয়াছেন?

সীতা। ইনিই।

ফকির। আমাকে কে সৃষ্টি করিয়াছেন?

সীতা। ইনিই—যিনি জগদীশ্বর, তিনি সকলকেই সৃষ্টি করিয়াছেন!

ফকির। মুসলমানকে সৃষ্টি করিয়া ইনি অপবিত্র হন নাই—কেবল মুসলমান ইঁহার মন্দিরদ্বারে বসিলেই ইনি অপবিত্র হইবেন? এই বুদ্ধিতে বাবা তুমি হিন্দুরাজ্য স্থাপন করিতে আসিয়াছ? আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। ইনি থাকেন কোথা? এই মন্দিরের ভিতর থাকিয়াই কি ইনি সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করেন? না, আর থাকিবার স্থান আছে?

সীতা। ইনি সর্ব্বব্যাপী; সর্ব্বঘটে সর্ব্বভূতে আছেন।

ফকির। তবে আমাতে ইনি আছেন?

সীতা। অবশ্য—তোমরা মান না কেন?

ফকির। বাবা! ইনি আমাতে অহরহ আছেন, তাহাতে ইনি অপবিত্র হইলেন না—আমি উঁহার মন্দিরের দ্বারে বসিলাম, ইহাতেই ইনি অপবিত্র হইলেন?

একটি স্মৃতিব্যবসায়ী অধ্যাপক ব্রাহ্মণ থাকিলে ইহার যথাশাস্ত্র একটা উত্তর দিতে পারিত—কিন্তু সীতারাম স্মৃতিব্যবসায়ী অধ্যাপক নহেন, কথাটার কিছু উত্তর দিতে না পারিয়া অপ্রতিভ হইলেন। কেবল বলিলেন, "এইরূপ আমাদের দেশাচার।"

ফকির বলিল, "বাবা! শুনিতে পাই, তুমি হিন্দুরাজ্য স্থাপন করিতে আসিয়াছ, কিন্তু অত দেশাচারের বশীভূত হইলে, তোমার হিন্দুরাজ্য সংস্থাপন করা হইবে না। তুমি যদি হিন্দু মুসলমান সমান না দেখ, তবে এই হিন্দু মুসলমানের দেশে তুমি রাজ্য রক্ষা করিতে পারিবে না। তোমার রাজ্যও ধর্ম্মরাজ্য না হইয়া পাপের রাজ্য হইবে। সেই এক জনই হিন্দু মুসলমানকে সৃষ্টি করিয়াছেন; যাহাকে হিন্দু করিয়াছেন, তিনিই করিয়াছেন, যাহাকে মুসলমান করিয়াছেন, সেও তিনিই করিয়াছেন। উভয়েই তাঁহার সন্তান; উভয়েই তোমার প্রজা হইবে। অতএব দেশাচারের বশীভূত হইয়া প্রভেদ করিও না। প্রজায় প্রজায় প্রভেদ পাপ। পাপের রাজ্য থাকে না।

সীতা। মুসলমান রাজা প্রভেদ করিতেছে না কি?

ফকির। করিতেছে। তাই মুসলমান রাজ্য ছারখারে যাইতেছে। সেই পাপে মুসলমান রাজ্য যাইবে; তুমি রাজ্য লইতে পার ভালই, নহিলে অন্যে লইবে। আর যখন তুমি বলিতেছ, ঈশ্বর হিন্দুতেও আছেন, মুসলমানেও আছেন, তখন তুমি কেন প্রভেদ করিবে? আমি মুসলমান হইয়াও হিন্দু মুসলমানে কোন প্রভেদ করি না। এক্ষণে তোমরা দেবতার পূজা কর, আমি অন্তরে যাইতেছি। যদি ইচ্ছা থাকে বল, যাইবার সময়ে আবার আসিয়া তোমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়া যাইব।

সীতা। দেখিতেছি, আপনি বিজ্ঞ। অবশ্য আসিবেন।

ফকির তখন চলিয়া গেল। সীতারামের দর্শন ও পূজা ইত্যাদি সমাপন হইলে, সে আবার ফিরিয়া আসিল। সীতারাম তাহার সঙ্গে অনেক কথাবার্ত্তা কহিলেন। সীতারাম দেখিলেন, সে ব্যক্ত জ্ঞানী। ফারসী আরবী উত্তম জানে, তাহার উপর সংস্কৃতও উত্তম জানে, এবং হিন্দুধর্ম্মবিষয়ক অনেকগুলি গ্রন্থও পড়িয়াছে। দেখিলেন যে, যদিও তাহার বয়স এমন বেশী নয়, তথাপি সংসারে সে মমতাশূন্য বৈরাগী এবং সর্ব্বত্র সমদর্শী। তাহার এবম্বিধ চরিত্র দেখিয়া নন্দা রমাও লজ্জা ত্যাগ করিয়া, একটু দূরে বসিয়া তাহার জ্ঞানগর্ভ কথা সকল শুনিতে লাগিলেন।

বিদায়কালে সীতারাম বলিলেন, "আপনি যে সকল উপদেশ দিলেন, তাহা অতি ন্যায্য। আমরা সাধ্যানুসারে তাহা পালন করিব। কিন্তু আমার ইচ্ছা যে, আমার নূতন রাজধানীতে আপনি বাস করেন। আমি এ উপদেশের বিপরীতাচরণ করিলে, আপনি নিকটে থাকিলে আমাকে সে সকল কথা আবার মনে করিয়া দিতে পারিবেন। আপনার ন্যায় জ্ঞানী ব্যক্তি আমার নিকট থাকিলে, আমার রাজ্যের বিশেষ মঙ্গল হইবে।"

ফকির। তুমি একটি কথা আমার নিকট স্বীকৃত হইলে, আমিও তোমার কথায় স্বীকৃত হইতে পারি। তুমি রাজধানীর কি নাম দিবে?

সীতা। শ্যামপুর নাম আছে—সেই নামই থাকিবে।

ফকির। যদি উহার মহম্মদপুর নাম দিতে স্বীকৃত হও, তবে আমিও তোমার কথায় স্বীকৃত হই।

সীতা। এ নাম কেন?

ফকির। তাহা হইলে আমি খাতির জমা থাকিব যে, তুমি হিন্দু মুসলমানে সমান দেখিবে।

সীতারাম কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া, তাহাতে স্বীকৃত হইলেন। ফকির তখন বলিল, "আমি ফকির, কোন গৃহে বাস করিব না। কিন্তু তোমার নিকটেই থাকিব। যখন যেখানে থাকি, তোমাকে জানাইব। তুমি খুঁজিলেই আমাকে পাইবে।"

গমনকালে ফকির তিন জনকে আশীর্ব্বাদ করিল। সীতারামকে বলিল, "তোমার মনস্কাম সিদ্ধ হউক।" নন্দাকে বলিল, "তুমি মহিষীর উপযুক্ত; মহিষীর ধর্ম্ম পালন করিও। তোমাদের হিন্দু শাস্ত্রে স্বামীর প্রতি যেরূপ আচরণ করার হুকুম আছে, সেইরূপ করিও—তাহাতেই মঙ্গল হইবে।" রমাকে ফকির বলিল, "মা, তোমাকে কিছু ভীরু-স্বভাব বলিয়া বোধ হইতেছে। ফকিরের কথা মনে রাখিও; কোন বিপদে পড়িলে ভয় করিও না। ভয়ে বড় অমঙ্গল ঘটে; রাজার মহিষীকে ভয় করিতে নাই।"

তার পর তিন জনে গৃহে গমন করিলেন।

পৃ. ৫০, পংক্তি ৯-১৯, "ভূষণায় যে হাঙ্গামা···স্থির করিলেন।" এই অংশের পরিবর্ত্তে ছিল—

যাহারা তাঁহার সঙ্গে কারাগার হইতে পলায়ন করিয়াছিল, তাহারা সকলে ফৌজদারের কোপদৃষ্টিতে পড়িবার আশঙ্কায়, ভূষণা এবং তাহার পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সকল পরিত্যাগ করিয়া, শ্যামপুরে তাঁহার নিকট আশ্রয় গ্রহণ করিল।

পৃ. ৫১, পংক্তি ১৭-১৮, "প্রকাশ্যে অস্ত্রধারী···উপস্থিত হয় নাই।" এই অংশের পরিবর্ত্তে ছিল—

অস্ত্রধারী বা উৎসাহী ছিলেন না, ইহা ফৌজদার জানিত। কারাগার ভগ্ন করার নেতা যে তিনি, ইহা মুসলমান জানিতে পারে নাই। তিনি যে বন্দীর মধ্যে ছিলেন, তাহাও ফৌজদার অবগত হয়েন নাই।

পৃ. ৫১, পংক্তি ২৩, এই পংক্তির শেষে ছিল—

আপাততঃ মুসলমানের সঙ্গে বিবাদ উপস্থিত হইলে, সকলই নষ্ট হইবে; অতএব যত দিন তিনি উপযুক্ত বলশালী না হয়েন, তত দিন কোন গোলযোগ না বাধে, ইহাই তাঁহার উদ্দেশ্য।

পৃ. ৫২, পংক্তি ১৩-১৭, "এই সময়ে চাঁদ শাহ···"মহম্মদপুর"।" এই অংশ ছিল না।

পংক্তি ২০, এই "দশম" পরিচ্ছেদটি প্রথম সংস্করণের "পঞ্চদশ" পরিচ্ছেদ।

পংক্তি ২৩-২৫, "রমা বড় ছোট···ভয়ের বিষয়।" এই অংশ ছিল না।

পৃ. ৫৪, পংক্তি ২৩, "পতিপদসেবায় নিযুক্তা।" এই কথা কয়টির পর ছিল—

লক্ষ্মীনারায়ণ জিউর মন্দিরে ফকির যে উপদেশ দিয়াছিলেন, নন্দা তাহা সম্পূর্ণরূপে রক্ষা করিতেছিলেন।

পৃ. ৫৬, পংক্তি ১, এই "একাদশ" পরিচ্ছেদটি প্রথম সংস্করণের "ষোড়শ" পরিচ্ছেদ।

একাদশ, দ্বাদশ, ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদে "সন্ন্যাসিনী" কথাটির স্থলে প্রথম সংস্করণে "ভৈরবী" ছিল। কেবল ৬৩ পৃষ্ঠার ১৫ পংক্তির "সন্ন্যাসিনী" কথাটি ঐরূপই ছিল।

পৃ. ৫৬, পংক্তি ১৪, এই পংক্তির পাদটীকা-চিহ্নটি এবং নিম্নের পাদটীকাটি (পংক্তি ২৭) ছিল না।

পৃ. ৫৮, পংক্তি ২৩, এই পংক্তির শেষে ছিল—

শ্রী ভাবিল, "পুরুষ থাকিলে ভাবিত—এ ভৈরবীই বটে!"

পৃ. ৫৮, পংক্তি ২৬, "আমি তাহা হইতে বলিতেছি না।" এই কথা কয়টির পর ছিল—

আমিও যথার্থ ভৈরবী নই। আর

পৃ. ৫৯, পংক্তি ১৫, "চন্দনের" কথাটির স্থলে "রক্তচন্দনের" ছিল।

পংক্তি ১৮, এই "দ্বাদশ" পরিচ্ছেদটি প্রথম সংস্করণের "সপ্তদশ" পরিচ্ছেদ।

পৃ. ৬১, পংক্তি ১, এই "ত্রয়োদশ" পরিচ্ছেদটি প্রথম সংস্করণের "অষ্টাদশ" পরিচ্ছেদ।

পৃ. ৬৩, পংক্তি ৩, "ভবিষ্যৎ" কথাটির স্থলে "প্রারব্ধ" ছিল।

পংক্তি ৭, এই পংক্তিটি ছিল না।

পৃ. ৬৪, পংক্তি ১৩, এই "চতুর্দ্দশ" পরিচ্ছেদটি প্রথম সংস্করণের "উনবিংশ" পরিচ্ছেদ।

পৃ. ৬৫, পংক্তি ৪-৫, ৪ পংক্তির শেষ হইতে, পর-পংক্তির "আমার নাম জয়ন্তী" কথা কয়টির পূর্ব্ব পর্য্যন্ত নিম্নলিখিত অংশটি ছিল—

তুমি সে দিন বলিয়াছিলে, তুমি প্রকৃত ভৈরবী নও। তুমি তবে কি?

ভৈরবী। আমি বৈষ্ণবী। কিন্তু নেড়ার দলের বৈষ্ণবী নহি।

শ্রী। আবার বৈষ্ণবী কেমনতর? বৈষ্ণবীর এ বেশ ত নয়।

ভৈরবী। সে সকল রহস্য পরে জানিবে। এখন আমাকে বৈষ্ণবীই জানিও।

পৃ. ৬৬, পংক্তি ১২, "অকৌশল" কথাটির স্থলে "অকুশল" ছিল।

এই পর্য্যন্ত পুস্তকের প্রথম খণ্ড।

পৃ. ৬৭, পংক্তি ২, "জয়ন্তী" কথাটির স্থলে "ভৈরবী" ছিল।

দ্বিতীয় খণ্ড—প্রথম পরিচ্ছেদের আরম্ভে প্রথম সংস্করণে নিম্নলিখিত অংশটি ছিল—

সীতারামের হিন্দু সাম্রাজ্য সংস্থাপন করা হইল না; কেন না, তাহাতে তাঁহার আর মন নাই। মনের সমস্ত ভাগ হিন্দু সাম্রাজ্য যদি অধিকৃত করিত, তবে সীতারাম তাহা পারিতেন। কিন্তু শ্রী, প্রথমে হৃদয়ের তিলপরিমিত অংশ অধিকার করিয়া, এখন হৃদয়ের প্রায় সমস্ত ভাগই ব্যাপ্ত করিয়াছে। শ্রী যদি নিকটে থাকিত, অন্তঃপুরে রাজমহিষী হইয়া বাস করিত, রাজধর্ম্মের সহায়তা করিত, তবে প্রেয়সী মহিষীর যে স্থান প্রাপ্য, সীতারামের হৃদয়ে তাহার বেশী পাইবার সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু শ্রীর অদর্শনে বিপরীত ফল হইল। বিশেষ শ্রী পরিত্যক্তা, উদাসীনী। বোধ হয় ভিক্ষা বৃত্তি অবলম্বন করিয়া দিনপাত করিতেছে, নয় ত কষ্টে মরিয়া গিয়াছে, এই সকল চিন্তায় সে হৃদয়ে শ্রীর প্রাপ্য স্থান বড় বাড়িয়া গিয়াছিল। ক্রমে ক্রমে তিল তিল করিয়া, শ্রী সীতারামের সমস্ত হৃদয় অধিকৃত করিল। হিন্দু সাম্রাজ্যের আর সেখানে স্থান নাই। সুতরাং হিন্দু সাম্রাজ্য সংস্থাপনের বড় গোলযোগ। শ্রীর অভাবে, সীতারামের মনে আর সুখ নাই, রাজ্যে সুখ নাই, হিন্দু সাম্রাজ্য সংস্থাপনেও আর সুখ নাই। কাজেই আর হিন্দু সাম্রাজ্য সংস্থাপন হয় না।

পৃ. ৬৭, পংক্তি ১১-১৫, "শেষে সীতারাম…মন্দ উপস্থিত হইল।" এই অংশের পরিবর্ত্তে ছিল—

তখন সীতারাম হিন্দু সাম্রাজ্যে জলাঞ্জলি দেওয়া স্থির করিলেন। একবার নিজে তীর্থে তীর্থে নগরে নগরে শ্রীর সন্ধান করিবেন। যদি শ্রীকে পান, ফিরিয়া আসিয়া রাজ্য করিবেন; না পান, সংসার পরিত্যাগ পূর্ব্বক বৈরাগ্য আশ্রয় করিবেন। সীতারাম বিবেচনা করিলেন, "যে রাজধর্ম্ম আমি রীতিমত পালন করিতে, চিত্তের অস্থৈর্য্যবশতঃ সক্ষম হইয়া উঠিতেছি না, তাহাতে আর লিপ্ত থাকা লোকের পীড়ন মাত্র। নন্দার গর্ভজ পুত্রকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া, নন্দা ও চন্দ্রচূড়ের হাতে রাজ্য সমর্পণ করিয়া আমি স্বয়ং সংসার ত্যাগ করিব।"

এ সকল কথা সীতারাম আপন মনেই রাখিলেন, মনের ভাব কাহারও কাছে ব্যক্ত করেন নাই। শ্রীর যে সন্ধান করিয়াছিলেন, তাহাও অতিশয় গোপনে এবং অপ্রকাশিত ভাবে। যাহারা শ্রীর সন্ধানে গিয়াছিল, তাহারা ভিন্ন আর কেহই জানিতে পারে নাই যে, শ্রীকে তাঁহার আজিও মনে আছে।

কেহ কিছু জানিতে না পারুক, তাঁহার মনের যে ভাবান্তর হইয়াছে, তাহা নন্দা ও রমা উভয়েই জানিতে পারিয়াছিল। নন্দা ভাব বুঝিয়া, কায়মনোবাক্যে ধর্ম্মতঃ মহিষীধর্ম্ম পালন করিয়া সীতারামের প্রফুল্লতা জন্মাইবার চেষ্টা করিত। অনেক সময়েই সফল হইত। কিন্তু রমা সকল সময়েই স্বামীর অনাস্থা ও অন্য মন দেখিয়া ক্ষুণ্ণ ও বিমর্ষ থাকিত; সীতারামের তাহা বিশেষ অপ্রীতিকর হইত। রমা ভাবিত, "আর আমাকে ভাল বাসেন না কেন?" নন্দা ভাবিত, "তিনি ভাল বাসুন, না বাসুন, ঠাকুর করুন, আমার যেন কোন ত্রুটি না হয়। তাহা হইলেই আমার সুখ।"

শেষে সীতারাম, ভার্য্যাদ্বয় এবং চন্দ্রচূড় প্রভৃতি অমাত্যবর্গের নিকট প্রকাশ করিলেন যে, তিনি এ পর্য্যন্ত প্রকৃত রাজা হয়েন নাই; কেন না, দিল্লীর সম্রাট্ তাঁহাকে সনন্দ দেন নাই। সনন্দ পাইবার অভিলাষ হইয়াছে। সেই অভিপ্রায়ে তিনি অচিরে দিল্লী যাত্রা করিবেন।

সময়টা বড় অসময়। মহম্মদপুরে সীতারামের অধিকার নির্ব্বিঘ্নে সংস্থাপিত হইয়াছিল বটে। তোরাব খাঁ, রুষ্ট হইয়াও কোন বিরোধ উপস্থিত করে নাই। তাহার একটি বিশেষ কারণ ছিল। তখন বাঙ্গালার সুবেদার বিখ্যাত ব্রাহ্মণবংশজ পাপিষ্ঠ মুসলমান মুরশিদ কুলি খাঁ। তখনও বাঙ্গালা দিল্লীর অধীন। তোরাব খাঁ দিল্লীর প্রেরিত লোক, সেইখানে তাঁর মুরব্বীর জোর। সুবেদারের সঙ্গে তাঁহার বড় বনিবনাও ছিল না। এখন তিনি যদি বলে ছলে সীতারামকে ধ্বংস করেন, তবে সুবেদার কি বলিবেন? সুবেদার বলিতে পারেন, এ বেচারা নিরপরাধী, কিস্তি কিস্তি বিনা ওজর আপত্তি খাজানা দাখিল করে, বকেয়া বাকির ঝঞ্ঝাট রাখে না—ইহার উপর অত্যাচার কেন? তখন মুরশিদ কুলি খাঁ তাঁহাকে লইয়া একটা গোলযোগ বাধাইতে পারেন। তাই, সুবেদারের অভিপ্রায় কি, জানিবার জন্য তোরাব খাঁ, তাঁহার নিকট সীতারামের বৃত্তান্ত সবিশেষ লিখিয়া পাঠাইলেন। মুরশিদ কুলি খাঁ অতি শঠ। তিনি বিবেচনা করিলেন যে, এই উপলক্ষে তোরাব খাঁকে পদচ্যুত করিবেন। যদি তোরাব সীতারামকে দমন করেন, তাহা হইলে, মুরশিদ বলিবেন, নিরপরাধীকে নষ্ট করিলে কেন? যদি তোরাব তাহাকে দমন না করেন, তবে বলিবেন, বিদ্রোহী কাফেরকে দণ্ডিত করিলে না কেন? অতএব তোরাব যাহা হয় একটা করুক, তিনি কোন উত্তর দিবেন না। মুরশিদ কুলি কোন উত্তর দিলেন না, তোরাবও কিছু করিলেন না।

কিন্তু বড় বেশী দিন এমন সুখে গেল না।

পৃ. ৬৭, পংক্তি ২৬, "অজ্ঞতা" কথাটির স্থলে "মূর্খতা" ছিল।

পৃ. ৬৮, পংক্তি ২২, এই পংক্তির শেষে ছিল—

সীতারামকেও জানাইলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে, এই সময়েই সীতারাম দিল্লী যাওয়ার প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেন।

পৃ. ৬৮, পংক্তি ২৩-২৪, "ইহার সকল উদ্যোগ…যাত্রা করিলেন।" এই অংশের পরিবর্ত্তে ছিল—

অসময় হইলেও তীক্ষ্ণবুদ্ধি চন্দ্রচূড় তাহাতে অসম্মত হইলেন না। তিনি বলিলেন, "যুদ্ধে জয় পরাজয় ঈশ্বরের হাত। প্রাণপাত করিয়া যুদ্ধ করিলে ফৌজদারকে পরাজয় করিতে পারিবেন, ইহা না হয় ধরিয়া লইলাম। কিন্তু ফৌজদারকে পরাজয় করিলেই কি লেঠা মিটিল! ফৌজদার পরাভূত হইলে

সুবাদার আছে; সুবাদার পরাভূত হইলে দিল্লীর বাদশাহ আছে। অতএব যুদ্ধটা বাধাই ভাল নহে। এমন কোন ভরসা নাই যে, আমরা মুরশিদাবাদের নবাব বা দিল্লীর বাদশাহকে পরাভূত করিতে পারিব। অতএব দিল্লীর বাদশাহের সনন্দ ইহার ব্যবস্থা। যদি দিল্লীর বাদশাহ আপনাকে এই পরগণার রাজ্য প্রদান করেন, ফৌজদার কি সুবেদার, কেহই আপনার রাজ্য আক্রমণ করিবে না। হিন্দুরাজ্য স্থাপন, এক দিন বা এক পুরুষের কাজ নহে। মোগল রাজ্য এক দিনে বা এক পুরুষে স্থাপন হয় নাই। এই পত্তন মাত্র, বাঙ্গালার সুবেদার বা দিল্লীর বাদশাহের সঙ্গে বিবাদ হইলে, সব ধ্বংস হইয়া যাইবে। অতএব এখন অতি সাবধানে চলিতে হইবে। দিল্লীর সনন্দ ব্যতীত ইহার আর উপায় দেখি না, তুমি আজি দিল্লী যাত্রা কর। সেখানে কিছু খরচ পত্র করিলেই কার্য্য সিদ্ধ হইবে; কেন না, এখন দিল্লীর আমীর ওমরাহ, কি বাদশাহ স্বয়ং, কিনিবার বেচিবার সামগ্রী। তোমার মত চতুর লোক অনায়াসে এ কাজ সিদ্ধ করিতে পারিবে। যদি ইতিমধ্যে মুসলমান মহম্মদপুর আক্রমণ করে, তবে মৃণ্ময় রক্ষা করিতে পারিবে, এমন ভরসা করি। মৃণ্ময় যুদ্ধে অতিশয় দক্ষ, এবং সাহসী। আর কেবল তাহার বলবীর্য্যের উপর নির্ভর করিতে তোমাকে বলি না। আমার এমন ভরসা আছে যে, যত দিন না তুমি ফিরিয়া আস, তত দিন আমি ফৌজদারকে স্তোকবাক্যে ভুলাইয়া রাখিতে পারিব। তুমি দুই চারি মাসের জন্য আমার উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পার। আমি অনেক কৌশল জানি।"

এই সকল বাক্যে সীতারাম সন্তুষ্ট হইয়া সেই দিনই কিছু অর্থ এবং রক্ষকবর্গ সঙ্গে লইয়া দিল্লী যাত্রা করিলেন। নামে দিল্লী যাত্রা, কিন্তু কোথায় যাইবেন, তাহা সীতারাম ভিন্ন আর কেহই জানিত না।

পৃ. ৭৩, পংক্তি ২৩, এই পংক্তির শেষে ছিল—

ছাদের উপর হইতে লাফাইয়া পড়িতে হইবে? না আগুন খাইতে হইবে?

পৃ. ৭৩, পংক্তি ২৪, "স্ত্রীলোক।" কথাটির পর ছিল—

তার অপেক্ষাও কঠিন কাজ।

পৃ. ৭৪, পংক্তি ২৬, "রাখিয়েসে। এ কোন্?" এই কথা কয়টির স্থলে ছিল—

রাখিয়াছি। এ কে?

পৃ. ৭৪, পংক্তি ২৮, "মরদ্ যাতে পার্‌বে না। হুকুম নেহি।" এই কথা কয়টির স্থলে ছিল—

পুরুষ মানুষের যাইবার হুকুম নাই।

পৃ. ৮০, পংক্তি ১-২, "এই গ্রন্থে তাহার প্রমাণ আছে।" এই কথাগুলি ছিল না।

পৃ. ৮১, পংক্তি ১৮-১৯, "যে অপবিত্র,...মুরলার কথা শুনিয়া" এই কথাগুলি ছিল না।

পৃ. ৮২, পংক্তি ২৮, "অনেক দিন বাপ মা দেখি নাই।" এই কথাগুলির স্থলে ছিল—

আমি জেতে কৈবর্ত্ত, বিবাহ আড়াইটা হইয়াছে, তাতে যদি তোমার আপত্তি না থাকে, তবে আমারও সাড়ে তিনটায় আপত্তি নাই।

পৃ. ৮৪, পংক্তি ১২, "না যাইব কেন?" এই কথাগুলির পূর্ব্বে ছিল—

এখানে ওখানে ঘুরিয়া বেড়ানই আমার কাজ—আমার অন্য কাজ নাই;

পৃ. ৮৪, পংক্তি ১৪, "প্রিয়প্রাণহন্ত্রী" কথাটির স্থলে "পতিপ্রাণহন্ত্রী" ছিল।

পৃ. ৮৪, পংক্তি ২৭, "জয়ন্তী মনে মনে বড় খুসী হইল।" এই কথাগুলির পর ছিল— কথাগুলি শিষ্যার নিকট গুরুদক্ষিণার ন্যায় সাদরে গ্রহণ করিল। কিন্তু এখনও জয়ন্তীর কথা ফুরায় নাই।

পৃ. ৮৫, পংক্তি ১৭, "সন্ন্যাসিনী" কথাটির স্থলে "ভৈরবী বা বৈষ্ণবীর শিষ্যা" ছিল।

পৃ. ৮৫, পংক্তি ২৩-২৬, "যতক্ষণ এই কথোপকথন···ত্রিশূল মন্ত্রপূত।*" এই অংশটি ছিল না। ফলে নিম্নের পাদটীকাটিও ছিল না।

পৃ. ৮৫, পংক্তি ২৭, "দুই জনে ভৈরবীবেশ গ্রহণ করিল এবং" এই কথা কয়টি ছিল না।

পৃ. ৮৬, পংক্তি ৬, এই "নবম" পরিচ্ছেদটি প্রথম সংস্করণের "দশম" পরিচ্ছেদ। এই পরিচ্ছেদের পূর্ব্বে নিম্নলিখিত পরিচ্ছেদটি ছিল—

নবম পরিচ্ছেদ

রমা বাঁচিয়া গেল, কিন্তু গঙ্গারাম বাঁচিল না। তখন গঙ্গারাম শয্যা লইল। রাজকার্য্য সকল বন্ধ করিল। সেও রমার মত স্থির করিল, বিষ খাইয়া মরিবে। কিন্তু রমাও বিষ খায় নাই, গঙ্গারামও বিষ খাইল না।

চন্দ্রচূড় ঠাকুর জানিতে পারিলেন, নগর রক্ষার কাজ এ দুঃসময়ে, ভাল হইতেছে না, নগররক্ষক আদৌ দেখেন না। শুনিলেন, নগররক্ষক পীড়িত—শয্যাগত। তিনি নগররক্ষককে দেখিতে গেলেন। গঙ্গারাম বলিল, "দশ পাঁচ দিন আমায় অবসর দিন। আমার শরীর ভাল নহে—আমি এখন পারিব না।"

চন্দ্রচূড়। শরীর ত উত্তম দেখিতেছি। বোধ হয় মন ভাল নহে। সেইরূপ দেখিতেছি।

গঙ্গারাম বিছানায় পড়িয়া রহিল। বিছানায় পড়িয়া অন্তর্দ্দাহ আরও বাড়িল—নিষ্কর্ম্মারই বড় অন্তর্দ্দাহ। কাজ কর্ম্মই, অন্তরের রোগের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ।

বিছানায় পড়িয়া শেষ গঙ্গারাম যাহা ভাবিয়া স্থির করিল, তাহা এই।

"ধর্ম্মে হৌক, অধর্ম্মে হৌক, আমার রমাকে পাইতে হইবে। নহিলে মরিতে হইবে।

তা, মরি, তাতে আপত্তি নাই, কিন্তু রমাকে না পাইয়া মরাও কষ্ট। কাজেই মরা হইবে না, রমাকে পাইতে হইবে।

ধর্ম্মপথে, পাইবার উপায় নাই। কাজেই অধর্ম্মপথে পাইতে হইবে। ধর্ম্ম যে পারে, সে করুক, যে পারিল না, সে কি প্রকারে করিবে?"

গঙ্গারামের যে ভুল হইল, অধার্ম্মিক লোক মাত্রেরই সেইটি ঘটিয়া থাকে। তাহারা মনে করে, ধর্ম্মাচরণ পারিয়া উঠিলাম না, তাই অধর্ম্ম করিতেছি। তাহা নহে; ধর্ম্ম যে চেষ্টা করে, সেই করিতে পারে। অধার্ম্মিকেরা চেষ্টা করে না, কাজেই পারে না।

গঙ্গারাম তার পর ভাবিয়া ঠিক করিতে লাগিল—

"অধর্ম্মের পথে যাইতে হইবে—কিন্তু তাই বা পথ কই? রমাকে হস্তগত করা কঠিন নহে। আমি

যদি আজ বলিয়া পাঠাই যে, কাল মুসলমান আসিবে, আজ বাপের বাড়ী যাইতে হইবে, তাহা হইলে সে এখনই চলিয়া আসিতে পারে। তার পর যেখানে লইয়া যাইব, কাজেই সেইখানে যাইতে হইবে। কিন্তু নিয়া যাই কোথায়? সীতারামের এলাকায় ত একদিনও কাটিবে না। সীতারাম ফিরিয়া আসিবার অপেক্ষা সহিবে না। এখনই চন্দ্রচূড় আমার মাথা কাটিতে হুকুম দিবে, আর মৃণ্ময় আমার মাথা কাটিয়া ফেলিবে। কাজেই সীতারামের এলাকার বাহিরে, যেখানে সীতারাম নাগাল না পায়, সেইখানে যাইতে হইবে। সে সবই মুসলমানের এলাকা। মুসলমানের ত আমি ফেরারি আসামী,—যেখানে যাইব, সম্বাদ পাইলে আমাকে সেইখান হইতে ধরিয়া লইয়া গিয়া শূলে দিবে। ইহার কেবল এক উপায় আছে—যদি তোরাব খাঁর সঙ্গে ভাব করিতে পারি। তোরাব খাঁ অনুগ্রহ করিলে, জীবনও পাইব, রমাও পাইব। ইহার উপায় আছে।"

পৃ. ৮৬, পংক্তি ৮, "খসম" কথাটির স্থলে "পতি" ছিল।

পংক্তি ৯, "দোস্ত" কথাটির স্থলে "উপপতি" ছিল।

পং ২১-২৪, "গঙ্গারামের সৌভাগ্যক্রমে···তোরাব্" ইহার পরিবর্ত্তে ছিল—

বন্দেআলি সেখকে এই সকল কথা বলিতে বলিয়া দিয়া, গঙ্গারাম বলিলেন, "লিখিত উত্তর লইয়া আইস।"

বন্দেআলি বলিল, "আমার কথায় ফৌজদার সাহেব বিশ্বাস করিয়া খত দিবেন কেন?"

গঙ্গারাম বলিল, "পত্র লিখিতে আমার সাহস হয় না। আমার এই মোহর লইয়া যাও। আমার মোহর তোমার হাতে দেখিলে তিনি অবশ্য বিশ্বাস করিবেন।"

বন্দেআলি মোহর লইয়া ভূষণায় গেল। ফৌজদারিতে তার চেনা লোক ছিল। ফৌজদারী সরকারে, কারকুন দপ্তরের বখশী চেরাগ আলির সঙ্গে তাহার দোস্তী ছিল। বন্দেআলি চেরাগ আলিকে ধরিল যে, ফৌজদারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া দাও, আমার বিশেষ জরুরী কথা আছে। বখশী গিয়া কারকুনকে ধরিল, কারকুন পেস্কারকে ধরিল, পেস্কার সাক্ষাৎ করাইয়া দিল।

গঙ্গারাম যেমন যেমন বলিয়া দিয়াছিলেন, বন্দেআলি অবিকল সেই রকম বলিল। লিখিত উত্তর চাহিল। তোরাব খাঁ কিছুক্ষণ চিন্তা করিলেন। বুঝিলেন যে, গঙ্গারাম ত হাতছাড়া হইয়াইছে—এখন তাহাকে মাফ করায় কোন ক্ষতি হইতে পারে না। অতএব

পৃ. ৮৬, পংক্তি ২৭, "সেও পার হইতেছিল।" এই কথা কয়টির পূর্ব্বে ছিল—

যাহার সঙ্গে পাঠকের মন্দিরে পরিচয় হইয়াছিল,—

পৃ. ৮৭, পংক্তি ৬, এই "দশম" পরিচ্ছেদটি প্রথম সংস্করণের "একাদশ" পরিচ্ছেদ।

পৃ. ৮৮, পংক্তি ৬-৮, "গঙ্গারাম অভীষ্ট···অনুবর্ত্তী হইয়াছিল।" এই অংশের পরিবর্ত্তে ছিল—

গঙ্গা। নলদী পরগণা আমাকে দিবেন।

ফৌজদার। মহম্মদপুর আর হিন্দুর হাতে রাখিব না। কিন্তু তুমি যদি চাও, তবে তোমাকে এখানে শিপাহশালার করিতে পারি। আর টাকা ও গ্রাম দিতে পারি।

গঙ্গারাম। তাহাই যথেষ্ট। কিন্তু আর এক ভিক্ষা আছে। সীতারামের দুই মহিষী আছে।

ফৌজ। তাহারা নবাবের জন্য। তাহাদের পাইবে না।

গঙ্গা। জ্যেষ্ঠাকে মুরশিদাবাদে পাঠাইবেন। কনিষ্ঠাকে নফরকে বখশিষ করিবেন।

ফৌজদার তামাসা করিয়া বলিলেন, "তুমি সীতারামের স্ত্রী নিয়া কি করিবে? সীতারাম যেন মরিল, কিন্তু তবু ত হিন্দুর মাঝে বিধবার বিবাহ নাই। যদি মুসলমান হইতে, তবে বুঝিতাম যে, তুমি রাণীকে নেকা করিতে পারিতে।"

গঙ্গারাম ভাবিল, এ পরামর্শ মন্দ নহে। যদি নিজে মুসলমান হইয়া, রমাকে ফৌজদারের সাহায্যে মুসলমান করিয়া নেকা করিতে পারে, তবে সীতারাম জীবিত থাকিলে, আর কোন দাবী দাওয়া করিতে পারিবে না। গঙ্গারাম নির্ব্বিঘ্নে রমাকে ভোগ দখল করিতে পারিবে। অতএব ফৌজদারকে বলিল, "মুসলমান ধর্ম্মই সত্য ধর্ম্ম, এইরূপ আমি ক্রমে বুঝিতেছি। মুসলমান হইব, আমি এখন স্থির করিয়াছি। কিন্তু রমাকে না পাইলে মুসলমান হইব না।"

ফৌজদার হাসিয়া বলিলেন, "রমা কে? সীতারামের কনিষ্ঠা ভার্য্যা? সে নহিলে, যদি তোমার পরকালের গতি না হয়, তবে অবশ্য তুমি যাহাতে তাহাকে পাও, তাহা আমি করিব। সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাক। কিন্তু আর একটা কথা, সীতারামের অনেক ধনদৌলত পোতা আছে না?"

গঙ্গা। শুনিয়াছি, আছে।

তোরাব খাঁ। তাহা তুমি দেখাইয়া দিবে?

গঙ্গা। কোথায় আছে, তাহা আমি জানি না।

তোরাব খাঁ। সন্ধান করিতে পারিবে?

গঙ্গা। এখন করিতে গেলে লোকে আমায় অবিশ্বাস করিবে।

তোরাব খাঁ আর কিছুই বলিলেন না।

তখন সন্তুষ্ট হইয়া গঙ্গারাম বিদায় হইল। এবং সেই রাত্রেই মহম্মদপুর ফিরিয়া আসিল।

গঙ্গারাম জানিত না যে, চাঁদশাহ ফকির তাহার অনুবর্ত্তী হইয়াছিল। চাঁদশাহ ফকির পরদিন নিভৃতে চন্দ্রচূড়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিল, "আহ্লাদের সম্বাদ আপনাকে দিতে আসিয়াছি। ইস্‌লামের জয় হইবে।"

চন্দ্রচূড় জানিতেন, চাঁদশাহের কাছে হিন্দু মুসলমান এক—সে কোন পক্ষে নহে—ধর্ম্মের পক্ষ এবং সীতারামের পক্ষ। অতএব এ কথার কিছু মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্যাপার কি?"

চাঁদশাহ। হিন্দুরাও ইস্‌লামের পক্ষ।

চন্দ্রচূড়। কোন কোন হিন্দু বটে।

চাঁদ। আপনারাও।

চন্দ্র। সে কি?

চাঁদ। মনে করুন, নগরপাল গঙ্গারাম দাস।

চন্দ্র। গঙ্গারাম খাঁটি হিন্দু—রাজার বড় বিশ্বাসী।

চাঁদ। তাই কাল রাত্রে ভূষণায় গিয়া তোরাব খাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া আসিয়াছে।

চন্দ্র। আঁ? না, মিছে কথা।

চাঁদ। আমি সঙ্গে সঙ্গে গিয়াছিলাম। সঙ্গে সঙ্গে ফিরিয়া আসিয়াছি।

এই বলিয়া চাঁদশাহ সেখান হইতে চলিয়া গেল। চন্দ্রচূড় স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিলেন—তাঁহার তেজস্বিনী বুদ্ধি যেন হঠাৎ নিবিয়া গেল।

পৃ. ৮৮, পংক্তি ৯, এই "একাদশ" পরিচ্ছেদটি প্রথম সংস্করণের "দ্বাদশ" পরিচ্ছেদ।

পংক্তি ১০, "সন্ধ্যার পর গুপ্তচর" এই কথাগুলির পূর্ব্বে ছিল—

কালে বুদ্ধি ফিরিয়া আসিলে চন্দ্রচূড় ভাবিতে লাগিলেন, "ইহার বিহিত কি কর্ত্তব্য? এখন গঙ্গারামকে পদচ্যুত করিয়া আবদ্ধ করা ভিন্ন উপায় নাই। কিন্তু তাহাকে পদচ্যুত বা কারাবদ্ধ করিব কি প্রকারে? সে যদি না মানে? নগর সিপাহী সবই ত তার হাতে। সে আমারে উলটিয়া কারারুদ্ধ করিতে পারে। মৃণ্ময়ের সাহায্য ভিন্ন তাহাকে আবদ্ধ করিতে পারিব না—কিন্তু যদি গঙ্গারাম অবিশ্বাসী, তবে মৃণ্ময়কেই বা বিশ্বাস কি? তবে সাবধানের মার নাই—সতর্ক থাকাই ভাল। বিপদ্ ঘটে, তখন নারায়ণ সহায় হইবেন। এখন প্রথমতঃ গঙ্গারামের মন বুঝিয়া দেখিতে হইবে।" এইরূপ ভাবিয়া চন্দ্রচূড় তখন আর কাহারও সাক্ষাতে কোন কথা প্রকাশ করিলেন না। পরে

পৃ. ৮৮, পংক্তি ১৪, এই পংক্তির পর নিম্নলিখিত অংশটি ছিল—

চন্দ্রচূড় বলিলেন, "আমার বিবেচনায়, গঙ্গারামও দ্বিতীয় সেনাপতি হইয়া মৃণ্ময়ের সাহায্যার্থ যাওয়া ভাল।"

গঙ্গারাম চুপ করিয়া রহিল—দেখিতেছে, মৃণ্ময় কি বলে।

মৃণ্ময়ের একটু রাগ হইয়াছে—আমি কি একা লড়াই পারি না যে—আমার সঙ্গে আবার গঙ্গারাম! অতএব মৃণ্ময় রুষ্টভাবে বলিল, "তা চলুন না—বেশ ত!"

গঙ্গারাম তখন বলিল, "আমি যাব ত নগর রক্ষা করিবে কে?"

চন্দ্র। মৃণ্ময় না হয় সে জন্য এক জন ভাল লোক রাখিয়া যাইবেন।

গঙ্গা। নগর রক্ষার জন্য রাজার কাছে জবাবদিহি আমাকে করিতে হইবে। অতএব আমি নগর ছাড়িয়া কোথাও যাইব না।

চন্দ্র। আমি নগর রক্ষা করিব।

গঙ্গা। করিবেন। কিন্তু আমার উপর যে কাজের ভার আছে, তাহা আমি করিব।

তখন চন্দ্রচূড় মনে মনে বড় সন্দিগ্ধ হইলেন। প্রকাশ্যে বলিলেন, "যাহা তোমরা ভাল বুঝ—তাই করিও।"

পৃ. ৮৯, পংক্তি ৫, "জগতের বন্ধু" কথা দুইটির স্থলে "জগৎপিতা" ছিল।

পৃ. ৯০, পংক্তি ১, এই "দ্বাদশ" পরিচ্ছেদটি প্রথম সংস্করণের "ত্রয়োদশ" পরিচ্ছেদ।

পংক্তি ৪, "তখন তিনি" কথা দুইটির পরই ছিল—

কোন কৌশলে গঙ্গারামকে আবদ্ধ না করিয়া এই সর্ব্বনাশ উপস্থিত করিয়াছেন, নিশ্চয় বুঝিয়া,

পৃ. ৯০, পংক্তি ৫-৭, "এমন সময়ে…শিহরিয়া উঠিলেন।" এই অংশটি ছিল না।

পংক্তি ১৭, "ও" কথাটির স্থলে "শ্রী" ছিল।

পৃ. ৯১, পং ৬, এই "ত্রয়োদশ" পরিচ্ছেদটি প্রথম সংস্করণের "চতুর্দ্দশ" পরিচ্ছেদ।

পং ১৫, এই পংক্তির পর ছিল—

মুরলার সঙ্গে কথা কহিয়াছিল শ্রী। গঙ্গারামের কাছে আসিয়াছে, জয়ন্তী একা। কি জানি, যদি গঙ্গারাম চিনিতে পারে, এজন্য শ্রী গৃহমধ্যে প্রবেশ করে নাই।

পৃ. ৯২, পং ১৮, এই পংক্তির পর ছিল—

পুরুষ। কোথা পাইব? আপনাকে ত কোন দেবীর মত বোধ হইতেছে। বলি কি, কোথায় ত পাইব? এই পুরীমধ্যে কি পাইব?

জয়ন্তী। হাঁ, তাই পাইবেন।

পু। কবে পাইব?

জয়ন্তী। তাহার কিছু বিলম্ব আছে।

পৃ. ৯২, পং ২০, এই "চতুর্দ্দশ" পরিচ্ছেদটি প্রথম সংস্করণের "পঞ্চদশ" পরিচ্ছেদ।

পৃ. ৯৩, পং ২৬, "এখন সর্ব্বনাশ হইল।" এই কথা কয়টির পূর্ব্বে ছিল—

কেন ফকিরের কথায় সতর্ক হইলাম না!

পৃ. ৯৬, পং ১, এই "পঞ্চদশ" পরিচ্ছেদটি প্রথম সংস্করণের "ষোড়শ" পরিচ্ছেদ।

পৃ. ৯৮, পং ২০, এই "ষোড়শ" পরিচ্ছেদটি প্রথম সংস্করণের "সপ্তদশ" পরিচ্ছেদ।

পৃ. ১০০, পং ৭, এই "সপ্তদশ" পরিচ্ছেদটি প্রথম সংস্করণের "অষ্টাদশ" পরিচ্ছেদ।

পং ১০, "জয়ন্তী।" কথাটির পর ছিল—

তোমাকে পাইলে তিনি যতদূর সুখী হইবেন, এত আর কিছুতেই না। তবে তাঁহাকে তুমি সুখী না করিবে কেন?

শ্রী। তুমি ত আমাকে শিখাইয়াছ যে, চিত্তবৃত্তির নিরোধই যোগ।

জয়ন্তী। মনোবৃত্তি সকলের আত্মবশ্যতাই যোগ। তাহা কি তুমি লাভ করিতে পার নাই?

শ্রী। আমার কথা হইতেছে না।

জয়ন্তী। যাঁহার কথা হইতেছে, তাঁহাকে তুমি এই পথে আনিতে পারিবে। সেই জন্যই সাক্ষাতের বিশেষ প্রয়োজন।

পৃ. ১০০, পং ২২, এই পংক্তির পর ছিল—

জয়ন্তী। আমি যে রাজার কাছে প্রতিশ্রুত আছি যে, তোমাকে দেখাইব।

শ্রী। কিছু দিন এইখানে থাকিয়া বিচার করিয়া দেখা যাক্, দুই দিক্ বজায় রাখা যায় কি না।

এই পর্য্যন্ত দ্বিতীয় খণ্ড।

পৃ. ১০৪, পং ১৭, এই পংক্তির শেষে ছিল—

তাই দরবারে আরও অনিচ্ছুক ছিলেন। তবে রাজা রাজপুরুষেরা সকল কথা ভাঙ্গিয়া বলেন না—এই জন্য তিনি নন্দাকে কেবল আব্রু পরদার কথা বলিয়া ভুলাইয়াছিলেন।

পৃ. ১০৪, পং ২৭, "শ্বেতমর্ম্মরনির্ম্মিত" কথাটি ছিল না।

পৃ. ১০৮, পং ২৪, "ছাড়িল না" কথা কয়টির পর ছিল—

—আড়াইটা বিবাহের ব্যঙ্গটাও ছাড়িল না। শুনিয়া বাহিরের দর্শকমণ্ডলী মধ্যে অস্ফুট স্বরে কেহ কেহ বলিল, "আয়ি, আমি রাজি।" কেহ বা বলিল, "মাসী, আমার খুড়ো রাজি।"

পৃ. ১১১, পং ২৩, "খণ্ড খণ্ড করিয়া" কথা কয়টির স্থলে "মারিয়া" ছিল।

পৃ. ১১২, পং ১৯, "মন্ত্রপূত" কথাটি ছিল না।

পৃ. ১১৩, পং ১২, এই পংক্তির শেষে ছিল—

অনেকেই মুরলাকে জিজ্ঞাসা করিল, "আয়ি, আড়াইটার উপর সাড়ে তিনটা হয় না?" মুরলারও লজ্জা ?.১—সে উত্তর দিল, "হয়—তোর বাবাকে ডেকে আন্‌গে যা—"

পৃ. ১১৪, পং ১৪, "একটা" কথাটির স্থলে "প্রধান" ছিল।

পং ১৬, "এত লোক···ফুরাইল না।" এই অংশের পরিবর্ত্তে ছিল—

অসংখ্য দীন, বিপন্ন, এবং লোভী লোক আসিয়া দুর্গ পরিপূর্ণ করিল—তাহাদিগের জয় জয় শব্দে উচ্চ প্রাসাদ সকল চারি দিক্ হইতে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। রাজপুরুষেরা একে একে ভিক্ষুকদিগকে সীতারামের সিংহাসন সন্নিধানে আনিল, তিনি তাহাদিগকে উপযুক্ত দান করিতে বা করাইতে লাগিলেন—তখন রাজপুরুষেরা দ্বারান্তর দিয়া তাহাদিগকে বিদায় করিয়া দিল। যে টাকা চাহিল, সে টাকা পাইল, যে সোণা চাহিল, সে সোণা পাইল, যে তৈজস চাহিল, সে তৈজস পাইল, যে বনাত চাহিল, সে বনাত পাইল, যে শাল চাহিল, সে শাল পাইল, যে ভূমি চাহিল, সে ভূমি পাইল।

পৃ. ১১৫, পং ২৪-২৫, "আমি যাহা খুঁজি,···আমাকে দিন" ইহার পরিবর্ত্তে ছিল—

আমার জীবন একদিন আমায় দান করিবেন। যে অমূল্য সামগ্রী আমাকে দিবেন বলিয়াছিলেন

পৃ. ১১৫, পং ২৬-৩০, এই পাঁচটি পংক্তি ছিল না।

পৃ. ১১৬, পং ২, "কাণা কড়ির বিনিময়ে রত্নাকর?" ইহার পরিবর্ত্তে ছিল—

কাণা কড়ি লইয়া কি রত্নাকর বেচিব?

পৃ. ১১৭, পং ২৫, "জিজ্ঞাসা করিল" এই কথা দুইটির পূর্ব্বে ছিল—

যখন বেড়ী প্রায় খোলা হইয়াছে—তখন গঙ্গারাম জয়ন্তীকে

পৃ. ১২৩, পং ৯, "মূর্ত্তিমতী শোভা" কথা দুইটির স্থলে "সৌন্দর্য্য মূর্ত্তিমতী" ছিল।

পং ১৬-১৭, "শ্রী হইতে সীতারামের সর্ব্বনাশ হইল।" এই কথাগুলি ছিল না।

পৃ. ১২৫, পং ৩, "মুসলমানের" এই কথাটির স্থলে "নেড়ের" ছিল।

পৃ. ১৩১, পং ২৮, "বাসিতেন" কথাটির পর ছিল—

তা বলিয়াছি

পৃ. ১৩৪, পং ৫, "টাকার অভাবে তেমনই রোমক সাম্রাজ্য" কথা কয়টির পূর্ব্বে ছিল—

টাকার অভাবে যেমন নফরা হাড়ি না খাইয়া মরিল,

পৃ. ১৩৭, পং ১৮-২০, "পাঁচ বৎসর ধরিয়া···ইহাতেই সীতারামের" এই কথাগুলির পরিবর্ত্তে ছিল—

এতেই ত

পৃ. ১৪০, পং ২৫-২৬, "রাজার এমন কোন···করিতে পারে?" এইগুলির পরিবর্ত্তে ছিল—

এমন সম্বাদ পাইয়াছ কি যে, রাজাদিগের এমন কোন ক্ষমতা আছে যে, আমার অনিষ্ট করিতে পারে?

পৃ. ১৪৩, পং ৭, "সন্ধান পেলে না" কথা কয়টির স্থলে "পারলে না" ছিল।

পৃ. ১৪৫, পং ৬, "সিংহব্যাঘ্রবিমর্দ্দিত" কথাটির স্থলে "সিংহব্যাঘ্র বিক্রান্ত" ছিল।

এই অষ্টাদশ পরিচ্ছেদে "চণ্ডাল" কথাটির স্থলে সর্ব্বত্র "চাণ্ডাল" ছিল।

পৃ. ১৪৬, পং ৭, "প্রবাহিত" কথাটির স্থলে "প্রতিহত" ছিল।

পং ২১, "রাজার নাম" কথা দুইটির স্থলে "রাজা নাম" ছিল।

পৃ. ১৬২, পং ১৭, "দেবীমূর্ত্তি" কথাটির স্থলে "দৈবীমূর্ত্তি" ছিল।

পৃ. ১৬৪, পং ১, "বৈরিশূন্য" কথাটির স্থলে "আপদ্‌শূন্য" ছিল।

পৃ. ১৬৫, পং ১৩, "গোলন্দাজ হইয়া আসিয়াছিল" এই কথা কয়টির পর ছিল—

সন্দেহ নাই

পৃ. ১৬৫, পং ১৪, "যাইবে না মনে করিয়া থাকিবে" এই কথা কয়টির স্থলে ছিল—

যাইত না

পৃ. ১৬৬, পং ২১, এই পংক্তির শেষে ছিল—

এবং সর্ব্বফলদাতার নিকট প্রার্থনা করি যে, পাঠকেরা সীতারামের দুষ্কর্ম্ম এবং শ্রীর অকর্ম্ম হইতে বিরত হইয়া জয়ন্তীর কর্ম্মানুকারী হউন।

এখন, যাও জয়ন্তী! প্রফুল্লের পাশে গিয়া দাঁড়াও। প্রফুল্ল গৃহিণী, তুমি সন্ন্যাসিনী। দুই জনে একত্রিত হইয়া সনাতন ধর্ম্ম সম্পূর্ণ কর।